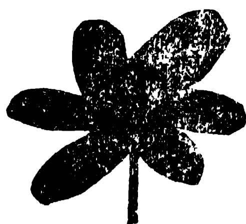
প্রকৃতি

সমরেশ বসু



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩



আকাশে মেঘ করে আছে। কৃষ্ণ কালো ঘন মেঘ না। বজ্রগর্ভ মেঘের বুকে বিদ্যুৎচমকের কোনো লক্ষণ নেই। স্নিগ্ধ মন মাতানো বাতাস বইছে। খেলছে বললে যথার্থ হয়। বাতাসের এই খেলাটা প্রাণকে কেবল জুড়ায় না। উতলা করে। আকাশ জুড়ে মেঘ। কিন্তু স্থির হয়ে জমতে পারছে না। বাতাসে উড়ে চলেছে। বাতাসে আর্দ্রতা আছে। কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। শ্রাবণের শেষে, আসন্ন দীর্ঘ বেলা ভাদ্রের দিন, এমন সুন্দর মেঘের ছায়াঘন স্নিগ্ধতা আশাতীত।

ভাদ্র আশ্বিন, বাঙালীর পঞ্জিকায় শরৎকাল বলে চিহ্নিত। অথচ বাঙালী কবি গান করেন, "আমার দুখের নাহিক ওর ই ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" মাহ ভাদরের সঙ্গে কোনো সময় মনে হয়, দীর্ঘবেলারই বুঝি তুলনা। কিন্তু "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খর শর হন্তিয়া" মনে এনে দেয় প্রবল বর্ষণের ছবি। আর বিরহের সন্তাপে নায়িকার অভিসারে আর্তি সারা রাত্রি কে' নরে। তা ছাড়া গ্রামীণ বাঙালী ভাদ্রের ভরাকে চিরকাল ভয় করে। ভাদ্রের বন্যা নিদারুণ। ভাদ্র ছাড়িয়ে তা যদি আশ্বিনেও ভাসায়, তাও অতি দুঃখাবহ হয়। এ দুর্যোগের অভিজ্ঞতা বোধহয় সারা পূর্ব ভারতেরই।

ইন্দ্রাণী গুন গুন করে যে গানটি গাইছিল আজকের দিনটি ঠিক সেই রকমই! "আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই/মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই।"···

"গানটা বরং গাড়িতে উঠে, গলা ছেড়ে গেয়ো।" ক্ষৌণীশ রাজা মাপের সিগারেটে টান দিয়ে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ালো, "কথা ছিল ভোর সাড়ে ছটায় বেরুবো। এখন সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। তোমার বাকি কী আছে?"

ইন্দ্রাণী গুনগুনানি থামালো, "কিছুই না। তুমি সিগারেট ধরালে দেখে আমি আবার একবার চেক করে নিলাম, কিছু ফেলে যাচ্ছি কি না।"

"ফেলে গেলেই বা ক্ষতি কী ?" ক্ষৌণীশ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো, "যাচ্ছি তো জঙ্গলে। হাতী হরিণ ময়ূর খরগোস ছাড়া আর যারা আমাদের দেখবে তাদের কাছে আমার ট্রাউজার জামার চাকচিক্য নিজেকেই লজ্জা দেবে। বন পাহাড়ের পুরুষরা এখনো প্রায় উলঙ্গ থাকে—"

ইন্দ্রাণী যেন আঁতকে উঠলো, "কী বললে ? উলঙ্গ !"

"সত্যি কী আর উলঙ্গ না কি।" ক্ষৌণীশ হাসলো। হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীর কপালের উপর পড়া চুলের গোছা বাঁ হাতে সরিয়ে দিল, "খেটে খাওয়া পুরুষরা প্রায় নেংটি পরে থাকে। বরং মুন্ডা ওরাঁও মেয়েরা আজকাল আর কেবল মিলের রঙীন শাড়ি পরে না। জামাও পরে। খুব বাজে লাগে দেখতে।"

ইন্দ্রাণী ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো। চোখে কৌতুকের দ্যুতি, "জামা গায়ে না দিলে দেখতে ভালো লাগে, না ? ওরা সভ্য হোক, তা তোমরা চাও না।"

"ভুল বুঝলে খুশি।" ক্ষৌণীশ হাসলো, "ঐ একটা ব্যাপারে পৃথিবীখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এঙ্গলস সাহেবের কথা আমি কখনো ভুলি নে। আমাদের সভ্যতার আলো থেকে, যখন আমরা বন পাহাড় বা দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের দিকে তাকাই, তখন একটা আশঙ্কা থেকে যায়, আমরা স্পেক্টিকল্স অব প্রসটি-টিউশন চোখে এঁটে ওদের দেখি। কারণ আমাদের সভ্যতার কাছে ওদের নগ্নতার মূল্যবোধ আর সৌন্দর্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। রাজশেখর বসুর সেই কথাটা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই ? কথাটা উনি সাহিত্যে অশ্লীলতার তুলনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, একদল শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায় নগ্ন মেয়েদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা এরকম নগ্ন থাকো, তোমাদের লজ্জা করে না ? উত্তরে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলারা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা যে গোটা শরীরটাকে এমন আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে ঢেকে রেখেছো, তাতে কি তোমরা একটুও লজ্জিত নও ? আমাদেরও কথায় আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে। কিন্তু আমাদের সভ্যতা দিয়ে, ভারতের আদিবাসীদের আমরা যে কেবল পারভারট করছি তা নয়। আমাদের শোষণের পথটা পরিষ্কার করছি। আর ওদের রুচিটাকে নষ্ট করছি।"

ইন্দ্রাণীর ডাকনাম খুশি। ও বাঁ হাত তুলে মনিবন্ধ ক্ষৌণীশের চোখের সামনে ধরলো, "ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে পাঁচ। এই সব বিদগ্ধ ব্যক্তিকে কিছু বলাও মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা শুরু হয়ে যাবে।"

"সরি সরি সরি।" ক্ষৌণীশ প্রায় গানের সুরে বলে উঠলো। ঝটিতি হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীর গাল টিপে দিল। এবং ইন্দ্রাণী কোনো মন্তব্য করার আগেই, একটা স্যুটকেস তুলে নিল হাতে।

ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের হাত চেপে ধরলো, "ও হোঃ ! তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না, তোমাকে স্যুটকেশ নিতে কে বলেছে। তুমি দয়া করে গাড়িটা বের কর। নিতাই সব কিছু তুলে দেবে। স্যুটকেসটা নিয়ে আর দুটো লাগেজ।

মাপে ছোট, তার মধ্যে একটা লাগেজ ভাবছি রেখে যাবো। যাও, তুমি গাড়ি বের কর।"

"একটা লাগেজ রেখে যাবে?" ক্ষৌণীশ দরজার বাইরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ভুরু কুঁচকে চোখ কপালে তুললো, "কোন্ লাগেজটা রেখে যাবে?"

ইন্দ্রাণীর দুই চোখে কৌতুকের ছটা। উদ্গত হাসিটা ঠোঁট টিপে চাপলো, "ঐ ব্যাগটা—যেটাতে কী সব বোতল টোতল আছে। তুমি তো বললেই, কিছু ফেলে গেলেও ক্ষতি নেই।"

ক্ষৌণীশ মাথা নেড়ে, উদ্বিগ্ন মুখে কিছু বলতে গেল। ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হাসলো, "উহ্ এ সব লোককে নিয়ে আর পারি নে। যাও যাও, গাড়ি বের করগে। আর এক মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে।" ও ভিতর দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, "নিতাই মালগুলো গাড়িতে তুলে দাও।"

ক্ষৌণীশের মুখে খুশি বালকের হাসির ঝিলিক। সে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ইন্দ্রাণী ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বেরোবার আগে, শেষবারের জন্য নিজেকে একবার দেখে নিল। নীল ছাপা সিলকের শাড়ি। পাড়হীন, জামাটা শাড়ির রঙে মেলানো। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। কপালের সামনের দিকে একটু ছোট করে ছাঁটা যা সামান্য হাওয়ায় বা ঘাড় ঝাঁকুনিতেই অবিন্যস্ত হয়ে কপালে এসে পড়ে। ডাগর চোখ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তেমনি না, তবে একটু টানাভাবের জন্য আয়ত দেখায়। চোখে কাজল টেনেছে খুব সূক্ষ্ম টানে। নাকটা প্রায় টিকলো। কিন্তু ঈষৎ মোটা। পাখির ডানার মতো ভুরু জোড়া নিখুঁত প্লাক করা। খুঁটিনাটি বিচার করতে গেলে, ওকে শাস্ত্রীয় লক্ষণে সুন্দরী বলা যাবে না হয় তো। কারণ ওর দেহের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চন বা সুবর্ণ না। তবে উজ্জ্বল শ্যাম বটে। লাবণ্যের অভাবটা পূর্ণ করেছে ওর যৌবনের ঔদ্ধত্য। মাঝারি লম্বা শরীরের আকৃতি, গঠন প্রায় নিখুঁত।

পাজামার ওপর গেঞ্জি চাপানো ছোটখাটো চেহারার নিতাই ঘরে এলো, "খুশিদি, সুটকেস আর দুটো ব্যাগই কি যাবে?"

"হ্যাঁ।" ইন্দ্রাণী আয়নার কাছ থেকে সরে এলো, "পলিথিনের কালো ব্যাগটা পেছনের সিটে রেখো। সুটকেস আর ব্যাগটা বুটে ঢুকিয়ে দিও।"

নিতাই সুটকেস আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো, "বুটে? সেটা কি?"

"মানে গাড়ির পেছনের কেরিয়ারে।" ইন্দ্রাণী হাসলো, "ওটাকে বুট বলে। তোমার বউদি কী বলেন?"

নিতাইয়ের মুখের হাসিতে ছায়া পড়লো। কিছুটা অন্যমনস্ক, বউদি কেরিয়ার বলেন। গাড়ির পেছনেও বলেন।"

ইন্দ্রাণী কিছু বলতে যাচ্ছিল। নিতাই তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল। ইন্দ্রাণীর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। মুখ শক্ত হলো। বাইরের থেকে ভেসে এলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। ক্ষৌণীশ গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলো। এঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছে। ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে। ও ওর হাতের ব্যাগটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল। নিতাই ঘরে এসে আর একটা ব্যাগ হাতে তুলে নিল।

"শোনো নিতাই।" ইন্দ্রাণী হাসলো। হাতের ব্যাগের মুখ খুলে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের করলো, "তুমি কিন্তু মাঝে মধ্যে এসে আমার এই ফ্ল্যাটটা দেখে যেও। একেবারে খালি পড়ে থাকবে। এই টাকাটা রাখো।"

নিতাইয়ের মুখের হাসিতে আড়ষ্টতা, কিছুটা প্রাণহীন. বিব্রত, "আগেই তো বলেছি. আপনারা না ফেরা পর্যন্ত আমি মাঝে মধ্যে ফ্ল্যাট খুলে দেখে যাব। টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"আমি তোমাকে খুশি হয়ে সামান্য ক'টা টাকা দিতে পারিনে?" ইন্দ্রাণীর মুখে হাসি। দু চোখের দৃষ্টি নিতাইয়ের মুখের দিকে। হাত বাড়িয়ে দিল "নাও রেখে দাও।"

নিতাই পঞ্চাশ টাকার নোটটা ডান হাত বাড়িয়ে নিল। কিন্তু ওর হাসিতে সেই খুশির ঝলকটা ফুটলো না। ব্যাগ নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াবার আগে জিজ্ঞেস করলো, "এ ব্যাগটা পেছনের সিটে রাখব তো?"

"হ্যাঁ।" ইন্দ্রাণী ঘরের চারদিকে একবার তাকালো। ফিরে গেল আর একবার আয়নার কাছে। পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে নিজেকে চোখের কোণে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো নিজের বুকের দিকে। শরীরের নিচের দিকে। ঈষৎ বেঁকে উঠলো ওর শরীর, মুখে ফুটলো হাসি। তারপরে সেই গানটিই গুন-গুনিয়ে গাইতে গাইতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল; "আমার অঙ্গে সুর তরঙ্গে লেগেছে দোল/রসের প্লাবনে ভাসিয়া যাই আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই।"

নিতাই ঘরে ঢুকলো। নিচু হয়ে ইন্দ্রাণীকে প্রণাম করলো, ইন্দ্রাণী যেন ভারি অস্বস্তিতে হাসলো, "কী করছো নিতাই। ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি তো প্রণাম কেন?"

"বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন।" নিতাই হাসলো, "ভগবান করুন ভালোভাবে ঘুরে আসুন।"

ইন্দ্রাণীর মুখের হাসিতে তুষ্টি ও প্রসন্নতা। নিতাইয়ের মাথায় হাত ঠেকিয়ে বললো, "তুমি তা হলে দরজা বন্ধ করে যেও, আমরা বেরোচ্ছি।"

নিতাই ঘাড় কাত করলো। ক্ষৌণীশের গলা শোনা গেল, "খুশি, হারি-আপ্।"

ইন্দ্রাণী দ্রুত পায়ে গাড়ির সামনে গেল, সামনের আসনের বাঁ দিকের দরজা খুলে, ভিতরে ঢুকে বসলো।

নিতাই দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ক্ষৌণীশ হাত তুলে নাড়লো। নিতাইও

হেসে হাত তুলে নাড়লো। ক্ষৌণীশ গাড়ির ভিতরে ঢুকে, স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে, বাঁ হাতে ইগ্‌নিসনের চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো, তাকালো একবার ইন্দ্রাণীর দিকে। গাড়ি ঘুরিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে, বাঁ দিকে গাড়ি চালালো, তার মুখে প্রসন্ন হাসি, "এভ্রিথিং ইজ ওক্কে! ট্যাংক ইজ ফুল, এঞ্জিন ব্রেক অ্যাণ্ড অল কনডিশনস আর গুড। এখন কেবল…" কথা শেষ না করে ঠোঁট টিপে হাসলো, তাকালো ইন্দ্রাণীর দিকে। চোখের কৌতুকপূর্ণ ছটায় অর্থপূর্ণ হাসি।

ইন্দ্রাণী আগে হলে লজ্জা পেতো! এখন লজ্জা পেলো না। হাসলো, "অসভ্য!"

ক্ষৌণীশ পঞ্চাশ পেরিয়েছে বছর দুয়েক। চুলে পাক ধরেছে গোটা মাথায়। তবে সাদার অংশ সেই পরিমাণে বাড়েনি, যাতে ওর ঢেউ খেলানো দীর্ঘ কেশ ধূসর বর্ণ হয়ে উঠতে পারতো। দূর থেকে দেখলে কালোই দেখায়। কাছে এলে পাকা চুলের বহরটা চোখে পড়ে। তবে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি তারুণ্য আর স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ওর শরীরে। ওর কালো আয়ত দুই চোখ। পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো উন্নত নাসা, নিভাজ মুখ। তারুণ্য লক্ষ্য করা যায় ওর চলাফেরায়। ওর প্রতিটি অটুট দাঁতের ঝকঝকে হাসিতে। মেদবর্জিত নাতিদীর্ঘ পুরুষ। ভুরু জোড়া মোটা আর কালো। চালসের বয়সটা পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। অতএব প্লাস পাওয়ারের চশমা লেখাপড়ার প্রয়োজনে ব্যবহার অনিবার্য। যদিচ ও সব সময়ে চশমা পরে থাকে না, তবু যে-কোনো খুদে শার্লক হোমসও ওকে জিজ্ঞেস করতে পারে, "মশাই চশমা ছাড়া চলেন কী করে?"

ক্ষৌণীশের নাকের দু পাশে চশমার দাগ আছে। অনেকের ঠিক নাকের মাঝ-খানে চশমার দাগ দেখা যায়। ওটা নির্ভর করে নাকের গঠন আর চশমার ফ্রেমের ওপর। তবে ক্ষৌণীশ এখনো, খালি চোখে সকালের সংবাদপত্রে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতে পারে। যে-কারণে ওর স্ত্রী, ঠিক ঈর্ষাকাতর না হয়েই অবাক হয়ে বলে, "চশমা ছাড়া, আমি খবরের কাগজের মাঝারি অক্ষরের হেডিং পর্যন্ত দেখতে পাইনে। আর তুমি খালি চোখে দিব্যি খবরের কাগজটা গোগ্রাসে গিলে ফেললে?"

"তাই তো অমল।" ক্ষৌণীশ হাসে, "কথাটা মিথ্যে বলোনি। কিন্তু নিরামিষ আর আম জলপাইয়ের আচারে বেশি ভক্তি থাকলে চোখের নজর তার পাওনা পায় না। আর ওটা তুমি চালিয়ে এসেছো ছেলেবেলা থেকে। এখন চোখের নজরকে দোষ দিতে পারো না।"

অমল—অমলা নাক কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে, "বেঁচে থাক আমার নিরামিষ আর আচার। তা বলে তোমার মতো মেছো আমি কোনো দিন হতে পারিনি। পারবোও না। ওরকম নির্বিচার যা মাছ পেলুম, তাই খেলুম, আমার দ্বারা হবে না।"

"ঐখানে গোলমাল করলে।" ক্ষৌণীশের প্রসন্নতায় ছায়া দেখা যায় ক্বচিৎ, "নির্বিচার কথাটা ঠিক বললে না। আমি মাছ মাংসের ভক্ত বটে। তবে নির্বিচারে গ্রহণ করিনে। তোমাদের কাছে বড় রুই মাছের যে-কোনো অংশই প্রিয়। আমি পুঁটি মৌরলার লোক। খলসে ট্যাংরা নতুন জলের কচি কই পেলে, রুইয়ের পেটিতে আমার নজর যাবে না। বড়ো মাছের ছাল দেখলেই আমার অভক্তি। হ্যাঁ, খাদ্যরসিক হিসেবে একটা এক কেজি-এর ইলিশ আধখানা অনায়াসে খেতে পারি। তবে ন মাসে ছ মাসে।"

অমলা ঝটিতে ঘাড় বাঁকিয়ে, তেমনি নাক কোঁচকায়, "খলসে ইলসে চিনিনে। কিন্তু ঐ যে সাপের মতো মাছগুলো খাও? বান না কী মাছ বলে? আর গেড়ি গুগলি? মাগো।"

"অবাক লাগে অমল।" ক্ষৌণীশ হেসে বাঁচে না, "আমি বঙ্গ যুক্ত আলের পো। আর তুমি হলে রাঢ়ের মেয়ে, খাঁটি ঘটি। গেড়ি গুগলি খেতে শিখেছি এই রাঢ় বঙ্গে। গেড়ি গুগলির নাম শুনলে আমার মা দিদিরা যেমন নাক সিঁটকোয়, তুমিও দেখছি তেমনি। অথচ বিষ্ণুপুরে তোমার দিদিই আমাকে ঐ মহার্ঘ প্রোটিনটি রেঁধে খাইয়াছেন। আর বিদেশে থাকতে ঝিনুক সেদ্ধ তার খোল ছাড়িয়ে যে নরম প্রাণীর মাংসপিণ্ডটি··"

অমলা দুহাত তুলে ক্ষৌণীশের মুখ চাপা দিতে উদ্যত হয়, "ওয়াক! দোহাই তোমার। বিদেশে গরু মোষ থেকে শুরু করে ব্যাং শামুক ঝিনুক কী যে খেতে না, ঈশ্বর জানেন। আমি চিরকাল অন্ধ হয়ে থাকলেও তোমার ঐ সব বস্তু চোখে দেখতেও চাইনে।"

"অমল, ঐ জন্যই এখনো হাফ সেঞ্চুরি পার করে সকালে চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে খবরের কাগজটা পড়ে ফেলতে আমার কষ্ট হয় না।" ক্ষৌণীশ হাসে, "অবিশ্যি শিশু বয়সে মাতৃস্তন্যটা নিশ্চয়ই কাজে দিয়েছে, সেটা তুমিও পেয়েছো। অথচ দেখ, তোমার চেয়ে বোধহয় চোখের কাজটা আমার বেশি করতে হয়।"

অমলা হাত জোড় করে, "মশাই তোমার জীবনে সব কিছুরই ডিগ্রিটা বেশি। সেটা মানি। কিন্তু আমার যে প্লাস মাইনাস দুইয়েতে ঝামেলা করেছে।"

ক্ষৌণীশ এ পর্যন্ত এসে থমকে যায়। অমলাকে ওর স্বাস্থ্যের কারণে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বয়সের তুলনায় ওর চোখ দুটো অকালেই বেশি খারাপ হয়েছে, সে দোষ ওর না। বস্তুতপক্ষে ক্ষৌণীশের নানা মাছের তুলনাটাও নিতান্তই রসিকতা। এই গরীব দেশের গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য যে শহরের মানুষের তুলনায় খারাপ, সেটা না বললেও চলে। সেই যে কোন্ এক কালে, হাতে ঘৃতের গন্ধ লেগে থাকতো, আর গ্রামের গৃহে থাকতো অন্ন, গৃহ সংলগ্ন বাগানে টাটকা সবজি, গোয়াল ভরা দুগ্ধবতী গাভী, পুকুর ভরা মাছ, সেই ছবিটা কবেই বিবর্ণ হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছে। নগদ কড়ির জোয়ারে ফেঁপে ফুলে উঠেছে এই মেট্রোপলিটন নগরী কলকাতা। চোরা বিত্তের যখ দেওয়া ধনের নির্বিচার ভোগের গ্রাসে, গ্রামে তার সর্বস্ব বিকিয়ে বসে আছে। নিজের গ্রাসের জন্য

কিছুই সে ধরে রাখতে পারে না। চোরা বিত্তের থাবাটা এমনই মারাত্মক, তার আছে একটা জাদুকরী চাঁদির মোহ। ফলে তার নিষ্ঠুর চেহারাটা ধরা পড়ে না। গ্রাম শুষে বাঁচে শহর। আর সমগ্র গ্রাম-কেন্দ্রিক সদর শহরগুলো পর্যন্ত শুষে বাঁচে বৃহৎ সুন্দর রাক্ষুসে নগর। যতো শ্রেষ্ঠ খাদ্য পানীয় চোরা বিত্তের গ্রাসে, মেট্রোপলিটন নগরের জঠরকে স্ফীত করছে। গোলা, গোয়াল আর পুকুরের যা কিছু সব নগরের একাংশের গর্ভে।

অমলা নিম্নবিত্তের গরীব ঘরের মেয়ে। জন্ম যার গ্রাম-কেন্দ্রিক ছোট শহরে। ব্রত পুজোর নানা আড়ম্বরের মধ্যে, হিন্দু পরিবারের যে বৈশিষ্ট্য তেমন এক পরিবারে ওর জন্ম। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, সেটা এ দেশের সব ঘরের অনিবার্যতা। তবু কিছু রকমফের আছে। আর সেটা আছে শ্রেণীর বিত্তের মর্যাদায়। ক্বচিৎ কোথাও মানসিক ঔদার্যতায়। কিন্তু অমলা জানতো বাপ দাদারা যেমনটি ভালো বুঝবেন, সংসারটা সেই বোঝা দিয়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এমন কি দৈনন্দিন খাওয়া পরার মধ্যেও কর্তার ইচ্ছেরই প্রতিফলন। ফলে, এটা খেতে নেই, সেটা খেতে নেই করে, অভাবের আহার্যটাও তার মৌলিক গুণগুলো থেকে বঞ্চিত হতো। ফলে, স্বাস্থের পুষ্টি যে কোথায় মার খাচ্ছে, সেটা জানা যায় অনেক পরে।



ক্ষৌণীশ আগেই বলেছে, ও হচ্ছে বঙ্গ + আলের সন্তান। বঙ্গাল আর বঙ্গালবাসীর একটাই অর্থ। অতএব ও নিজেও কলকাতার মতো সর্বগ্রাসী নগরে জন্মায়নি। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে, শাকপাতা খেয়ে সাতে পাঁচে বেঁচে থাকা, ওর জীবনটা বেড়ে উঠেছে সেই রকম অবস্থার মধ্যে। ধনীর ঘরে জন্মায়নি। কিন্তু ঐ শাক পাতার মধ্যে বঙ্গের জলাশয়ের শাক ছাড়াও যে মাছের যোগাযোগটা ছিল নিবিড়। সবজির মধ্যে, বঙ্গে আলু কোনোকালেই প্রিয় ছিল না। বরং সর্ষে শাক, চালকুমড়োয় যা মেলে স্বাদু সবজিতেও অনেক ক্ষেত্রেই তা মেলে না। গ্রাম ছেড়ে বঙ্গের (অখণ্ড) দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে ওদের গোয়াল বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ওদের দরিদ্র পিতা দরিদ্রের মতোই যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ ক্রয় নিশ্চিৎ বরাদ্দ দিয়েছিলেন। মাছের কোনো বাছবিচার ছিল না। অতএব শস্তাগণ্ডার সবরকম খেতেই ওরা অভ্যস্ত ছিল। যে কচ্ছপ এখন হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, ক্ষৌণীশের বাল্যে সেটা অকল্পনীয় ছিল। ফলে 'প্রোটিন' নামক খাদ্যে ছেলেবেলা থেকে বঞ্চিত ছিল না।

অমলার চোখের নজর নিয়ে প্লাস মাইনাসের কথাটা কেবল নজরের বৃত্তান্তেই শেষ হয়ে যায় না। আরও গভীরতর বৃত্তান্ত কিছু আছে। ছেলেবেলা থেকে ওকে বাহিরের স্বাস্থ্যে যেমনই দেখাক, ভেতরে ভেতরে তেমন পোক্ত ছিল না। সেই সঙ্গেই জীবনে যদি বা কিছু শ্রী আছে, ওর অন্তরে শান্তির লেশ মাত্রা নেই। বরং ওর হৃৎপিণ্ডটাকে নিংড়ে ওর সমস্ত সততার ভাগটা ভোগ করছে ক্ষৌণীশ। নিষ্ঠাহীন বললে কম হয়, স্বামী হিসাবে ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাকে বলে অবিশ্বস্ত। স্ত্রীকে লুকিয়ে কিছু না করার মধ্যে পুরুষের দাপটটাই প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই দাপট বস্তুটা যে মূঢ়তা, সেটা যে পুরুষ বোঝে, অবিশ্বস্ত হয়েও সে একরকমের বিড়ম্বিত। ক্ষৌণীশকে সেই শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে ফেলা যায়। অমলার চোখের নজর নিয়ে যে-প্লাস মাইনাসের কথাটা ওঠে, তার সঙ্গে ওর অন্তরের যোগ বিয়োগটাও বুঝে নিতে হয়। ক্ষৌণীশ সেটা বোঝে বলেই এক সময়ে ওকে কথা থামাতে হয়।

স্বামী হিসাবে ক্ষৌণীশ যতোটা অবিশ্বস্ত, আমলা ততোটাই বিশ্বস্ত। এ সংসারে ক্ষৌণীশের কৃতিত্ব, জীবনের অনেক কষ্টের উজান বহে, ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার মধ্যে অমলার কোনো অবদান নেই, এমন কথা বলার মতো বেইমানি ক্ষৌণীশের নেই। তবু পুরুষ শাসিত এই সমাজে, ভিতর বাইরের যুদ্ধে, পুরুষের যোগ্যতার পরিচয়টা বেশি দিতেই হয়। নারী তাকে সাহায্য করতে পারে, বেশির ভাগ নারীর মধ্যে সেটা এ গ্রহে অদ্যাবধি কম বলে তার কষ্টের দাবীটাকে সে সোচ্চারে ঘোষণা করে না। তার সেই প্রকৃতির মধ্যেই আছে একটা সৌন্দর্য। কিন্তু বাকি দিক থেকে, সংসারটাকে সংসারের প্রকৃত স্বাদে ভরিয়ে রাখার কৃতিত্ব একমাত্র অমলারই আছে। প্রাণের আসল ক্ষতের যন্ত্রণাটাকে পুরোপুরি হাসি মুখে মেনে না নিলেও সংসারটা যে আজও সকলের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা অমলারই স্বাস্থ্যহীন দুর্বল কাঁধে ভর করেই। ক্ষৌণীশ তা মর্মে মর্মে জানে বলেই দাপটে মূঢ় হয় না।

ক্ষৌণীশের খুঁটি আদৌ আছে কি ন, ও নিজেও জানে না। খুঁটি বলতে সংসারের ঠাঁই। সন্তানদের সম্পর্কে ওর অসীম দুর্বলতা। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতোই। যে দুই ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তারা তাদের বাবাকে কী চোখে দেখে, কতোটা ক্রিটিকাল, ক্ষৌণীশ সে খবর রাখে না। সন্তানকে নিয়ে স্নেহ ও যত্নটাই ওর কাছে বড়। কর্তব্যনিষ্ঠও বটে। কিন্তু তাতে যে সন্তানদের মানসিক কোনো বৈকল্য ঘটতে পারে তাদের বাবাকে নিয়ে, সে বিষয়ে ও উদাসীন। এবং উদাসীন অমলা সম্পর্কেও। স্বামীকে অন্য মেয়ের প্রেমিকের ভূমিকায় দেখতে, কোনো স্ত্রীই চায় না। অমলাও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু না, তথাপি ব্যতিক্রম আছে। স্বামীর অবিশ্বস্ততার কথা নির্ঘাৎ জেনেও অশান্তিকে বড় করে, সংসারে অনাচ্ছিষ্টি করে না। সব চেয়ে বড় কথা, স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত, স্ত্রীর পক্ষে সেটা যে একটা বেদনাদায়ক অপমান, অমলার প্রাণের আসল

মারটা সেখানেই। সেখানে যোগ বিয়োগের ফল শূন্য না, আঘাত।

ক্ষৌণীশের বিশ্বাস, চেতনে আর অবচেতনেই হোক, অন্তরে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বহুগামী। দীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্কারে, কথাটা মানতে চায় না কেউ। অতএব বিতর্কিত। অথবা বলা যায়, দীর্ঘকালের বন্ধনে ও সংস্কারে রমনী পুরুষের ক্ষেত্রে যখনই বহুগামিতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখনই ব্যক্তি জীবনে দেখা দিয়েছে নানা অঘটন আর বিপত্তি। একগামিতার গায়ে একটা আদর্শের ছাপ মারা আছে। অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষই ঐ একগামিতার ছাপমারা নামাবলীটা গায়ে দিয়ে জীবন যাপন করে। নামাবলীটা যদি আপত্তিকর শব্দ হয় ওটা যাক জাহান্নামে। একগামিতাকে অধিকাংশ আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করেছে।

বহুগামিতার মধ্যে মানুষ একটা নির্লজ্জ ভোগের সন্ধান পায়। বহুগামিতার সমর্থনে কেউ কথা বলতে নারাজ। ক্ষৌণীশ স্বীকার করে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নির্বিশেষে অন্তরে বহুগামী হলেও পুরুষ যতো বেশি এর সুযোগ নেয়, স্ত্রীরা সেক্ষেত্রে লাখে না মিলল এক। তুলনায় স্ত্রীরা একগামিতারই সমর্থক। তাদের জীবনেও সেটা লক্ষ্যণীয়। কারণটা হয় তো যতো না বেশি বন্ধনের, সংস্কারের বাধাটা তাদের মনে অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ফলে সমাজে সংসারে শুভ ও শান্তির দিকটা রক্ষা পেয়েছে অনেক বেশি, আর পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষই বহুবল্লভাচারী এটাই এক কৌতুক।

ক্ষৌণীশ ভাবে সেই কোন্ দূর অতীত কালের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজে সে যে বহুগামিতার স্বাধীনতা ভোগ করে স্ত্রীলোকদেরও একদা সেই অধিকার ছিল। এবং তারা সেই স্বাধীনতা অনুযায়ী ইচ্ছে মাত্র ভোগবাসনা চরিতার্থ করতো। বিশেষভাবে পুরুষ তার দৈহিক সুযোগের সাহায্যে, বহুমুখী কাম প্রবৃত্তিকে একমুখী করার প্রয়াস পেয়েছিল। শৃঙ্খলার নামে, দৈহিক শুচিতার নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছিল। স্ত্রীরা হয়েছিলেন সতী সাধ্বী 'পতিসোহাগিনী।' পুরুষ তার নিজের শক্তিতে বহুগামিতাকে বজায় রেখেছিল। আজও রেখেছে।

ক্ষৌণীশ জানে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে অন্তরে বহুগামী এ তত্ত্বটা কেউ মানতে চায় না। মানতে পারার মধ্যে দুটো বিষয় আছে। একটি সৎ স্বীকারোক্তির শক্তি, অথচ নিজের জীবনে বহুগামিতার স্থান নেই। আর একটিতে স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের জীবনেই বহুগামিতার প্রমাণ রাখা। শেষোক্তদের মধ্যে ক্ষৌণীশের স্থান, অথচ অমলার জীবনে এটা চিন্তার অতীত। ক্ষৌণীশের তত্ত্বটা ক্ষৌণীশের নিজস্ব আবিষ্কার বা ছাপ মারানো। মনুষ্য চরিত্র যাদের অনুশীলনের বিষয়, এই তত্ত্বটির আবিষ্কারক সেই সব পণ্ডিতরা। অমলা তা জানে। জেনেও নিজের রুচি ও মানসিকতা, কোনোটার সঙ্গেই উক্ত তত্ত্বের বিন্দুমাত্র সায় নেই। তর্কের খাতিরে অবচেতনের কথাটা ও মেনে নিয়েই বলে, "আমার অজান্তেও যদি তা থাকে, জোর দিয়েই বলতে পারি, সেই গহীন অতল অন্ধকার

থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার শক্তি তার হবে না। সেটাকে সংস্কার রুচি সংকল্প যা খুশি তাই বলতে পারো।"

অকলাকে যারা জানে, তারা বিশ্বাস করে, ওর কথার মধ্যে কোনো অতিশয়োক্তি নেই।

ক্ষৌণীশের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী ব্যতিরেকে ইন্দ্রাণী প্রথম রমণী না। সংখ্যার গণনার বিবরণে না গিয়ে বলা যায়, একাধিক রমণীর একজন। প্রণয় গুপ্ত হলেই নাকি তার পালে হাওয়া লাগে জোর। কিন্তু এ নগর সমাজে, সমাজ বলে কিছু না থাক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ যেন কোথা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সহসা তার গোয়েন্দা দৃষ্টি খুলে যায়। সারমেয় সুলভ ঘ্রাণেন্দ্রিয় হয়ে ওঠে অতি তীব্র। গুপ্ত প্রণয় বোধহয় তার শ্রেষ্ঠ শিকার, আরও বহুতর মুখরোচক কেচ্ছা তো আছেই। অতএব ক্ষৌণীশ যতো ধুরন্ধরই হোক, ঐ না-থাকাও সমাজের কাছে ও অসহায়। যতো গোপনেই ও অভিসার করুক, সমাজের সারমেয়সুলভ ঘ্রাণেন্দ্রিয় হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা চক্ষু দিকে দিকে অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর যখন অপরাধীর সন্ধান মেলে, তখন শাসনের মহামান্য 'দরজা', শিকারের স্ত্রীর কানে অতি পটুতার সঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়। কারণ ঐ কাজটিকে সমাজ তার কল্যাণকর কর্তব্য বলে জানে।

অথচ এই মেট্রোপলিটন নগর কলকাতাকে দোষারোপ করা হয়, অতি নিষ্প্রাণ আখ্যা দিয়ে। এ নগরে কেউ কারোর খবর রাখে না। মুখোমুখি, পাশাপাশি এক যুগ বাস করে কেউ কারোর পরিচয় রাখে না। কিন্তু অভিজ্ঞরা জানে, এর মধ্যেই আছে একটি অদৃশ্য সমাজ। ভারি কেতাদুরস্ত বহিরাঙ্গনের আড়ালে, একটি অভূতপূর্ব গ্রাম্য সমাজ এখানে বিরাজ করছে। এর জন্য গ্রাম গায়ে পড়ে দোষ নিলে মুশকিল। গ্রাম সমাজের সীমাবদ্ধতা, তাকে অতিঘনিষ্ঠ করে রেখেছে। সেখানে অজস্রতা আর অজস্রের মধ্যে ডুব দেবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু কলকাতার মতো নগরে আছে। তত্রাচ এই কলকাতাতেই ঐ অদৃশ্য সমাজটির অস্তিত্ব সজাগ ও সপ্রাণ আছে। কিন্তু, ঐ সমাজটির স্বার্থ কী ?

বাঙলায় আশ্চর্য রকম সব 'কথা' আছে। কথাগুলো অনিবার্য কারণেই সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে একটি কথা হলো, "ভালো করতে পারিনে, মন্দ করতে পারি। কী দিবি তা দে।"

বেচারী ক্ষৌণীশ। ওর গুপ্ত প্রণয়ের পালে যখন হাওয়া বেশ জোর বহে, স্বভাবতই তখন গুলাবী নেশায়, তাল লয় মান জ্ঞানটা কম থাকে। আর আগুন যেখানে লাগবার, লেগে যায়। ও যখন ভাবছে, ওর প্রণয়িনীর সামাজিক পরিচয়টা অমলার কাছে, গোপন নেই, অতএব সেখানে প্রণয়ও থাকতে পারে না, এবং গুপ্ত প্রণয়ের পক্ষে পরিস্থিতিটি ভারি সুবিধের, তখনই ধরা পড়ে। ইন্দ্রাণীর ক্ষেত্রেও সেরকমটিই প্রথম ঘটেছিল।

অবিবাহিতা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, ক্ষৌণীশের পরিচয় ঘটেছিল সুধাকরের মারফৎ। সুধাকরকে অনেকে মধুকর বলে মনে করে। ক্ষৌণীশ জানে, সেটা ভুল।

সুধাকর চক্রবর্তীর কাছে, জীবনের সব কিছুই ছিন্নমূল, আলগা আর হালকা। লেখা পড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট বলতে যা বোঝায়, ও ছিল তাই। কিন্তু ঐ ব্রিলিয়ানসির সঙ্গে কেরিয়ারিজমটা যে কেন শিকড় গাড়তে পারেনি, সেটাই সবাইকে অবাক করে। বিদ্যার জোরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা, সুধাকরকে মানায়। অথচ ও সেদিকে যায় নি। কোথায় যেন ওর একটা আলস্য আছে। অথবা সেটা আলস্য না। কোনও কিছুর প্রতিই ওর তেমন আকর্ষণ নেই। এখন ও যে চাকরিটা করে, সেটা ওর বিদ্যে বুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট বলা যায় না। কিন্তু ও সুখী। ওর জীবনযাত্রাও বেশ সরল। বিয়ে করেনি। করবে না বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কারণ বয়সটা কম হয়নি। অবিশ্যি বাঙলায় একটা প্রচলিত শব্দ আছে, ধক্ থাকলে এ বয়সেও বিয়ে করা যায়। সে বিষয়ে সুধাকরের অপরিসীম উদাসীনতার কথা সবাই জানে। অথচ সুধাকরের বান্ধবীভাগ্য নিয়ে সবারই মাথা ব্যথা। ওর বন্ধুভাগ্যও খারাপ না।

সুধাকরের চেহারাটিও খারাপ না। মেদবর্জিত দীর্ঘকান্তি পুরুষ। চোখে মুখে স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বলতা। ওর মাথার টাকেও যেন রয়েছে একটা বৈদগ্ধতা। মোটা লেন্সের চশমায় আপাতদৃষ্টিতে বেশ গম্ভীর, আসলে সুধাকরের মতো পরিহাসপ্রিয় পুরুষের সাক্ষাৎ আজকাল কম মেলে। বাড়িতে আছেন ওর বিধবা মা। একমাত্র বিবাহিতা বোন আমেরিকা প্রবাসী। অত্যন্ত প্রয়োজনেই কোম্পানি ওকে একটা গাড়ি দিয়েছে। গাড়ির চালক ও নিজে।

ক্ষৌণীশ দু-একবার ইন্দ্রাণীকে সুধাকরের গাড়িতে দেখেছে। ঐ রকম অনেক মেয়েকেই ওর গাড়িতে দেখা যায়। কারণটাও পরিষ্কার। সুধাকরই একমাত্র পুরুষ, যার কাছে মেয়েদের কোনো বিপদের আশঙ্কাই নেই। প্রথমত আজ পর্যন্ত কোনোও মেয়ের কাছ থেকে ওর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়নি। দ্বিতীয়ত কোনো মেয়েকে আজ পর্যন্ত ও প্রেম নিবেদন করেনি। তৃতীয়ত বরং উলটে শোনা গিয়েছে, কোনো মেয়েই হয় তো ওর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। এবং সেই মেয়েদের অভিজ্ঞতা, সুধাকর হচ্ছে এক ধরনের মোহমুক্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন হালকা চরিত্রের পুরুষ। প্রেমের কোনো অনুভূতিই নেই ওর মধ্যে। অতএব ওর সঙ্গে না চলে প্রেম করা, এমন কি ফ্লার্ট করেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা হাসি-মসকরায় পর্যবসিত হয়। এমন পুরুষেকে বিয়ে করার কথা কোনো মেয়ে ভাবতে পারে না।

অন্য মেয়েদের অভিজ্ঞতার চেয়ে, ক্ষৌণীশের কাছে ইন্দ্রাণীর অকপট স্বীকারোক্তিই সুধাকরকে যথার্থ চিনিয়ে দিয়েছেন। ক্ষৌণীশ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, ইন্দ্রাণী একান্তভাবে প্রকৃতি ঠাকুরানীর হাতে গড়া পুতুল। তা বলে ওর বুদ্ধির ধার কিছু কম নেই। সংসারটাকে চিনেছে ভালো মন্দর মধ্য দিয়ে। তবে, ভালোর চেয়ে মন্দ দিকটাই ও দেখেছে বেশি। নিজেদের পরিবারে বটেই, বাইরের জীবনেও। মানুষকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে ওর জীবনে বিস্তর। যার পরিণতিতে এই সাতাশ বছর বয়সেই ও হয়ে উঠেছে বেপরোয়া।

অবিশ্যি বেপরোয়া হবার মতো সাহস ওর আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের পা রাখার জায়গাটা যা যথেষ্ট শক্ত রাখা দরকার, সেই বাস্তব বোধটা ওর টনটনে। অতএব আধুনিক কেতায় গড়া "প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে" ম্যানেজারেসের চাকরিটা পেতে ওকে যতোটা বেগ পেতে হয়েছে, ততোটাই বেপরোয়া হতে হয়েছিল। প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চাকরির প্রথম পদক্ষেপে মেনে নিতে হয়েছিল কিছুটা হীনমন্যতাকেও। সে-কথাটা ও ক্ষৌণীশকেও কোনোদিন সব প্রকাশ করে বলতে পারেনি। কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয়, এরকম একটা বিশ্বাস ওর চার পাশের পরিবেশ আর জগতই ওকে দিয়েছে।

ক্ষৌণীশ সে-সব জানলেও, ইন্দ্রাণীর গোপন ক্ষতটাকে খোঁচাতে চায়নি। কেন না, তা হ'ল খানিকটা গ্লানি আর মালিন্য ছাড়া আর কী-ই বা প্রকাশ পেতো। কিংবা পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে দেখা দিতো একটা তিক্ততা। সেটা উভয় পক্ষেরই লোকসানের বরাত হতো। কেন, সে-বিষয়টা ওদের জীবনের আর সম্পর্কের ভিতর দিয়েই বোঝা যাবে।

ইন্দ্রাণীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পুরুষ মাত্রেই প্রকৃতির হাতের (এ ক্ষেত্রে একান্তভাবে রমণীর) ক্রীড়ানক। নিজের সম্পর্কেও ওর স্পষ্ট মন্তব্য, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছি, অথচ ছলনা করবো না, তা কেমন করে হয়। ওটা তো আমাদের জন্মগত। আধুনিক কেতায় ওসব ইউমেন্‌স লিব-এর নামে যতো কথাই বলা হোক, যে আমরাও 'মানুষ' কিন্তু আমি তো নিমেষের জন্যও ভুলতে পারি নে, মানুষ তো বটে। তবে মেয়ে! এটা হলো বাস্তব। আর এ বাস্তববোধের মধ্যে কোনো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেরও ব্যাপার নেই। তা হলে আর অধিকার বা স্বাধিকারের আগে, স্ত্রী কিংবা নারী জাতির নামটা বলার দরকার হতো না। সুতরাং আমি মেয়ে। একশো ভাগ মেয়ে। মেয়েমানুষ। যেমন পুরুষরা পুরুষ মানুষ। মহিলা না বলে মেয়েমানুষ বললেই আমার মান চলে যায় না। আর মেয়েদের যে-সব বৈশিষ্ট্য, পুরুষদের তা নেই। মেয়েরা তাদের বৈশিষ্ট্যটাকে কাজে লাগাবেই। যেমন পুরুষরাও তাদের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়।

ইন্দ্রাণী এই বিশ্বাস থেকেই সুধাকরকে নিয়ে মেতেছিল। ও ওর প্রকৃতিগত সমস্ত আয়ুধ নিয়ে সুধাকরকে ঘিরে ছলনার জাল বিস্তার করেছিল। তার জন্য যতোদূর যাওয়া যায়, ততো দূরই ও গিয়েছিল। বাক্যে কটাক্ষে হাস্যে লাস্যেও যখন হালে পানি পায়নি, তখন ইন্দ্রাণীর এমনোতর একটা ধারণা হয়েছিল, সুধাকর লোকটা গবেট। এতোই স্থূল, ঐ সব বাক্যে কটাক্ষে হাস্যে লাস্যে ওকে ধরাশায়ী করা যাবে না। ঐ সব সংকেত ইশারা বোঝবার মতো অনুভূতি ওর নেই। অতএব সুধাকরের মতো স্থূল রাস্তাই ওকে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকে ও এক উইক এণ্ড-এ সুধাকরকে রাজি করিয়েছিল, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বনগাঁয়ের, ইছামতী নদীর ধারে পারমদন-এর বাংলোতে রাত কাটাবার। রাজি করানোর অর্থ হলো, সুধাকরকে দিয়েই বাংলো বুক

করিয়েছিল। ভেবেছিল, আপত্তি থাকলে সুধাকর পারমদন-এর মতো ফরেস্টের বাংলো বুক করতে যাবে না। ইন্দ্রাণী জায়গাটার নামই কেবল শুনেছিল। কোনোদিন যাবার উৎসাহ বোধ করেনি। কারণ বাংলোটা বুক করতে হলে বন বিভাগেই যদিও যেতে হয়, শুনেছিল, বন বলতে কিছু নেই। আছে শুধু নিরিবিলিতে একটা বাংলো। বাংলোটা ইছামতীর ধারে। ঐটিই ছিল বড় আকর্ষণ। এমন কি বিজলি বাতিও ছিল না সেই বাংলোয়।

ইন্দ্রাণী পারমদন-এর বাংলোর কথা জানতে পেরেছিল, নদীয়ার বেথুয়াডহরির ফরেস্ট বাংলোয় বেড়াতে গিয়ে। সেটা ছিল প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। উনিভারসিটির শেষ বছরের পরীক্ষার জন্য জোর প্রস্তুতি চলছিল। তবে প্রস্তুতি চলছিল যে-অধ্যাপকের কাছে, তাঁর একটু নেকনজর ছিল ওর ওপর। নেকনজরের কারণটা ইন্দ্রাণীর ভালোই জানা ছিল। তার জন্যে যতোটুক উসুল করে নেওয়া দরকার, তা ও করে নিয়েছিল। ঐ সেই, কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয় বিশ্বাসেই। অতএব সেই প্রস্তুতিপর্বের সময়েই, অধ্যাপক হঠাৎ ঠিক করেছিলেন, বেথুয়াডহরির বন বাংলোয় দু রাত্রি সস্ত্রীক কাটিয়ে আসবেন। অধ্যাপক দম্পতির একমাত্র কন্যা, ইন্দ্রাণীর চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের ছোট। ঐটুকু তারতম্যে, বন্ধুত্বে আটকায় নি। ওকে অধ্যাপকের স্ত্রী যতোটা না বুঝতেন, তাঁর মেয়ে ততোটাই বুঝতো। বাবার ছাত্রীটির ওপর স্নেহাধিক্য একটু মাত্রাতিরিক্ত। সেটাই প্রমাণ হয়েছিল, অধ্যাপক যখন নিজেই ইন্দ্রাণীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, "আমরা ফ্যামিলির তিনজন যাচ্ছি। বাংলোয় আছে দুটো বেডরুম। তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে, আমাদের খুকু (মেয়ে) একজন সঙ্গী পাবে। তোমার ইচ্ছে হলে, তোমার বাবাকে টেলিফোনে বলে তাঁর মতামত নিতে পারি।"

'স্যার'-এর ইচ্ছেটা বুঝতে ইন্দ্রাণীর এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। ও ছিল ইংরেজির ছাত্রী। তখনও বাকি ছিল, মোক্ষম নোটস্ কিছু হাতে আসা। ঐ সুযোগ কখনও ছাড়া যায় না। ও খুব খুশি হয়েও ঈষৎ কুণ্ঠা দেখিয়েছিল, "স্যার একটা করে দিন যাচ্ছে, আর ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। শিয়রে সংক্রান্তি। এদিকে বেশ কিছু নোটস্ আজ পর্যন্ত হাতেই আসেনি।"

"বোকা মেয়ে!" স্যার ইন্দ্রাণীর পিঠ চাপড়াতে গিয়ে, হাসতে হাসতে ঝটিতি একটু গায়ের কাছে টেনে নিয়েছিলেন, "নোটস্-এর জন্য তোমার ভাবনা? অবাক করলে! আজই দিয়ে দিচ্ছি সব। তা হলে তোমার বাবাকে টেলিফোনে ?"

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়েছিল, "কোনো দরকার নেই স্যার। বাবাকে আমি বললেই যথেষ্ট।" মনে মনে বলেছিল, "আমি বোকা মেয়ে না হলে আর তোমার মতো চালাক অধ্যাপক কে আছেন? স্নেহ করো, কিন্তু মালটি ছাড়ো। ফার্স্ট ক্লাস না হোক, সেকেণ্ড ক্লাসটা পেতে দাও। ট্রামে বাসে তোমার চেয়ে বেশি সুযোগ নেয় ভিড়ের যাত্রীরা।"

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতেই ক্ষৌণীশকে এসব কথা বলেছিল। তবে ইন্দ্রাণী ছাত্রী হিসেবে মোটেই কাঁচা ছিল না। ওর নিজের ওপর যথেষ্ট কনফিডেন্স ছিল। তার সঙ্গে অধ্যাপকের টিপস্ (ভাষান্তরে নোটস্) পরীক্ষার বাজি ধরার পক্ষে খুবই সাহায্যকারী ছিল। বেথুয়াডহরিতে গিয়ে, ও সত্যি মুগ্ধ হয়েছিল। কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরের রাস্তার ধারে এমন একটি সুন্দর বনানী থাকতে পারে, বাইরে থেকে কিছু বোঝাবার উপায় ছিল না। সবুজ বনানী আর দুর্বা ঘাসের বড় অঙ্গনটি ছিল একটি জলাশয়ের ধারে। বাঁধানো ঘাটটি প্রমাণ করেছিল, কোনোও এককালে দু কিলোমিটার বর্গের সেই বনানী ছিল একদা একটি গ্রাম। গাছপালাও ছিল বেশ নিবিড়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, গ্রাম উৎখাত করে, গুপ্ত অ্যাণ্টি এয়ার ক্রাফট-এর তাঁবু পড়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও, পুরনো গ্রাম আর ফিরে আসেনি। উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষ তখন নতুন গ্রামবাসী হয়ে গিয়েছিল। সরকার ভালো বুঝেই, বেথুয়াডহরির সেই বনানীতে ছেড়ে দিয়েছিল কয়েক জোড়া হরিণ। গোটা বনানী ঘিরে দিয়েছিল মোটা লোহার জাল দিয়ে। আর জলাশয় থেকে সামান্য দূরে, বানিয়েছিল একটি দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় দক্ষিণে জলাশয়ের দিকে মুখ করে বসবার চওড়া বারান্দা। দু পাশে দুটি শোবার ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। নিচেও একটি শোবার ঘর ছিল। সেটি একান্তই ভি. আই পি-দের জন্য। মাপেও ঘরটি বড়। ওটা আসলে ড্রইং কাম বেডরুম। ঘরটি ছিল তালা বন্ধ। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির এক পাশে খাবার ঘর।

বাংলোর এক পাশে কিচেন গার্ডেন। চৌকিদারের নিজের হাতে তৈরি। তার থাকবার ঘরও পাকা। থাকে সপরিবারে। আছে বেশ ভালোই। সব্জি বাগানই কেবল করেনি। দুটি গাভীও ছিল। কয়েক জোড়া হরিণ তখন তাদের সংসার রীতিমতো বাড়িয়ে তুলেছিল। বেশ বড় একটি হরিণের পাল বাংলোর কাছাকাছি, পুকুরের এ ধারে বা ও ধারে বনের লাগোয়া পাড়ে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু চৌকিদারের গাভীদের তাদের সঙ্গে মেশবার উপায় ছিল না। ষণ্ড হরিণ বড় মারাত্মক। ষণ্ড মৃগ হলেও তারা তাদের সিংয়ের গুঁতোয় গরু ছাগল মায় মানুষকেও খুন করতে পারে। এমন কি মৃগ ষণ্ড নাকি ক্ষেত্র বিশেষে বাঘের সামনেও শিং বাঁকিয়ে রুখে দাঁড়ায়। অতএব, বেথুয়াডহরির চৌকিদারকে তার গাই গরুর জন্য হুঁশিয়ার থাকতে হতো। ফরেস্ট বাংলোতে যারা থাকতে আসে, চৌকিদারই তাদের একমাত্র ভরসা। টাকা আর নির্দেশ মতো রান্নাবান্না সে-ই করে। মূল্য একটু বেশি দিতে হয়। কিন্তু মানতেই হবে. তার হাতের রান্না চমৎকার!

ইন্দ্রাণী জানতো, স্ত্রী কন্যাসহ বন বাংলোয় বেড়াতে গিয়ে, স্যার খুব বেশি স্নেহে বিগলিত হতে পারবেন না। তবে মুগ্ধ হবার মতোই পরিবেশ ছিল। নিবিড় বন। ঘাট বাঁধানো পুকুর। পুকুরে একটি নৌকো। নৌকো বাইবার জন্য ছিল বৈঠা। সময়টা ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী দ্বাদশীর রাত। ঝিরঝিরে

দক্ষিণের বাতাসে দোতলার ব্যালকনিতে বসেই, পুকুরের পারে বনের ছায়ায় হরিণদের চোখগুলো স্থির জোনাকির মতো জ্বলতো। স্যার তখন কিছুতেই দোতলার বারান্দায় থাকতে চাইতেন না। পুকুরের ধারে নারকেল গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসবার বড় ইচ্ছে হতো। কিন্তু কন্যার অধিক স্নেহ ছাত্রীকে করতে চাইলেও, কন্যা সে-সুযোগ কখনও দেয়? আহা! জ্যোৎস্নালোকিত বনানী ও মৃগদাব, দক্ষিণ সমীরে জলাশয় পর্যন্ত যেন মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল! স্যারের জন্য ইন্দ্রাণীর সত্যি দুঃখ হয়েছিল। তখনই ও বনগাঁয়ের ইছামতীর ধারে পারমদন বাংলোর কথা শুনেছিল স্যারের মুখে। স্যারের বিশেষ সাধও ছিল, ইন্দ্রাণীর পরীক্ষার পরে পারমদনে যাবেন।

স্যারকে কী করে ইন্দ্রাণী বোঝাবে, ওর কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। অবিশ্যি ও একান্ত অভদ্রতা করেনি। স্বার্থপরতারও একটা সাজানো সুন্দর দিক আছে। পরীক্ষার ফল হয়েছিল রীতিমতো ভাল। স্যারের অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায়নি। স্যারকে বাড়িতে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। স্যার বলেছিলেন, ইংরেজিতে ডক্টরেট করে নিতে পারলে ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে। ইন্দ্রাণী তখন মনে মনে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল, "স্যার, আপনি বুঝবেন না আমার পথ অতি দুস্তর। পা রাখবার শক্ত জায়গাটা চাই। ডক্টরেট আমার মাথায় থাক। কলেজে মাস্টারি করা আমার জন্য নয়। প্রয়োজনে অন্য কিছু পড়বার কথা বরং ভাবা যেতে পারে। সরি স্যার, আপনার স্নেহ ভোগ করার ভাগ্যি আর আমার নেই।"



সুধাকর পারমদনের বাংলো বুক করেছিল। ইন্দ্রাণী খবরটা পেয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বেথুয়াডহরির বন বাংলোর অভিজ্ঞতা দিয়েই ও বিষয়টি চিন্তা করেছিল। পারমদনের বাংলোর কোনো ধারণা না থাকলেও সেটা যে ইছামতীর ধারে বেশ নিরিবিলিতে হবে, কোনো সন্দেহ ছিল না। যে স্থূল অনুভূতির মানুষ সুধাকরকে নিয়ে ও সেইখানে রাত কাটাতে যাবার ব্যবস্থা করেছিল, সে-স্থূলতার আলিঙ্গন শেষ পর্যন্ত কী অবস্থার সৃষ্টি করবে কে জানে? ইন্দ্রাণী বেপরোয়া সত্যি। কিন্তু কতোটা বেপরোয়া? খেলতে খেলতে

ও আরব্য উপন্যাসের কোন্ দৈত্যকে জাগাতে যাচ্ছে, তার কি কোনো সম্যক ধারণা ওর ছিল ? ছিল না। তা ছাড়া, সুধাকরকে নিয়ে যে-চ্যালেঞ্জটা ও নিয়েছিল, তার মধ্যে ওর কোনো বস্তুগত প্রাপ্তির কিছু ছিল না। ও ওর বন্ধু বান্ধবীর কাছে, সুধাকরের কথা শুনে, নেহাতই ওর প্রকৃতিগত বন্ধপরিকর ধারণা থেকে একটা খেলায় মেতেছিল। কিন্তু ও একটা জানোয়ারের জান্তব বাহুপাশে ধর্ষিতা হতে চায়নি। সুধারককে ও কম ইঙ্গিত ইশারা করেনি। পারমদনে যাবার আগে, এই ভেবে ওর মনে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল, সুধাকর কি সত্যি এতোই উল্লুক, ওর ইশারা সংকেতগুলো কিছুই বুঝতে পারেনি ? যার বৈদগ্ধের কমতি কিছু ছিল না। রীতিমতো বাকপটু পরিহাসপ্রিয় রসিক পুরুষ যে, সে ইন্দ্রাণীর হাসি কটাক্ষে কিছুই ধরতে পারেনি। অন্তত পাশাপাশি গাড়িতে বসে হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া শাড়ির আঁচল যখন স্খলিত, তখন অকারণেই সুধাকরের গায়ের কাছে গিয়ে পড়েছে। সেসব কি সুধাকরের শরীরে মনে সত্যি কোনো ইন্ধন যোগায় নি।

ইন্দ্রাণীর তখন আর পিছু হটবার উপায় ছিল না। শনিবার বেলা দুটোয় ছিল কলকাতা থেকে যাত্রার সময়। তার আগের দিন সন্ধ্যাতেই সুধাকর ছ' বোতল বীয়ার, এক বোতল হুইস্কি, এক পিণ্ট ভোদকা, টোমাটো শস্ আর লাইম কর্ডিয়েল এক বোতল করে কিনেছিল। ইন্দ্রাণী মনের কথা কিছু বুঝতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "সুধাকরবাবু এতো সব নিচ্ছেন কেন ?

"উইক এণ্ডটা বেশ মেজাজে আর জবরদস্ত করে কাটাবো বলে।" সুধাকর ওর স্বাভাবিক হাসি মুখে জবাব দিয়েছিল, "তুমি তো একটু বীয়ার খেতে ভালবাসো। দিনের বেলা দু-একটা ব্লাডি মেরিতেও এন্‌জয় কর। নিয়ে তো নিলুম। তারপরে দেখা যাবে। যা খরচ হবে না, তা তো আর ফেলে দিতে হবেনা। রান্না খাবার নয়। ফিরিয়ে নিয়ে এলেই হবে। যাবো বনগাঁয়ে। বনগাঁ বলে কথা! সেখানে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, আমি আর কলকাতার সুধাকর চক্কোত্তি নেই। বনে গেছি শেয়াল রাজা! কলকাতার দৈনিক একঘেয়েমির হাত থেকে পালাবার জন্যই তো বনগাঁয়ে যাচ্ছি। আফটার অল্ ইট ইজ আ চেঞ্জ।"

ইন্দ্রাণীর হৃৎপিণ্ডটাকে যেন একটা ভয় ধরানো নখে খামচে ধরেছিল। ও চোখের কোণে সুধাকরের ভিতরটাকে একবার বুঝে নিতে চেয়েছিল। না, কোনো, পরিবর্তনই সুধাকরের দেখা যায় নি। পানীয়গুলো কেনা হয়েছিল "প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর" থেকেই। কলকাতায় ঐরকম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর আর একটিও ছিল না। শাড়ি জামা কাপড়, মহিলা পুরুষের দর্জিখানা, আধুনিক জুতো চটি, হেয়ার ড্রেসিং থেকে বিউটি পারলার, কফি আর স্ন্যাকস্ বার, মুদিখানা, সব্জি মাছ মাংস ডিম, স্টেশনারি, বুক শপ, মেডিসিন অ্যাণ্ড ড্রাগিস্ট কর্ণার, কিছুই প্রায় বাকি ছিল না। 'প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরকে' একমাত্র য়ুরোপ আমেরিকার ডিপার্টমেণ্টাল শপস্-এর সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

ইন্দ্রাণী তবুও ঠোঁট উল্টে বলেছিল, "আপনার দ্বারা ঐ বনগাঁয়ে শেয়াল-রাজা পর্যন্তই হওয়ার সাধ্যি আছে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার হতে পারবেন না।"

"দরকার নেই বাবা!" সুধাকর তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে হেসে বলেছিল, "চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমি বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়াতে পারিনে। বাঘের চোখে চোখ পড়লেই আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি খাঁচার বাইরে এসে, ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পরে টুঁটি কামড়ে ধরলো!"

ইন্দ্রাণীর মনে তখন যতো ভয়ই থাক, ও খিলখিল করে না হেসে পারেনি। বলেছিল, "এই আপনার সাহস! তা হলে আমাকে নিয়ে ইছামতীর ধারে নিরিবিলি বাংলোয় যাচ্ছেন কোন্ সাহসে? আমাকে যদি মতলববাজ শয়তানেরা এ্যাটাক করে?"

"তার জন্যে তো আমার রিভলবার আছে।" সুধাকরের মুখে ফুটেছিল বরাভয়ের হাসি। জবাব দিয়েছিল, "শয়তানদের প্রত্যেকটার খুলি উড়িয়ে দেবো।"

ইন্দ্রাণীর কাছে সুধাকর ক্রমেই কেমন রহস্যময় পুরুষ হয়ে উঠেছিল। যে-লোক চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, সে আবার সঙ্গে রাখবে রিভলবার! কোনোও ভাবে আক্রান্ত হলে, গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবে! বলেছিল, "সত্যি, আপনাকে বোঝার উপায় নেই। চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়াতে আপনার গায়ে কাঁটা দেয়। আর আপনি বদমায়েশের দলকে গুলি করে মারবেন? যদি বদমায়েশ লোকের বদলে, বাঘ দেখা দেয়?"

"সে ভয় নেই।" সুধাকর তার মোটা লেন্সের চশমার ফ্রেম এঁটে দিয়ে হেসে বলেছিল, "বাংলো বুক করতে গিয়ে সে সব খবর আমি নিয়ে এসেছি। জায়গাটা নিরিবিলি বটে, জঙ্গল বলতে কিছু নেই। তবে ওরা বলে দিয়েছে, তবু যেন আমি বন্দুক না নিয়ে যাই। একটা চড়ুই পর্যন্ত মারা বারণ। ওরাই বলেছে, উৎপাত করলে মানুষই করতে পারে। এক সময়ে নাকি বনগাঁয়ে নকশালদের বেশ প্রতাপ ছিল। এখন নেই। থাকলেও আমার কিছু আসতো যেতো না। আমি নকশালদের শত্রু নই। তবে বাঘ যে নেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

ইন্দ্রাণী সুধাকর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিল। হেসে হাল্কাভাবে বলেছিল, "দেখবেন, শেষটায় আমাকে গুলি করে মারবেন না যেন।"

"তোমাকে মারতে হলে গুলি করতে হবে কেন?" সুধাকর যেন ভারি অবাক হয়ে হেসেছিল। বলেছিল, "তোমাকে তো স্রেফ নাকে মুখে হাতের চাপে দম বন্ধ করেই মেরে ফেলা যায়। তবে তোমাকে মেরে ফেলার কথা আসছে কেন? আমরা তো যাচ্ছি, ফুর্তিতে উইক এণ্ড কাটাতে।"

ইন্দ্রাণীর অস্বস্তি যায়নি। সারা রাত ভালো করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি।

কথা ছিল, ওকে সুধাকরই 'প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স' থেকে তুলে নিয়ে যাবে। সেটাই ছিল সুবিধে। সুধাকরের শনিবার অফিস ছুটি থাকলেও, ইন্দ্রাণীর ছুটি ছিল না। শনিবার ওদের ছুটি বেলা তিনটায়। রবিবার পুরো। অতএব ইন্দ্রাণীকে কোথাও গিয়ে সুধাকরকে ধরতে হয়নি। সুধাকরকেও ছুটতে হয়নি ইন্দ্রাণীদের বাড়ি। তবে ইন্দ্রাণী আগেই ঠিক করে রেখেছিল, ও বেরোবে বেলা দুটোয়। স্টোর্স বন্ধ হবার এক ঘণ্টা আগে। ঠিক হয়েছিল, স্টোর্স থেকে বেরিয়ে এয়ার পোর্টের রাস্তা ধরা হবে। বারাসতের রাস্তা ধরে বনগাঁয়ের পথে গিয়ে পড়বে। পারমদন বাংলো দুজনের কারোরই জানা ছিল না। এমন কি দুজনের কেউ কোনো কালে বনগাঁয়ে যায়নি। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু হাতি ঘোড়া না। বনগাঁ চব্বিশ পরগণার এক বিশিষ্ট স্থান। হাঁটা পথে গেলে, বনগাঁ দিয়ে সোজা যশোহর সীমানায় চলে যাওয়া যায়। তার মানে, ওপারের বাংলাদেশে।

সুধাকরের গাড়িতে ওঠার আগে, ইন্দ্রাণী শেষবারের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল। ও ওর ছোট ব্যাগের বদলে, ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়েছিল বড় একটা ব্যাগ। ওর রিভলবার ছিল না বটে, ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল মস্ত একটা ধারালো ছুরি। সেটাকে দু'দিকে ধার দেওয়া ড্যাগার বললেই ভালো হয়। সুধাকর যদি কোনো রকম এদিক ওদিক করে, তা হলে বুকে সোজা ছুরি বসিয়ে দেবে। আসলে চ্যালেঞ্জটাই গিয়েছিল বদলে। ও ভুলেই গিয়েছিল, সুধাকরের সঙ্গে পারমদনের বাংলোয় যাওয়ার প্রস্তাবটা ও-ই দিয়েছিল। উইক এণ্ড মানে, শনিবারের রাত কাটিয়ে, রবিবার সারাদিন থেকে, সন্ধ্যের মধ্যে কলকাতায় ফেরা। কিন্তু সুধাকরকে নিজের কবজায় আনতে গিয়ে, ইন্দ্রাণী ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। সুধাকরকে অনেক পুরুষের মতো কাত করতে না পেরে, যে-জেদটা ওকে পেয়ে বসেছিল, সেই জেদ আর ছিল না। কারণ সুধাকর সম্পর্কে ওর পুরনো ধারণা গিয়েছিল বদলে।

গ্রীষ্মের বেলা ছিল বেশ বড়। সন্ধ্যায় আগেই ওরা পারমদনের বাংলোয় পৌঁছে গিয়েছিল। সত্যি, মনোরম জায়গা! কথাটা ইন্দ্রাণীর আগে সুধাকরের মনে হয়েছিল। ইন্দ্রাণী সুধাকরকেই লক্ষ্য রাখছিল। আসবার পথেই সুধাকর এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ারে গলা ভেজাতে চেয়েছিল। অনুরোধ করেছিল ইন্দ্রাণীকেও। ইন্দ্রাণী সুধাকরকে বুঝিয়েছিল, নতুন জায়গায় যাওয়া হচ্ছে, গ্রামের মানুষকে রাস্তা ঘাটের কথা জিজ্ঞেস করবার সময় যদি মুখে মদের গন্ধ পায়, তবে নানারকম অসুবিধে দেখা দিতে পারে। ইন্দ্রাণী আর যাই হোক, একটা মেয়ে। গাঁয়ের লোকেরা বা বাংলোর চৌকিদারও যদি ওর মুখ থেকে বীয়ারের গন্ধ পায়, তা হলেও ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াতে পারে। অতএব, ইন্দ্রাণীর যুক্তি, সুধাকরেরও উচিত নয় বীয়ার খাওয়া। তা ছাড়া কিছু খেয়ে, গাড়ী চালানোটাও ইন্দ্রাণীর পছন্দ ছিল না।

সুধাকর হেসেছিল। বলেছিল, "ধূমপান করিনে, মদ্যপানও নিয়মিত

করিনে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে মাঝে মধ্যে খেয়ে থাকি। আমি অ্যাডিকটেড নই। খেতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়েও যদি একটু ফুর্তি না করি, তা হলে আর বেড়াতে বেরোনোর মজাটা কী? তাও দশজনকে নিয়ে বেড়ানো নয়। তুমি আর আমি। আর এক বোতল বীয়ার টেনে গাড়ি চালাতে আমার কিস্যু হবে না। ওরকম আমি অনেক চালিয়েছি…"

সুধাকরের কথায় বাধা দিয়ে ইন্দ্রাণী বিরক্তি প্রকাশ করে একটা সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "আমার কথা না শুনলে কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নেমে যাবো। সোজা একটা ট্যাকসি ধরে বাড়ি ফিরবো।"

"আশ্চর্য মেয়ে তো!" সুধাকর হা হা করে হেসেছিল, বলেছিল, "আরে তুমি এতোটা বিচলিত হচ্ছো কেন? আজ পর্যন্ত আমি কারোর বিরক্তি উৎপাদন করিনি। আমি বীয়ার না খেলে যদি তুমি খুশি হও, আমি বোতল ছুঁয়েও দেখবো না। তুমি যাতে খুশি হও, আমি তাই করবো।"

সুধাকর গাড়ি চালিয়েছিল বেশ জোরেই। ইন্দ্রাণীর সেটাও পছন্দ ছিল না। অথচ ও জানতো, সুধাকর খুব ভালো গাড়ি চালায়। শুনেছিল, সব দিক থেকেই ওর মতো নিরাপদ বন্ধু কেউ হয় না। ওর দায়িত্বজ্ঞানও যথেষ্ট। অথচ, সুধাকরের সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর সে-সব ধারণাতেই ফাটল ধরেছিল। কিন্তু ও যখন সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করতেই বীয়ার পানে নিরস্ত হয়েছিল, তখন ইন্দ্রাণী খুশি হয়েছিল। তবে স্বস্তি বোধ করেনি। কারণ, ওকে খুশী করার জন্য সুধাকরের যে এতোখানি উৎসাহ ছিল, সেটা আগে মোটে টের পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে, কলকাতায় কোথাও নিরিবিলিতেই সুধাকরকে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকের খেলা খেলানো যেতো। সুধাকর ওকে খুশি করতে চাওয়ায় তখন আর ইন্দ্রাণীর স্বস্তি ছিল না। কুমিরের পিঠে চেপে পড়ে, বাঁদরের নদীতে ভেসে যাবার মতো মনের অবস্থা হয়েছিল ওর।

"জায়গাটা সত্যি মনোরম!" সুধাকর পারমদনে পৌঁছে খুশি হয়ে বলেছিল, "কলকাতা ছেড়ে উইক এণ্ড কাটাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা! ইন্দ্রাণী, তুমি কেন আগে আসোনি, ভেবে অবাক হচ্ছি!"

ইন্দ্রাণী পারমদন পৌঁছে, চৌকিদার তার পরিবার ও অন্যান্য দু-একজনকে দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল। জায়গাটা নিরিবিলি, কোনো সন্দেহ নেই। ইছামতী নদীর ধারে। নদী খুব চওড়া না। গঙ্গার মতো আদৌ ছিল না। ওপারটাকে মনে হয়েছিল খুব কাছে। ইন্দ্রাণীর মনে হয়েছিল বেথুয়াডহরির বনানী আর বাংলো অনেক সুন্দর। পারমদনেও ছিল দোতলার ওপর দুটো শোবার ঘর। বিদ্যুৎ না থাকাটা একটা মস্ত অসুবিধে। তবু দুটো ঘর তো ছিল। খেয়ে একলা একটা ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেই শান্তি!

ইন্দ্রাণীর যা করার ছিল, তা একরকম করাই হয়েছিল। সুধাকরকে কোনো মেয়ে তার রূপ যৌবনে বশীভূত করা দূরের কথা, আকর্ষণ করতে পারেনি।

ইন্দ্রাণী তো পারমদনে পৌঁছেই বুঝেছিল, সুধাকরের অবস্থা সঙ্গিন। সুধাকরের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধিমান পুরুষ যে-রকম বোকা বোকা মুগ্ধ চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখছিল, আর বীয়ারের বোতল খুলে, নেশা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তারপরে আর বুঝতে কিছু বাকি ছিল না। ইন্দ্রাণীর তখন একমাত্র সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা।

"ইন্দ্রাণী, এখন এক বোতল বীয়ার চলবে তো ?"

"না।"

"কেন ? তোমার এক কথায় এরকম একটা ভূতুড়ে বাংলোয় এসে পড়লুম, আর তুমি হঠাৎ এরকম বদলে যাচ্ছো কেন ?" সুধাকর যেন অবাক ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি তো বীয়ার খেতে ভালই বাসো।"

ইন্দ্রাণীর প্রথম একটা কথা মনের মধ্যে কেমন ধন্দ ধরিয়ে দিয়েছিল। সুধাকর ভূতুড়ে বাংলো বলেছিল কেন ? ও বেশ উদাসীন মুখে বলেছিল, "না, বীয়ার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

তা হলে একটা ব্রান্ডি মোর তৈরি করে দিই ? সুধাকর সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিল।

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলেছিল, "না, ওসব কিছুই আমার ভালো লাগছে না। আপনি খান। আমি বরং যাই, রাত্রের রান্নাবান্না কী হবে, তাই দেখি গে।"

ইন্দ্রাণী চলে গিয়েছিল। নিচে চৌকিদারের ঘরের কাছে যেতেই, সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। রান্নার কথা উঠেছিল। চৌকিদার এক গাল হেসে বলেছিল, "আপনাদের আসবার কোনো খবর ছিল না। থাকলে মাছের ব্যবস্থা করে রাখতাম। ভাত বা রুটি, ডাল আর যদি কোনো তরকারী বা ভাজা খেতে চান, করে দেব। আর চিকেন কারি বানিয়ে দেব।"

ইন্দ্রাণীর খাবারের কথায় কোনো আগ্রহ ছিল না। খাবার যে কিছু জুটবে, তা ও জানতোই। বলেছিল, "তোমরা যা করে দেবে, তাই খাবো। বাংলোটা কেমন ?"

"খারাপ তো কিছু নেই দিদিমনি। চৌকিদার বলেছিল, "এই তো সেদিনে নতুন রঙ করা হয়েছে। বিছানাপত্র বদলানো হয়েছে। আপনাদের অসুবিধে হবে একটাই : বিজলি নাই। তাও শুনছি শীগগিরই এসে যাবে। দোতলার বারান্দায়, সিঁড়ির সামনে একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেব। রাত্রে ঘরে হ্যারিকেন থাকবে।"

ইন্দ্রাণী গলা খাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কোনো ভয়টয় নেই তো ?"

"ভয় ?" চৌকিদার মাথা নেড়ে বলেছিল, "না দিদিমনি কোন ভয়টয়ের কিছু নাই। একটা ভামু রাত্রে নানান শব্দশব্দ করে। ওতে ভয় পাবেন না। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবেন, তা হলেই হল।

সুধাকরের তিন বোতল বীয়ার শেষ হয়েছিল রাত্রি আটটার মধ্যেই। যে-লোক নিয়মিত পান করে না, তার পক্ষে তিন বোতল বীয়ার বেশ বাড়াবাড়ি বলা।

যায়। তারপরেও সে হুইস্কির বোতল খুলেছিল। ইন্দ্রাণী উদ্বেগ চেপে বলেছিল, "এ কি। এরপর আপনি আবার হুইস্কি খুলছেন?"

"কেন, কী হয়েছে? আফটার বীয়ার হুইস্কি নট রিস্কি। এ কথাই তো পানরসিক বন্ধুদের মুখে বরাবর শুনে এসেছি।" সুধাকর হেসে বলেছিল।

ইন্দ্রাণী ভ্রূকুটি বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, "আপনার তো বেশি খাওয়ার অভ্যেস নেই। তারপরে নিজেকে সামলাতে পারবেন?"

"খুব পারবো!" সুধাকর দু হাত তুলে বলেছিল, "আমি কখনো বেসামাল হইনে। তুমি কিছু ভেবো না।" সে হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলে আবার বলেছিল, "তুমি সত্যি কিছু খাবে না?"

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলেছিল, "না।"

"আমি আবার এসব বিষয়ে কারোকে বেশি সাধাসাধি করি নে।" সুধাকর গেলাসে হুইস্কি ঢেলে বলেছিল, "পান ভোজন হচ্ছে নিজের রুচি মতো। তবে এক সঙ্গে এসেছি। এক যাত্রায় পৃথক ফল? তাই বলছিলুম, যদি একটা ব্লাডি মেরিও নিতে, তা হলেও খুশি হতুম।"

ইন্দ্রাণী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আসন্ন রাত্রির কথা ভেবে ক্রমাগত ওর অস্বস্তি ও উদ্বেগ বেড়েছিল। দেখেছিল, সুধাকর দিব্যি গুনগুনিয়ে গান করতে করতে হুইস্কি খেয়েছিল দু রাউন্ড। তারপরে উঠে বলেছিল, "যাই একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

ইন্দ্রাণী অবাক চোখে দেখেছিল, সুধাকর একটুও টলেনি। তার পদক্ষেপ ছিল স্বাভাবিক, গলায় ছিল চেনা গজলের সুর। ও দোতলা থেকে দেখেছিল, নদীর ধারের অন্ধকারে সুধাকর হারিয়ে গিয়েছিল। শান্তি! ইন্দ্রাণী কী শান্তিই না বোধ করেছিল! রাত্রি দশটা বেজে যাওয়ার পরেও সুধাকর ফিরে আসেনি। ইন্দ্রাণী চৌকিদারকে বলে, অপেক্ষা না করে খাবার খেয়ে নিয়েছিল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল।

চৌকিদার দোতলার সিঁড়ির কাছ থেকে হ্যাজাক নামিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। শোবার ঘরে জ্বলছিল হ্যারিকেন। এক পাল শেয়ালের ডাক ভেসে এসেছিল। ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে চমকে উঠেছিল। সেই কোন্ ছেলেবেলায় দু-একবার বাবা মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শেয়ালের ডাক শুনেছিল। ভয়ে শিউরে উঠতো। শিউরে উঠেছিল সাতাশ বছর বয়েসের ইন্দ্রাণী মিত্রও। কলকাতার প্রাচী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্-এর ম্যানেজারেস। হ্যারিকেনের লালচে আলোয় ও একলা ঘরে, বিছানায় আস্তে আস্তে উঠে বসেছিল। শেয়ালের ডাক কেবল কুৎসিত শোনায় না। তাদের ডেকে উঠে থেমে যাওয়ার পরেই, এমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, তারপরেই যেন ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে!

খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসছিল। নেটের মশারিটা সেই বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। জানালার পাল্লায় হাওয়া ঠাস থাকা সত্ত্বেও, কেমন

একটা মচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছিল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। শেয়ালের ডেকে ওঠার পর, ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে আসছিল। সুধাকর কি নদীর ধার থেকে ফেরেনি? কথাটা মনে হতেই, ছাদের ওপর থেকে একটা বুক কাঁপানো অদ্ভুত শব্দ ভেসে এসেছিল। মনে হয়েছিল, যেন একটা ভারি কাঠের পিঁড়ি কেউ ঘষটে ঘষটে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রাণী আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারেনি। মশারির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে নিজের কিম্ভূত বিরাট ছায়াটা দেখে চমকে উঠেছিল। জানালার কাছে গিয়ে চিৎকার করে সুধাকরকে ডাকতে গিয়ে, গলার স্বর ফোটেনি। বুকে হাত চেপে ধরেছিল। বোবা পাওয়া অবস্থা কাটিয়ে, জোর করে গলায় স্বর বের করেছিল, "সুধাকরবাবু।"

"কী হলো?" বাইরের বারান্দা থেকে সুধাকরের গলা ভেসে এসেছিল, "তুমি ঘুমোওনি?"

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিটকিনি খুলেছিল। প্রায় ছেলে-মানুষের মতো কান্নার স্বরে বলেছিল, "আপনি এরকম জায়গায়, আমাকে কী করে একলা ফেলে রেখেছেন?"

"তোমাকে আমি কেন একলা ফেলে রাখবো?" সুধাকর অন্ধকারে ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, "আমার মনে হল, তোমার মন মেজাজ ভালো নেই। আমি নদীর ধারে বেড়াতে গেছলুম। ফিরে এসে শুনি, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছো। চৌকিদার আমার খাবার ঘরে রেখে গেছে। এখনো খিদে পায়নি। পেলে খাবো।"

ইন্দ্রাণী সুধাকরের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "আমার আবার মন মেজাজ খারাপ কোথায় দেখলেন? আপনিই তো গাদাগুচ্ছের ড্রিংক করে নদীরধারে চলে গেলেন।"

"তা তুমি যদি কথা না বলো, আমি কি তোমাকে জোর করে কথা বলাবো?" সুধাকর হেসে বলেছিল, "কলকাতায় বেড়াতে বেরোলে তুমি কত বকবক কর, হাসো। আর এখানে এসেই যেন তুমি কেমন বদলে গেলে। ব্লাডি মেরি বানিয়ে দিতে চাইলুম। তুমি এমনভাবে রিফিউজ করলে, যেন ওসব তুমি জীবনে কোনোদিন খাওনি। অথচ এখানে বেড়াতে আসার শখটা ছিল তোমারই।"

ইন্দ্রাণী জানতো, সুধাকর একটি কথাও মিথ্যে বলেনি। কিন্তু তখন ওর পক্ষে তা স্বীকার করার উপায় ছিল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, "আমি কি করেছি তা জানিনে। আপনি শেয়ালের ডাক শোনেননি?"

"কেন শুনবো না?"

"আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন না? ছাদের ওপর?"

"শুনেছি। চৌকিদার আমাকে আগেই বলে দিয়েছে, একটা ভাম্ নাকি রাত্রে দৌরাত্মি করে। ভামটাই ছাদে অদ্ভুত শব্দ করে দাপাদাপি করছে। তবে ভামটা বুড়ো ভাম্ কি না জানি নে।" সুধাকর হাসতে হাসতে বলেছিল।

ইন্দ্রাণী ভীরু ছোট মেয়ের মতো জেদ ধরে বলেছিল, "সে আপনি যাই

বলুন, আমি আর কিছুতেই এখানে এক মিনিটও একলা থাকে পারবো না।"

"কে তোমাকে থাকতে বলেছে ? সুধাকর হেসে বলেছিল, "আমি তো দারুণ এনজয় করছি। কলকাতায় জ্যোৎস্নাও নেই, এমন সুন্দর অন্ধকারও নেই।"

ইন্দ্রাণীর তখন চোখে পড়েছিল, বারান্দার শোফার সামনে টেবিলের ওপর গেলাস বোতল জলের জাগ। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি এখনো ড্রিংক করছেন ?"

"আমার খাওয়া ঐরকম।" সুধাকর সকৌতুক হেসে বলেছিল, "আমার তো নিয়মিত পানের অভ্যেস নেই। আবার সেই কবে খাবো, কেউ বলতে পারে না। আর আমার বন্ধুরা কী করে মাতাল হয়, সেটাও আমার জানা নেই। কারণ আমি কখনো মাতাল হইনি। তবে মেজাজটা বেশ রাজা রাজা হয়।"

ইন্দ্রাণী সেটা লক্ষ্য করেছিল। আগেও করেছে। সুধাকরকে কখনও মাতাল হয়ে প্রলাপ বকতে শোনেনি। অথচ কতো মাতালের কতো প্রলাপই যে ওকে শুনতে হয়েছে। আর সুধাকরকেই ও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "তা এখন কি রাজা রাজা মেজাজ হয়েছে ?"

"হয়েই আছে। দারুণ এনজয় করছি।"

"একলা একলা ?"

"তা এরকম অন্ধকারে একলাই তো ভালো লাগে।"

ইন্দ্রাণীর সন্দিগ্ধ মনে তখন উলটো বাতাস লেগেছিল, বলেছিল "তা লাগতে পারে। কিন্তু আমি আপনাকে ছেড়ে আর এক সেকেণ্ডও এখানে থাকতে পারবো না।"

"তা হলে বসো।"

"বসবো না। আপনি বরং এবার খেয়ে নিন। খাবারটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি বসো। আমি খাবার আর হ্যারিকেনটা এখানেই নিয়ে আসি।"

ইন্দ্রাণী বাস্তবিকই এক সেকেণ্ডও সুধাকরকে ছেড়ে থাকতে ভরসা পায়নি। বলেছিল, "চলুন, আমি খাবার নিয়ে আসছি। আপনি হ্যারিকেনটা আনবেন।"

ইন্দ্রাণী দেখেছিল, সুধাকরের ঘরেও ওর ঘরের মতোই দুটো খাটের বিছানাতেই দুটো মশারি গোঁজা আছে। সুধাকর খেতে খেতে হাসির গল্প শুনিয়েছিল। খাওয়ার শেষে, এঁটো বাসন বাইরের টেবিলে রেখেই দুজনে ঘরে শুতে গিয়েছিল।

ইন্দ্রাণীর যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন খোলা জানালা দিয়ে সকালের প্রথম রোদ এসে পড়েছিল, ঘরের মেঝেয়। নিজের জামা শাড়ি গোছাতে গোছাতে তাকিয়ে দেখেছিল, অন্য খাটে সুধাকর নেই। দরজাটা বন্ধ। সুধাকর কি বাথরুমে গিয়েছে ? ইন্দ্রাণী মশারির বাইরে এসে সুধাকরের খাটের দিকে আবার দেখেছিল। বিছানা দেখে একটুও মনে হয়নি, ঐ খাটে রাত্রে কেউ শুয়েছিল। ওর নিজের বড় ব্যাগটা ছিল ওর শিয়রের কাছেই। ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনি

বন্ধ ছিল না। ও দরজা খুলে দেখছিল, সুধাকর ব্যালকনিতে, নদীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ইন্দ্রাণীর ঘুমটা হয়েছিল ভালো। বলেছিল, "গুডমর্নিং সুধাকরবাবু। কখন উঠলেন?"

"অনেকক্ষণ। সূর্য ওঠার আগে।"

"আমাকে ডাকলেন না কেন?"

"এসে দেখলুম তুমি ঘুমোচ্ছো। তাই আর ডাকিনি।"

ইন্দ্রাণীর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল, "এসে দেখলুম মানে? কোথা থেকে এসে দেখলেন?"

"ঐ ঘর থেকে।" সুধাকর অন্য ঘরটা দেখিয়ে বলেছিল।

ইন্দ্রাণীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "আমার ঘরের দরজা কি সারা রাত খোলা ছিল?"

"না, লক করে দিয়ে চাবি আমার কাছে রেখে দিয়েছিলুম।" সুধাকর হেসে বলেছিল, "তুমি একলা থাকলেও বেশ ভালো ঘুমিয়েছিলে। কাল রাত্রে মাঝে মাঝেই ভাম্‌টা জ্বালিয়েছে।"

ইন্দ্রাণী তখনও যেন আতঙ্কের ত্রাসে ছিল। বলেছিল, "তার মানে, আমি সারা রাত একলা ঘরে শুয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ তাই ছিলে।" সুধাকর হেসে বলেছিল, "এখন আর ভয় কী? রাত তো কেটে গেছে। মুখ ধুয়ে এসো। চা দিতে বলি। জলখাবার খেয়ে, চলো বনগাঁ ঘুরে দেখে আসি।"



ইন্দ্রাণী নিজেই ক্ষৌণীশকে এই সব বৃত্তান্ত শুনিয়েছিল। সুধাকর সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর ধারণা, নির্মল চরিত্রের পুরুষ বলতে যা বোঝায়, সুধাকর সেইরকম। মেয়েদের পক্ষে সে নিরাপদ পুরুষ। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বাধে না। এক শ্রেণীর পুরুষের মতো, প্রেমে পড়ার বাতিক তার নেই। ইন্দ্রাণী অসঙ্কোচে স্বীকার করেছে, সুধাকরকে দিয়ে পুরুষ সম্পর্কে ওর জন্মগত একটা ভুল ভেঙে'ছ। পুরুষ মাত্রই একান্ত প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক না। ইন্দ্রাণী নিজের পরাজয় স্বীকার করেছে। এবং সুধাকর ওর জীবনে একটা শুধু অভিজ্ঞতা না। আবিষ্কারও বটে।

প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক না হলেও, কোনো পুরুষ বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিকৃত কামের শিকার হওয়া কিছু বিচিত্র না। সেরকমও অনেক দেখা যায়। সুধাকর

সে-রকম কোনো বিকৃতির শিকারও না। তার সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর শেষ মন্তব্য হলো, পুরুষ হিসেবে সুধাকরকে কোনো রকমেই স্বাভাবিক বলা যায় না। আপাত-দৃষ্টিতে সে যতই নিরাপদ বন্ধুবৎসল হোক, চরিত্র তার জটিল। তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিই। দশ জনের মতো সাধারণ সংসারী হবার কোনোও ইচ্ছা তার নেই। তার নামের মোহ নেই। সে প্রেমিক না। স্বামী পিতা কোনও কিছু হবার বাসনা তার নেই। কোম্পানির কর্মী হিসেবে তাকে বলা যায় মৌমাছি। কোম্পানির লভ্যাংশে তার অবদান অনেকখানি। সেজন্য তার বিশেষ কোনো দাবী নেই।

ক্ষৌণীশের সঙ্গে সুধাকরের পরিচয় সেই কলেজ জীবন থেকে। ক্ষৌণীশ ম্যাট্রিক পাশ করে এসেছিল, পদ্মার ওপার থেকে। কলেজে পড়েছিল কলকাতায়। ছাত্র হিসেবে ক্ষৌণীশ কোনোকালেই খারাপ ছিল না। কিন্তু কলকাতার সবচেয়ে সুখ্যাত পয়লা নম্বর কলেজের ছাত্র সুধাকরের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। ক্ষৌণীশ ফিজিক্স-এ অনার্স করে শিবপুরের বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়েছিল প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে। কিন্তু ফিজিকস্-এর ছাত্র শেষ পর্যন্ত আর্কিওলজি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে, সেটা কোনো লজিকে মেলেনি। ক্ষৌণীশ আর্কিওলজিতে ভালো ফল করে প্রমাণ করে দিয়েছিল, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেলেও, ইচ্ছা আর মেধার জোরে উত্তরণ ঘটানো যায়। ওর বাবা ছিলেন বেঁচে। দুই দাদা তখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। এক দিদি আর এক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সবাইকে যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করার মূলে ছিলেন বাবা। তিনি ছিলেন অল্প বয়সের বিপত্নীক এক ব্যক্তি। যিনি তাঁর এক বিধবা কনিষ্ঠা সহোদরার কল্যাণে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পেরেছিলেন। বিধবা সহোদরার ছিল একমাত্র পুত্র। ক্ষৌণীশদের সঙ্গেই সেই পিসতুতো ভাই মানুষ হয়েছিল। বাবা ছিলেন ঢাকা জাজেস্ কোর্টের একজন নামজাদা ডাকসাইটে ফৌজদারি উকিল। তাঁর সময়ের তিনি ছিলেন বি. এ বি. এল। ঢাকায় সম্পত্তি করেছিলেন ভালো। ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। চল্লিশ দশকের গোড়াতেই, দেশের অনিবার্য পরিণতি অনুমান করে, বরাবরের মতো কলকাতায় চলে এসেছিলেন। আলিপুর জাজেস কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে বিলম্ব ঘটেনি। আলিপুর জাজেস কোর্ট থেকে হাইকোর্টে টক্কর দিয়েছিলেন, অনেক বাঘা আইনজীবীদের সঙ্গে। কলকাতা আর ঢাকায় অস্থাবর সম্পত্তি কম করেননি। কিন্তু ঢাকার সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন অনেক পরে। বিক্রির চেয়ে বিনিময় করেছিলেন বেশি। যার পরিণামে কলকাতায় তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ, স্থাবর অস্থাবর সব দিক দিয়েই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ক্ষৌণীশ যখন প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তে স্থাপত্য বেছে নিয়েছিল, তখন ওর বাবা বিষয়টিকে খামখেয়ালী ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষৌণীশ যখন স্থাপত্যেও বিস্ময়কর রকম ভালো ফল করেছিল, বাবা ওকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, স্থাপত্যবিদ্যায় আরও পারদর্শী হবার জন্য। ক্ষৌণীশ বাবার ইচ্ছে পূর্ণ

করেছিল। স্থাপত্যে ডিগ্রি ও ডক্টরেট করে ও যখন বিলেতের বিখ্যাত এক স্থপতি সংস্থার কাজে যোগদান করেছিল, তখনই বাবা ওকে ডেকে পাঠিয়ে, অমলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। পিসিমা তখনও বেঁচেছিলেন। কিন্তু অক্ষম। অন্য দিকে দাদাদের, দিদি এবং বোনকে বাবা তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিয়েছিলেন। ক্ষৌণীশকে বলেছিলেন, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে বিলাতে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁর বা তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরার দায়িত্ব কারোকে নিতে হবে না।

ক্ষৌণীশ অমলকে নিয়ে বিলেতেই গুছিয়ে বসবে ভেবেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর না যেতেই, ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল। পিসিমা মারা গিয়েছিলেন বাবার আগে। বাবা মারা যাবার পরে ওকেও বিলেতের প্রবাস জীবন ছেড়ে আসতে হয়েছিল। বাবা ওর জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর নিজের বালিগঞ্জের বসতবাটি। আর কিছুই না। তাঁর তিন ছেলে দুই মেয়েকে যা দেবার দিয়ে, বাকি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সবই দান করে যান একটি সেবা সংস্থাকে।

ক্ষৌণীশ বালিগঞ্জের বাড়িটি পেয়েই সন্তুষ্ট ছিল। ওর কোনো ক্ষোভ ছিল না। বাবার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে দুই দাদাই বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। অস্থাবর এবং নগদ সম্পর্কেও তাঁদের মোটামুটি ধারণা ছিল। তাঁদের আশা ছিল, বাবা সমস্ত সম্পত্তি তাঁর সন্তানদের সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে যাবেন। ফলে দাদারা সকলেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ক্ষৌণীশের সেরকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না। বিলেত ছেড়ে এসে, কলকাতায় জীবনযাপনের ইচ্ছাও তার ছিল না। বরং লণ্ডনে, সে সব দিক থেকেই ভালো ছিল। নিজের বাড়ি গাড়ি ছাড়াও, পাঁচ বছরে নিজের একটি স্থপতি সংস্থা তৈরি করে অর্থ কিছু কম রোজগার করেনি। ইতিমধ্যে ওদের একটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল। অমলকে নিয়ে পশ্চিম য়ুরোপের সবখানে ঘুরেছিল। আমেরিকাও একবার বেড়িয়ে এসেছিল। বরং সেই তুলনায় দেখা হয়নি ভারতবর্ষটা।

ক্ষৌণীশ লণ্ডনের জীবনে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেখানে বঙ্গ সমাজের চেহারাটা একমাত্র চার্লি চ্যাপলিনের মতো রসিকের পক্ষে চিত্রে দেখানো সম্ভব ছিল। লিখে প্রকাশের ক্ষমতা কারোর থাকলেও, সে-কাজে কেউ ব্রতী হয়নি। লণ্ডন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে যে-দু'চারজনের সূক্ষ্ম রসের দৃষ্টি ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বঙ্গ সমাজের ক্যারিকেচার করতো। বেশির ভাগ বঙ্গীয়দের লক্ষ্য সাহেব তাড়িয়ে সাহেব হয়ে ওঠা। সেটা যে কী হাস্যকর ব্যাপার, এখানকার তথাকথিত ক্যালকাটান ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোকেরাও কল্পনা করতে পারে না। তবে, লণ্ডনের সুবৃহৎ ক্ষেত্রে, ইঙ্গ-এশিয়ান একটা সমাজ ছিল। ক্ষৌণীশের বিচরণ ক্ষেত্রে ছিল সেই সমাজ। তা ছাড়া, ওর যোগাযোগ ছিল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কেরিয়ার হিসাবে লণ্ডন ছিল ওর আদর্শ জায়গা।

ক্ষৌণীশের মতো অমল লণ্ডনে পাঁচ বছর থাকলেও, অন্তর থেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। অথচ, ক্ষৌণীশ ওর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিল, অমল যে-রকম বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিল, সাধারণত সে রকম পরিবারের মেয়ে, লণ্ডনে থাকতে পেলে, খুশি হয়। সব কিছুই চর্চার ওপর নির্ভর করে। অল্পবিস্তর চর্চা করলে, অমলও, লণ্ডনের বাঙালী জীবন অনায়াসেই রপ্ত করতে পারতো। অনেক শিক্ষিত স্ত্রীরা চাকরিবাকরি না করে, নিতান্ত হাউস ওয়াইফের জীবন কাটায়। কলকাতার মতোই, বায়োস্কোপ দেখে আর গল্পের বই পড়ে দিন কাটায়। আর স্বামীর সঙ্গে নানাখানে বেড়িয়ে বেড়ায়। অমল সেইরকমটি হতে পারেনি।

অমল ইচ্ছে করলে, যেটুকু পড়াশুনো ছিল, তাতে কিঞ্চিৎ ধার দিয়ে, একটা চাকরি পেতে পারতো। সে বিষয়ে ওর ছিল অসম্ভব সঙ্কোচ। অথচ তথাকথিত হাউস ওয়াইফের মতো জীবন কাটাতেও ওর ছিল অসীম অনীহা। এমন কি ঐ দেশীয় খোদ সাহেবের এই দেশীয় স্ত্রীও, যাকে বলে নিতান্ত ঘরের বউয়ের জীবনযাপন করে। অমলের কী অস্বস্তি! শ্বশুরের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, অমল ক্ষৌণীশকে ধরে পড়লো, কলকাতায় থাকবার জন্য। ক্ষৌণীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, সেখানে থাকবার কী আকর্ষণ তোমার ?'

"সেটা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।" অমল ক্ষৌণীশের সোহাগ কেড়ে বলেছিল, "তুমি জানো, আমি এ দেশের প্রায় এক গ্রাম্য মেয়ে। কিন্তু যাকে বলে গ্রাম্যতা, যার হাত থেকে রেহাই নেই, এমন কি তোমাদের লণ্ডনের বাঙালী সমাজেও। সেখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সুযোগ থাকলেও কি কেউ প্রবাসে থাকতে চায় ? আর যে-ই চাক, আমি চাইনে। তোমার যদি মনে হয়, কলকাতায় থেকেও তোমার ব্যবসা চালাতে অসুবিধে হবে না, তবে চেষ্টা করে দ্যাখো না। আর শ্বশুরের এত বড় ভিটে পুরোটাই ভাড়া দিয়ে কেনই বা বিদেশে পড়ে থাকবো ?'

কলকাতা বালিগঞ্জের প্রায় সাত কাঠা জমি বাগানের ওপর, আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের দোতলা বাড়ি। এক তলাটা ভাড়া দেওয়া ছিল এক হিন্দু পাঞ্জাবী পরিবারকে। ভাড়া মেলে মাসে তিন হাজার টাকা। কিন্তু লণ্ডনেও ক্ষৌণীশের বাড়িটি মোটেই ছোটখাটো না। উত্তর লণ্ডনের ভালো এলাকাতেই ওদের বাসস্থান। ওর মিটফোর্ড অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি আর্কিটেক্‌ট ফার্মের ব্যবসাও ক্রমোন্নতির দিকে। হঠাৎ কলকাতায় চলে আসতে চাইলে, কলকাতার লোকেরাই অবাক হবে বেশী। ক্ষৌণীশ জানতো, ওর লণ্ডন প্রবাসের জীবনটাও অনেকের কাছে কলকাতায় ওর দাম বাড়িয়েছে। অবিশ্যি ঠিক মতো ভেবে দেখতে গেলে, সে দামের মূল্য নেই কানাকড়িও। তা ছাড়া বাবার মৃত্যুর পরে ওর মনেও দু' একটা প্রশ্ন জেগেছিল। বাবা তাঁর মৃত্যুর এক মাস আগেও, অর্থাৎ তাঁর উনআশি বছর বয়সে, কোর্টে গিয়েছেন। তাঁর দেখাশোনা করার জন্য ছিল মাত্র একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। নিজের জন্য কোনো গাড়ি রাখেননি!

যা আদৌ তাঁর পক্ষে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তিনি কোর্টে যেতেন অন্য এক আইনজীবীর গাড়িতে। বিনা পয়সায় না। একটা হিসেবের চুক্তি ছিল, মাস গেলে ট্যাকসির চেয়ে কিছু কম টাকা তাঁর খরচ হতো। তাও যাতায়াত নিয়ে। টেলিফোনেই যোগাযোগ ছিল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কোনো কারণেই, কখনও কারো সাহায্যের প্রত্যাশী হননি। সন্তানের কারোর প্রতি ও'র কোনও অভিমান ছিল না। কারোকে কোনওরকম বিব্রত না করাটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত বিবাহিত জীবনে পাঁচটি সন্তানের জন্মের পর, মাত্র তেরো বছর পরেই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন বলে, তাঁর জীবনবোধে পরিবর্তন এসেছিল।

ক্ষৌণীশকে বাবাই নিজে থেকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মনে একটা বিশ্বাস ছিল, ক্ষৌণীশ হয়তো নিজের কাজটাকে ভালোভাবে নিতে পারবে। তা ও নিয়েছিল। রীতিমতো অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করে স্থপতিবিদ্যায় একজন বিশারদ হয়েছিল। চাকরিও পেয়েছিল ভালো। তারপরে যখন ব্যবসায়ে নেমেছিল, বাবাই ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ কালের ছেলে হয়েও, ও সেকালের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, বাবার পছন্দমতো মেয়েকেই বিয়ে করেছিল। বস্তুত পক্ষে অমলকে ওর পছন্দও হয়েছিল। তিনি ইচ্ছে করলে, ক্ষৌণীশকে বালিগঞ্জের বাড়িটি নাও দিতে পারতেন। তাঁর একটা ক্ষীণ ইচ্ছেও চিঠিতে দু' একবার প্রকাশ করেছিলেন, খুব একটা অসম্ভব না হলে, ক্ষৌণীশ যেন দেশে এসে বাস করে। দেশেও যে-ভাবে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, ক্ষৌণীশ সেখানে ওর কর্মক্ষমতার স্বাক্ষর রাখাত পারে।

বাবা আরও একটা কথা দু'একবার লিখেছেন। লিখেছেন, প্রত্যেক ছেলে-মেয়েদের জন্য যতটুকু না করলে নয় তিনিও তার বেশি কিছু করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, তাঁর ছেলেরা বিশেষ করে নিজেদের স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে-কারণে পিতা হিসাবে গৌরব বোধ করতেন। তবু দুই দাদা, অবশ্যই সম্পত্তি সম্পর্কে খুশি হতে পারেননি।

ক্ষৌণীশ অমলের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়নি। ও একা লণ্ডনে ফিরে যাবার আগে, দেশের স্থাপত্য ব্যবসা বিষয়ে নানান জনের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। কলকাতা উত্তর দক্ষিণে যে-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর বহুতল বাড়ি তৈরির সম্ভাবনাও যেরকম দেখা দিয়েছিল, স্থাপত্যের ক্ষেত্রটি একান্ত অনুর্বর ছিল না। ও একরকম হিসেব করেই, অমলের কাছ থেকে এক বছর সময় নিয়েছিল। অমলকে কলকাতায় বলতে গেলে, ছেলেমেয়েসহ একলা রেখে ও লণ্ডনে চলে গিয়েছিল। অমল উঠে পড়ে লেগে, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করেছিল। ভাসুর ননদরা খোঁজ খবর করলেও, কলকাতার সংসারের হাল ধরেছিল শক্ত হাতে। বাপের বাড়ির লোকেরা ওর ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। বিশেষ করে ওর বেকার ভাইয়েরা। কিন্তু অমল ভাইদের মাত্রাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দেয়নি। তারজন্য ওকে কিছু কটু কথা আর সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। তা হোক, ও নতি স্বীকার করেনি। ক্ষৌণীশ ওর আর্থিক কোনোরকম

অসুবিধে রাখেনি। নীচের তলার ভাড়াটেরা অমায়িক ভদ্রলোক। ক্ষৌণীশ ওর পৈতৃক বাড়িটা অমলকে লিখে দিয়েছিল। অমলের কাছে মাসে তিন হাজার টাকাই ছিল যথেষ্ট। যদিও এ দেশের পোড়া আয়করের আওতায় ওকে পড়তে হয়েছিল। ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির কারণে, এ দেশের মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক শুনতে যতোটা, আসলে ততটাই কম। কিন্তু আয়করের থাবাটা সরকারের লোভের হিংস্রতায় ধারালো।

ক্ষৌণীশ বিলেত থেকে কেবল কলকাতার সঙ্গেই ওর ব্যবসাসংক্রান্ত যোগাযোগ রাখেনি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছিল। অমলের সঙ্গে সপ্তাহে অন্তত চারদিন টেলিফোনে কথা হতো। বিলেতে ক্ষৌণীশ ওর পার্টনার মিটফোর্ডকে সমস্ত কথাই ভেঙে বলেছিল। প্রস্তাব দিয়েছিল, ভারতে যদি ব্যবসা সাফল্যজনক হবার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে মিটফোর্ড ওর সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তারজন্য মিটফোর্ডকে ভারতে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। সে টাকা লগ্নী করলেই হবে। কোম্পানি ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের উপযুক্ত বেতন দিয়ে, লাভের একটা হিসেব মতো অঙ্ক মিটফোর্ট পাবে। মিটফোর্ড অডিটের সময় বছরে একবার ভারতে এলেই হবে। কিন্তু মিটফোর্ড ভারতের স্থাপত্য সম্পর্কে খুব আশাবাদী ছিল না। ভারতের চেয়েও, এশিয়ার পেছিয়ে পড়া অন্যান্য দেশের প্রতি তার নজর ছিল বেশি। স্বাভাবিক। কারণ সে জানতো এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারতে উদ্যোগী আর উপযুক্ত লোকের অভাব নেই। অভাব যেখানে আছে, মিডফোর্ডের সুবিধা সেখানে। অতএব, সে ক্ষৌণীশকে একরকম পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিল ওর পক্ষে ভারতে চ্যাটার্জির সঙ্গে কোম্পানি খোলা সম্ভব হবে না।

মিটফোর্ডের সিদ্ধান্তই ক্ষৌণীশকে একটা জেদ ধরিয়ে দিয়েছিল। কারণ ও মিটফোর্ডের মনের কথা কিছুটা জানতো। বিবাদ বিসম্বাদে যাবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। ইংরেজদের বেনিয়া মনোভাবটা ভালোই ছিল। বরং আমেরিকানদের দুঃসাহসী ফাটকাবাজীর চেয়ে, ইংরেজদের বেনিয়া চিন্তার সঙ্গে বাঙালীর খাপ খায়! কারণ বোধহয়, পরস্পরের সম্পর্কটা ছিল দুশো বছরের জানাজানির মধ্যে। কলকাতায় ক্ষৌণীশের এক ভাইপো বি এসসি পাশ করেও বেকার বসেছিল। বেকার বসে থাকলেই স্বাধীন ভারতে যেটা সবচেয়ে সহজগম্য ক্ষেত্র, তা হল রাজনৈতিক দল। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, একটি মাত্র কারণে। ক্ষমতায় থাকবার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো সমস্তরকম আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। অতএব, রাজনৈতিক দলে ভিড়ে সুযোগ সন্ধানই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপের জায়গা। সারা ভারতে, কোথাও উদার দক্ষিণপন্থী, কোথাও দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোথাও বামপন্থী রাজ্যগুলোর ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। উদার দক্ষিণপন্থী দলের হাতেই বেশি সংখ্যক রাজ্য। তারপরই হচ্ছে দক্ষিণপন্থী সম্প্রদায়িকতাবাদীদের ক্ষমতা, তুলনায় বামপন্থীদের ক্ষমতা সীমিত।

ক্ষৌণীশের বড়দার ছেলে বেকার অনীশ কলকাতায় রাজনৈতিক দলে কিছু দাদা জুটিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু রাজনীতেতে ওর কোনো আদর্শগত দীক্ষা ছিল না। নেতারাও আদর্শের পরোয়া করেন না। দলের কাজে লাগলেই হলো। আর দলের কোনওরকম বিরোধিতা না করলেই, তার সাতখুন মাপ। ক্ষৌণীশ লক্ষ করেছিল অনীশের এলেম আছে। রাজনৈতিক নেতা হবার চেষ্টা ওর আদৌ ছিল না। কিন্তু দলবাজী করে নিজের কিছু গুছিয়ে নেবার চেষ্টাই ছিল ওর আসল লক্ষ্য। ঐরকম লক্ষ্য থাকাটা মন্দ না। তবে পথটা নিম্নগামী। অথচ অনীশের বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ন। সামান্য আভাসেই বুঝে নিতে পারতো অনেক কিছু। অল্প বয়সেই মনুষ্যচরিত্র বুঝতে শিখেছিল। আর ওর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যা, তা হলো বড়দার কাছ থেকে ঠাণ্ডা ও নির্বিকার ব্যবহার! বড়দা আশা করেছিলেন, তাঁর ছেলে হবে ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। অসাধারণ কেরিয়র গড়ে তুলবে। ছেলে হবে একটি কেষ্টুবিষ্টু। ঐ সব করতে হলে, ছেলের বাবারও যে কিছু করণীয় থাকতে পারে, বড়দা তা ভাবেননি। ফলে, অনীশ নিজেকে খানিকটা প্রত্যাখ্যাত ভাবতে অভ্যস্থ হয়েই, পড়াশোনার দিকেও তেমন এগুতে পারেনি। কিন্তু পড়াশোনা করলেও সত্যি, তথাকথিত সোনার চাঁদ ছেলে হতে পারতো।

ক্ষৌণীশ অনীশকে বিলেতে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিল। ভাইপোর জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ওর কোনও সন্দেহ ছিল না। ও অনীশকে বিলেতে নিজের কাছে কয়েক মাস রেখে আর্কিটেক্ট অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা চালাবার মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করে দিতে পেরেছিল। সেইসঙ্গেই বুঝিয়ে দিতে কসুর করেনি সমস্ত দিক থেকে বিশ্বস্ত হতে না পারলে, ও কোনোকালেই কোথাও কোনও উন্নতি করতে পারবে না। চুরি ডাকাতি করতে হলেও, নিজেদের মধ্যে বিশ্বস্ততা থাকা দরকার। ভালো কাজের তো কথাই নেই। অনীশকে এ কথা বুঝিয়ে বলার দরকার হয়েছিল, কারণ ক্ষৌণীশকে কলকতায় অফিস করে, নিজের একজন বিশ্বস্ত কেউ না থাকলে, নতুন জায়গায় ওর পক্ষে ব্যবসা চালানে সম্ভব ছিল না। অনীশ বলেছিল, "ছোটকাকা, তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আমার কাছে লক্ষ কোটি টাকা হাতের ছাতা ছাড়া আর কিছু হবে না। তুমি আমাকে একবার বিশ্বাস করে কাজে লাগাও। আর যাই হোক, আমি তোমার ছেলে না হতে পারি, তোমার দাদার ছেলে তো। বাবা যদি ঠিক মতো বুঝতেন, তা হলে অনেক কিছু সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু দেখলুম, অধিকাংশ বাবা মায়েরাই, ছেলে-মেয়েদের একটা বয়সের অবস্থা কিছুতেই বুঝতে পারে না। ছেলেমেয়েদের যখন সমাজে সংসারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, কারোর ওপর নির্ভরশীল থাকবে না, অথচ আত্মনির্ভরশীল হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সময়টা মারাত্মক। ছোটকাকা, আমি আমার নিজেকে দিয়ে এটা ভালো বুঝেছি। বাবা যদি বুঝতে পারতেন, তবে আমি ঝাণ্ডা কাঁধে শ্লোগান দিয়ে বেড়াতে যেতুম না। তুমি

আমাকে বিশ্বাস করে যে-কোনো কাজ দিয়ে দেখতে পারো। তবে হ্যাঁ, একটা মস্ত নকশার দায়িত্ব দিলে, আমি পালাবো।"

ক্ষৌণীশ বন্ধুর মতো হেসে, তেইশ বছরের অনীশের কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "ওটা তো আমার আর-আর্কিটেক্ট হিসেবে, প্রধান দায়িত্ব থাকবে আমারই। ফার্মের সুনাম নির্ভর করবে আমাদের ওপরেই। আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের ডাক পড়বে। কোথায় কীরকম কাজ করতে হবে, সে-দায়িত্ব আমার। তোকে দেখতে হবে টাকার দিকে। বিশেষ করে একাজ যদি সার্থক হয়, একটা বড় অঙ্কই আসবে ক্যাশে। ফার্মের ক্যাশিয়ার থাকবে। অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবে। নিয়মিত অডিটের কাজের জন্য একস্‌পার্ট থাকবে। তবু সবার ওপরে একজন থাকবে, সে ছাড়া ফার্মের মোট আয়ের বিষয়টি আর কেউ জানবে না, তোকে আমি সেই দায়িত্ব দিতে চাই।"

"ছোটকা, মাথা পেতে নিচ্ছি এই দায়িত্ব। তুমি আমাকে নিজের হাতে তুলে যা দেবে তার এক পয়সার বেশি আমি নেবো না।"

"তুই মাইনে নিবি ক্যাশিয়ারের হাত থেকে, আমিও নেবো। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার হিসেবের কথা আলাদা। তোকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, আমি তোকে আমার একটা অংশের পার্টনার করবো ভবিষ্যতে। এখন আমি আর তোর ছোটকাকিমা ডাইরেকটর হবো। তুই হবি অ্যাকাউন্টস কন্ট্রোলার! আমি জানি, অ্যাকাউন্টস কন্ট্রোল করতে হলে, হিসাব আর আর আইন সম্পর্কে বিশারদ হওয়া দরকার। আপাতত তোকে আমি সেসব চালিয়ে নেবার মতো বুদ্ধি দিতে পারবো, ক্ষমতাও থাকবে তোর হাতে। সেরকম বুঝলে, পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে নিবি। তবে জানবি, সবই নির্ভর করে নিজের ইচ্ছে আর পরিশ্রমের ওপর। পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নেই, যে কোনোরকম অ্যাকাডেমিক কোয়ালি-ফিকেশন ছাড়াই, নিজের বুদ্ধি দূরদৃষ্টি আর পরিশ্রমের গুণে বিরাট ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত গড়ে তুলেছে।"

ক্ষৌণীশকে এর বেশি বলতে হয়নি। ও বিলেত থেকে ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অনীশকে বলেছিল "কলকাতায় গিয়ে পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির আশেপাশে মিনিমাম তিন হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা অফিস অ্যাকোমোডেশন খুঁজে বের কর। ব-কলমে পৃথিবীর সব জায়গাতেই সেলামী দিতে হয়। মিডলম্যানের ভূমিকা খুব বড়। তুই তোর ধারণা মতো, সেলামীর টাকা ঠিক করবি, করেই আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবি। আমি বরাবরের জন্য লণ্ডন ছেড়ে যাবার আগে, তোর চিঠি পেয়েই চলে যাবো। অফিস করেই, ইংরেজি বাংলা কাগজে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আর বিভিন্ন পোস্টে অভিজ্ঞ কাজের লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেবো। ওখানে প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিয়েই আমি আবার লণ্ডনে ফিরবো। কারণ ইতিমধ্যেই আমি দেশের কয়েক জায়গায় লণ্ডন থেকে কাজের প্রস্তাব দিয়েছি। তিনটি কাজের অনুমোদনও পেয়েছি। একটি কলকাতার। দুটি ভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু নকশার

কপি আমি বেহাত করতে পারিনে। নকশা একবার বেহাত হলে, সেটি নকল হয়ে যাবার ভয় আছে। তবে আমি কেবল আর্কিটেক্ট নই। ইঞ্জিনিয়ারও বটে। আমার নকশার কাজ করতে হলে, আমার সাহায্য ছাড়া কাজ করা কঠিন' বিপজ্জনকও বটে। সে-রকম ঝুঁকি কেউ সহজে নিতে চাইবে না। তবে সাবধানের মার নেই। তিনটে কাজের খরচ পাঁচ কোটি টাকার মতো। ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলে, আমি মিনিমাম প্রায় চৌদ্দ লাখ টাকা পাবো। কিন্তু তিনটে কাজ নিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবো না। আরও কাজ দেখতে হবে। সব জায়গাতেই এখন কম্পিটিশনের ব্যাপার। হয় তো, বড় কোনো কাজের জন্য আমাকেই খরচ করতে হবে পাঁচ লাখ। কিন্তু আমাকে দেখতে হবে, পাঁচ লাখ দিয়ে আমি যেন কুড়ি লাখ ঘরে তুলতে পারি।''

ক্ষৌণীশ অনীশের সাহায্যে কলকাতার অফিস, এক বছর ও কয়েক মাস পরে, রীতিমতো দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। বিলেতে মিটফোর্ড অ্যান্ড চ্যাটার্জি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে পেয়েছিল সাতাশ লক্ষ টাকা। বাড়ি বিক্রি করে পেয়েছিল পনেরো লক্ষ টাকা। কেবল গাড়িটা ও বিক্রি না করে, জাহাজে ভাসিয়ে দিয়েছিল কলকাতা বন্দরের ঠিকানায়। এখন ক্ষৌণীশের কলকাতা অফিস ছাড়াও বম্বে আর ব্যাঙ্গালোরেও দুটি অফিস খুলতে হয়েছে। পনেরো বছরের মধ্যে, চ্যাটার্জি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং' রীতিমতো সুনাম আর পারদর্শিতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভাইপো অনীশের অবদানকে ও অস্বীকার করতে পারে না। ও বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়ে, সততার সঙ্গে কাজ করেছে। নিজের কাজের দায়িত্ব ও বুঝেছে। দায়িত্ব রক্ষাও করেছে। এখন অনীশ ক্ষৌণীশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ক্ষৌণীশের মতোই ওকেও কলকাতা-বোম্বে-ব্যাঙ্গালোর করতে হয়। ইতিমধ্যে ও বিয়ে করেছে। কলেজে পড়বার সময়েই একটি মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিয়ে করেছে তাকেই। অনীশের সবই ভালো। সৎ, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান। কিন্তু এক দোষে, সব গুণ নাশে। সুরাসক্তিটা ওর প্রবল। তবে সেটা এখনও সব গুণ নাশ করেনি।

অমল বিলেত থেকে দেশে শিকড় প্রোথিত করে সুখী হয়েছিল। কিন্তু অমল কি সত্যি সুখী হতে পেরেছে? চাওয়া পাওয়া, মিল অমিলের দ্বন্দ্বে ভরা সংসার ও জীবন কোনো রীতি বা নীতির ছকেই ধরা দেয় না।



ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যখন বাহারাগোড়ার ডাকবাংলোয় পেঁছুলো, তখন বেলা এগারোটা বাজতে পনরো মিনিট বাকি। এই সময়ের মধ্যে বাহারগোড়া পেঁছোনোর তেমন ঝুঁকি ছিল না। তবু ইন্দ্রাণীর মতে, "বড্ডো স্পীডে এসেছো। আমার অস্বস্তি হয়।"

"আর আমি ভেবেছিলুম, বাহারাগোড়ায় পেঁছুবো অন্তত দশটার মধ্যে।" ক্ষৌণীশ বাংলোর বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, ঘন ঘন হর্ন দিল।

সামনের বৃহৎ বাগানে কাজ করছিল একটি খাঁকি হাফ প্যাণ্ট পরা ময়লা গেঞ্জি গায়ে যুবক। ধীরেসুস্থে এসে দরজা খুলে দিল বটে। ফিরেও তাকালো না। সেলাম তো দূরের কথা। গেট বন্ধ না করে আবার নিজের কাজে চলে গেল। চোখে মুখে কৌতূহল থাকলেও একটা কথা বললো না। ক্ষৌণীশ জানে, আজকাল বিশেষ করে, এই বঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকদের আচরণ হয়ে উঠেছে রীতিমতো উদ্ধত আর অবিনীত। নিশ্চয়ই তার পিছনে, কারণ হিসেবে রয়েছে বহুকালের শোষণ পীড়ন লাঞ্ছনা অপমান। কিন্তু যে রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীরা সেই ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে তুলছে, আদিবাসীদের ঠেলে দিচ্ছে ঘৃণা আর বিক্ষোভের দিকে, তারা একবারও কি ভেবে দেখেছে, স্থিতি আর গঠনের পথে না গিয়ে, কোন্ অন্ধ হিংস্র হিংসাকে তারা জাগিয়ে তুলছে?

ক্ষৌণীশ সমাজতাত্ত্বিক না। কিছু কিছু জিজ্ঞাসা ও চিন্তা অনিবার্যভাবেই মনে আসে। যতোই নির্বিকার থাকার চেষ্টা করুক, জীবন ধারণ করতে গেলেই, দেশের নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়। যে বিষয়ে ওর কোনো হাত নেই ঘটনাচক্রে তারই অংশীদার হয়ে উঠতে হয়। ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে না। কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক, বা দলকে সমর্থনের প্রশ্ন তো আসেই না। তথাপি রাজনীতি কি ওকে ছেড়ে কথা কয়? রাজনীতি এমনই সর্বগ্রাসী, কোনো শ্রেণীর মানুষই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। জীবনধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনীতি তার জাল বিস্তার করে রয়েছে। তার স্বভাবগত দাবী হলো, সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে তার হাতে। জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে থাকবে তার নির্দেশ আর পরিচালনা। যার আর এক নাম বোধহয় ক্ষমতা। এ দেশের গণতন্ত্রকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাববার বিষয়, সাধারণ মানুষ সেই গণ-তন্ত্রের সুবিধা কতোখানি ভোগ করে। এদেশে একজন মন্ত্রী অনায়াসে বলতে

পারে, তাঁর নিজের দপ্তরের কোনো ব্যয়ের ব্যাপারে, তাঁর নিজের প্রস্তাবই শেষ কথা। তার ফলে যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ অসহায় বিপন্ন বোধ করে, তার জন্য মন্ত্রী আদৌ বিচলিত বোধ করেন না! কারণ, তিনি নাকি ব্যক্তি মানুষের কথা ভেবে কোনো কাজ করেন না। সাধারণের উপকার ও উন্নতির জন্যই তাঁর যা কিছু কাজ। এ ক্ষেত্রে তিনি জনপ্রতিনিধি, অতএব, দলীয় সমর্থনে তিনি নাকি সকলের স্বার্থ রক্ষা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা হলো, নির্বাচন। নির্বাচনে জয়লাভই হলো শেষ কথা। জনসাধারণ নামে একটি বিশাল জন-গোষ্ঠী, চিন্তা ভাবনার সম্যক পরিচয় যে কী, সে-ব্যাখ্যা কেউ করে না। জন-প্রতিনিধিটির আচরণ ও কাজ জানিয়ে দেয়। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে কারোর অস্তিত্ব যদি থাকে, তা হলে তিনি নিজেই ব্যক্তি মানুষ। আর তাঁর নিজের বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারটিকে একান্ত নিজের বলে ভাবেন, তখন ভুলেই যান, টাকাটা তাঁর পৈতৃক সঞ্চয় থেকে আসেনি। টাকাটা জনসাধারণের। এমন কি দেশসেবক হিসেবে, তাঁর অঙ্গের বস্ত্র, মুখের খাদ্য আর চেপে বেড়ানো গাড়িটি পর্যন্ত জনসাধারণের রক্ত জল করা টাকার প্রাপ্তি।

ক্ষৌণীশ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে দাঁড় করালো বারান্দার সামনে। কয়েকবার হর্ন দিয়ে, দরজা খুলে নামলো। এগিয়ে গেল গেটের কাছে। খোলা গেটের লোহার দুই পাল্লা টেনে বন্ধ করলো।

"এ কি, তুমি গেট বন্ধ করছো কেন?" ইন্দ্রাণী গাড়ি থেকে নেমে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

ক্ষৌণীশ চোখের কোণ্ দিয়ে একবার খাকি হাফ প্যাণ্ট আর ময়লা গেঞ্জি গায়ে লোকটাকে দেখলো। বাগানে কোদাল চালাতে চালাতে সেও একবার ক্ষৌণীশের দিকে দেখলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলো। ক্ষৌণীশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে হাসলো, "ওর গেট খুলে দিয়ে চলে যাবার ভঙ্গিটা দেখলে না? ওকে যদি বন্ধ করতে বলতুম হয় তো জবাবই দিতো না। দিনকাল এইরকম। নিজের হাতে যতোটা পারা যায়, করে নিতে পারলেই ভালো।"

"কিন্তু এখন তুমি এ বাংলোয় ঢুকলে কেন?" ইন্দ্রাণী ডান হাতের কবজি তুলে ঘড়ি দেখলো, "আমরা কি সেইখানে পৌঁছে গেছি নাকি, যেখানে আজকের রাতটা কাটাবো?"

ক্ষৌণীশ লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে, কিছু বলবার আগেই বারান্দার ডান দিকের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে এলো। পাজামার ওপরে একটা নীল রঙের শার্ট, লম্বা রোগা লোকটির গায়ে। কপালে দু হাত ঠেকিয়ে ঝুঁকে হেসে বললো, "নমস্কার স্যার। আজ আসবেন বলে তো কোনো খবর দেন নাই?"

"না নরোত্তম, এখন যাবার পথে বাহারাগোড়ায় থাকতে আসি নি।" ক্ষৌণীশ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খুশি হয়ে হাসলো, "আমি যাবো উড়িষ্যার

মশিপুর। ফেরবার পথে এ বাংলোয় ঘর খালি পেলে একরাত থেকে যেতে পারি। সেটা পরে ভাববো। এখন তুমি আমাদের একটু ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে পারবে ?"

নরোত্তম লোকটি খুবই বিনীত। সে যে বাঙালী, তার কথাতেই বোঝা যায়। আর ক্ষৌণীশ যে তার পরিচিত এবং বেশ ভক্তি খাতির করে, সেটাও বোঝা গেল। সে হেসে বললো, "কেন পারবো না স্যার ? আসুন, ভেতরে এসে বসুন।"

"এসো খুশি।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে ডেকে বারান্দায় উঠলো।

বারান্দায় কয়েকটি সারি সারি বেতের চেয়ার রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে, দরজা বন্ধ তিনটি ঘর। ডান দিকের দরজাটিই কেবল খোলা। ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের সঙ্গে ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকলো। সামনেই রয়েছে বসবার সোফা সেট। বন্ধ জানালায় শস্তা রঙীন কাপড়ের পর্দা। ঘরের এক পাশে রয়েছে ছ'টি চেয়ার ঘিরে একটি লাল সানমাইকার টেবিল। দেওয়াল ঘেঁষে একটা রেফ্রিজারেটার। দেখলেই বোঝা যায়, এটি বসবার এবং খাবার ঘর। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে।

"ব্রেকফাস্টে কী খাবেন স্যার ?" নরোত্তম বিনীত হেসে জিজ্ঞেস করলো। এবং ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে ঝুঁকে নমস্কার করলো।

ইন্দ্রাণী খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকালো। ক্ষৌণীশ তাকেই জিজ্ঞেস করলো, "কী খাবে খুশি। নরোত্তমকে বলে দাও। সময় তো আমাদের হাতে বেশি নেই।"

"বাটার টোস্ট, ডিমের ওমলেট আর কফি পাওয়া যাবে ?" ইন্দ্রাণী নরোত্তমের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

নরোত্তম ঘাড় কাত করে সবিনয়ে বললো, "পাওয়া যাবে। আপনারা বসুন। আমি ব্যবস্থা করছি। মিষ্টির দরকার নাই তো ?" সে ক্ষৌণীশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

"না নরোত্তম, এখন আর মিষ্টির দরকার নেই।" ক্ষৌণীশ হেসে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালো, "আমার মিষ্টির ওপর দুর্বলতার কথা নরোত্তম ভালো জানে।"

নরোত্তম পিছন ফিরবার আগে ইন্দ্রাণীর দিকে একবার দেখে হেসে বললো। "আপনি তো স্যার মিষ্টি না খেলে জল খেতে পারেন না।" সে পিছন ফিরে চলে গেল ঘরের শেষ প্রান্তে। অদৃশ্য হলো, ডান দিকের দরজায়।

"বাব্বা! স্যারের কী খাতির!" ইন্দ্রাণী চোখ ঘুরিয়ে, গলা নামিয়ে বললো, "স্যারের অনেক খবরই নরোত্তম কুমার জানে দেখছি। অবিশ্যি তোমার মুখে এই বাহারাগোড়ার কথা কয়েকবার শুনেছি। তা এ লোকটি তো বেশ ভদ্র আর অমায়িক। বাগানের লোকটার ব্যবহার ঐরকম কাটখোট্টা কেন ?"

ক্ষৌণীশ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো, "বস খুশি, বলছি। তার

আগে বলি এ বাংলোটা আমার খুব প্রিয়। বাংলোর পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা উত্তর বরাবর চলে যাচ্ছে, ওটা গেছে জামসেদপুরের দিকে। একবার ভেবেছিলুম, বাহারাগোড়ার কোনো ধাবায় গরম পরোটা আর পেঁয়াজ আলুর ছেঁচকি, তার সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারবো। সেটা কিছু মন্দ হতো না। আর সর্দারজীদের দুধের চা। কিন্তু সেটা করতে গেলে সময় লাগতো। সময় এখানেও লাগবে। তবে, একটু আরাম করে বসা গেল। আর নরোত্তমের সঙ্গেও দেখা হল। এ বাংলোতে আগে আমি বার তিনেক এসে থেকেছি।"

"সঙ্গে কে ছিল?" ইন্দ্রাণী সোফায় বসে, ঘাড় কাত করে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

ক্ষৌণীশ দাঁড়িয়েছিল। বসলো ইন্দ্রাণীর প্রায় গা ঘেঁসে। মুখ উঁচু করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো, "অন্তত জনা তিনেক, কিন্তু সবাই সঙ্গী। সঙ্গিনী একজনও নয়।"

"সেটা আর আমার কাছে কবুল করবে কী করে?" ইন্দ্রাণী নিবিড় চোখে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলো, "ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি আউটিং করতে বেরিয়েছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে কোনো সঙ্গিনী নেই, এটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

ক্ষৌণীশ ছাইদানিতে ছাই ঝাড়লো, "নরোত্তমকে সাক্ষী মেনে তোমার আমার দুজনের সম্মান নষ্ট করতে পারি নে। কিন্তু কথাটা তোমাকে মিথ্যে বলিনি। দুবার এসেছি ভাইপো অনীশ আর ফার্মের দুই অল্পবয়সী ইঞ্জিনিয়ার ছেলেকে নিয়ে। আর একবার এসেছিলুম বম্বের এক আরবান ডেভলপমেণ্ট অ্যাণ্ড হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট অফ মহারাষ্ট্রের এক অফিসারকে নিয়ে। তিন বারই বলতে পারো বেড়ানোর সঙ্গে কাজের একটা সম্পর্ক ছিল।"

"ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি সম্পর্কে কলকাতায় এত গল্পের ছড়াছড়ি, আমি কী করবো বলো।" ইন্দ্রাণী কাঁধ দিয়ে ক্ষৌণীশের জামায় একটু চাপ দিয়ে হেসে বললো, "আর সব গল্পেই একটি করে মেয়ের নাম জড়িয়ে থাকে।"

ক্ষৌণীশ যেন খানিকটা অসহায় হেসে, সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে দিল ছাইদানীতে। বললো, "কী করবো খুশি। কারোর কারোর জীবনে কলঙ্কটা, তার নিজের ছায়ায় মতোই তাকে জড়িয়ে থাকে। তোমার কাছে আমার আর নতুন করে পরিচয় পাড়বার কিছু নেই।"

"ছাড়ো ওসব কথা।" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের হাঁটুর কাছে চাপড় মারলো, "বাগানের ঐ লোকটার সম্পর্কে কী যেন বলছিলে?"

ক্ষৌণীশ গম্ভীর মুখে ঠোঁট টিপে বিমর্ষ হাসলো, "বলার তেমন কিছু নেই। ওকে আমি চিনিনে। নামও জানিনে। তবে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের আদিবাসী যুবক। এদের আজকাল নানারকমভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। ইদানীং কয়েক জায়গায় ঘুরতে গিয়েই দেখেছি, আর বুঝেছি। এটা ঠিক, এদের চিরকালের অধিকার জঙ্গল পাহাড়ের বাসস্থান থেকে ভিটাছাড়া করা হয়েছে। কোনোরকম ট্যাক্স না দিয়ে, এরা পাহাড়ে জঙ্গলে

সামান্য চাষ আর শিকার করে সুখে জীবন কাটাতো। সভ্যতার কিছু অশুভ শক্তি আছে। সেই অশুভ শক্তির মারটা এসে পড়েছিল ওদের ওপর। ওদের কেবল ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়নি! জঙ্গলের জীবন থেকে এদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সমতলের ব্যবসায়ীরা এদের সব দিক দিয়ে ঠকাচ্ছে। এই বঞ্চনার পথ খুলে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকরা। সুযোগ নিয়েছে তাদের বংশবদ দালালরা। যে-জঙ্গল ছিল আদিবাসীদের নিজস্ব এলাকা, যেখানে তারা শান্তিতে বাস করতো, সেখানে জঙ্গল ইজারা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল এক শ্রেণীর ইজারাদার সম্প্রদায়। এরা জঙ্গল কেটে ধ্বংস করেছে। উচ্ছেদ করেছে আদিবাসীদের, তাদের চিরকালের অধিকার থেকে। খাটিয়েছে যেমন খুশি। আর ওদের মেয়েদের শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে…”

“দোহাই স্যার ক্ষৌণীশ চট্টোপাধ্যায়! আমি আপনাকে একটা পুরো প্রবন্ধ মুখস্থ বলতে বলিনি।” ইন্দ্রাণী হেসে হাত জোড় করলো, “বাব্বারে বাব্বা! ঐ অসভ্য লোকটার কথা জিজ্ঞেস করে কী ঝকমারি করেছি। অল্প কথায় কিছু বলতে পারো না?”

ইতিমধ্যে ওমলেটের গন্ধ আসছিল। ক্ষৌণীশ হেসে বললো, “তা হলে এখানেই ইতি করছি। ব্রেকফাস্ট বোধহয় তৈরি হয়ে গেল।”

“কিন্তু কথাটা শেষ কর।” ইন্দ্রাণী কাঁধ ঝুঁকিয়ে ক্ষৌণীশের গায়ে ধাক্কা দিল।

ক্ষৌণীশ হেসে বললো, “কোনো কোনো কথা বলতে গেলে, মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ডটা না বললে, আসল বিষয়টা বোঝানো যায় না। আমি কি তোমার জানা কথা রিপিট করছি? তা হলে আর কিছু বলার নেই। বাগানের কাজের জোয়ানটি কেন ঐরকম ব্যবহার করছিল, তুমি ভালোই জানো।”

“অমনি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল?” ইন্দ্রাণী একবার ঘরের শেষ প্রান্তের দিকে দেখে, ক্ষৌণীশের গালে গাল ঠেকিয়ে চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে হাসলো, “মার্জনা চাইছি। মনোযোগ দিয়ে শুনবো। তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডসহই বল।”

ক্ষৌণীশের হাসি মুখে হালকা ছায়া পড়েছিল। ও ইন্দ্রাণীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো, “ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলা হয়ে গেছে। ঐ অবস্থায় আদিবাসীদের মনে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে অনেককাল আগে থেকেই। এর একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আদিবাসীরা সেটা বোঝে। তারা এই বঞ্চনা, অপমান মেনে নিতে পারে না। বিদেশী মিশনারিরা এদের অনেক উপকার করেছে। একটা স্বার্থও তাদের ছিল। অনেক আদিবাসীদের তারা ধর্মান্তরিত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের শিক্ষিত করে তোলারও চেষ্টা করেছে। এ দেশের মানুষ, আদিবাসীদের কোনো উপকারই করেনি। আদিবাসী কল্যাণের জন্য কিছু আইন তৈরি করেছে, যা কোনো কাজেই লাগেনি! কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে ওদের যারা কাজে লাগাচ্ছে, তারা কিন্তু জঙ্গলে ওদের নিশ্চিত পুনর্বাসনের

বদলে, জন্ম দিচ্ছে ঘৃণা আর হিংসার। আদিবাসীদের আন্দোলন নিশ্চয়ই করতে হবে। সহজে তো ওরা ওদের অতীতের অধিকার ফিরে পাবে না। তবে ওদের আন্দোলন ওদেরই করতে হবে। নেতা আসবে ওদের ভেতর থেকেই। যে সব ইজারাদার ঠিকাদাররা ওদের বহুকাল ধরে বঞ্চিত আর অপমান করে আসছে, এখানকার রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা, যারা ওদের ক্ষেপিয়ে তুলছে, তারাও ওদের কোনো উপকার করছে না। কলকাতায় বসেই অনেকে আদিবাসী বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টায় আছে। আর তথাকথিত সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিক, সমাজসেবী বা বিপ্লবীরা ওদের ঠেলে দিচ্ছে নৈরাজ্যবাদের পথে। কারা ওদের শত্রু বা মিত্র, না জেনেই, আমাদের সবাইকে শত্রু ভাবতে আরম্ভ করেছে। আমরা তো কর্তৃপক্ষের কেউ নই। ওরা যদি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমি ওদের সমর্থন করবো। আমি যে জঙ্গলে বেড়াতে যেতে ভালবাসি, তার কারণ ওদেরও ভালবাসি বলেও। বাগানের ঐ লোকটার উদ্ধত ব্যবহার প্রমাণ করেছে, ও হচ্ছে সেই সব মধ্যবিত্ত সুযোগ সন্ধানী বিপ্লবীদের শিকার। ও ওর নিজের সত্তাকেই ভুলেছে। এই পর্যন্ত বলে ক্ষান্ত হলেম মহাশয়—থুড়ি, ইন্দ্রাণী মিত্র মহাশয়া…"

"আসুন স্যার।" নরোত্তম খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো।

ক্ষৌণীশ উঠে দাঁড়ালো। ইন্দ্রাণীকে বললো, "চলো, খেয়ে নিই। আমাদের লাঞ্চ জুটবে বাংরিপোষির বাংলোয়।"

খাবার টেবিলে দুজনে বসলো মুখোমুখি। গরম টোস্ট চার জোড়া, মাখন আর ওমলেট দিয়েছে দু প্লেটে। ইন্দ্রাণী টোস্টে মাখন মাখিয়ে আগে দিল ক্ষৌণীশের প্লেটে। নরোত্তম তখন বোধহয় কফি তৈরিতে ব্যস্ত। ক্ষৌণীশ ক্ষুধার্তের মতো জোড়া টোস্ট তুলে মুখে দিল। ইন্দ্রাণী তখন ক্ষৌণীশের ওমলেটে নুন আর গোলমরিচ ছড়াচ্ছে। কিন্তু ওর মুখে লেগে আছে হাসি। কাজ করতে করতেই তাকিয়ে দেখছে ক্ষৌণীশের দিকে। ক্ষৌণীশ তখন খানিকটা অন্যমনস্ক। ইন্দ্রাণী একটি টোস্টে মাখন মাখিয়ে মুখে দেবার আগে জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো ?"

'শুনছি একটা মজার জিনিস।" ক্ষৌণীশ খেতে খেতেই মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, "শুনতে পাচ্ছো, মাঝে মাঝেই সাঁ সাঁ শব্দে ট্রাক, লরি বা প্রাইভেট গাড়ি চলে যাচ্ছে। আমরা বসে আছি জামসেদপুর যাবার রাস্তা ধরে। সারা রাত্রিই এ পথে গাড়ি চলে। রাত্রে যখন সব কিছু নিঝুম হয়ে আসে, তখন এই হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। বাহারাগোড়ার এই বাংলোর এটাও একটা আকর্ষণ। আর বারান্দায় তুমি যদি দক্ষিণ মুখ হয়ে বস, দেখবে মাইলের পর মাইল দূরে আকাশ ঠেকে আছে। বর্ষা যখন ঐদিক থেকে ধেয়ে আসতে থাকে, সেটা এক অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য।"

ইন্দ্রাণী ওমলেট চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে বললে, "তুমি তো একজন আর্কিটেকট অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। তাও আবার বিলাত ফেরত। আদিবাসীদের

সম্পর্কে এতো ভাববার সময় কোথাও পাও? আর তারপরে এই বাংলোয় রাতে গাড়ি চলার শব্দ আর বর্ষা দেখ, এসব দেখে শুনে মুগ্ধ হবার-মতো মানসিক অবস্থা—"

"আমার মতো মানুষের থাকা উচিত নয়।"

"অনুচিত বলিনি। তোমার ফিলিংস্-এর কথা ভেবে আমার অবাক লাগে!"

"অবাক লাগার কি আছে খুশি?" ক্ষৌণীশ খাওয়া না থামিয়েই হেসে কথা চালিয়ে গেল, "আমি আর্কিটেক্ট আর ইঞ্জিনিয়র বলে, কেবলই কি নকশা, লোহালক্কড় সিমেণ্ট ইঁট কাঠের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখবো? ওটা আমার প্রফেশন। তার জন্য যা যা করা উচিত সবই করি। তা ছাড়াও এ জগতটা অনেক বড়। আমার কাজের বিষয় ছাড়াও আছে অনেক জগত। তুমি জানো, তার মধ্যে বনে পাহাড়ে বেড়ানো আমার একটা হবি। কবিতা আমি লিখিনে। কবিও নই। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখার চোখ আর কান দিয়েছেন। বাহারাগোড়ার বাংলোয় বসে সাত আট মাইল দূর থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টি দেখে যেমন আমি মুগ্ধ হই, তেমনি গভীর রাতে, ছুটন্ত ট্রাক লরির শব্দ যেন আমার কাছে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো মনে হয়। তুমি হয়তো শুনলে হাসবে, সেই শব্দের মধ্যে আমি যেন এক অজানা অলৌকিক জগতের সংবাদ পাই। যা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো না।"

ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো। নরোত্তম কফি পট আর কাপ ডিস সহ ট্রে বসিয়ে দিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত ক্ষৌণীশ চার পিস টোস্ট আর ওমলেট খেয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রাণী কোনোরকমে দেড় পিস টোস্ট আর ওমলেট খেয়েছে। ক্ষৌণীশ জানে, খাবার ব্যাপারে খুশিকে বলার কিছু নেই। ওর নিজের কিছু প্রিয় শুকনো খাবার গাড়িতে আছে। যখন ইচ্ছা হবে খাবে। নরোত্তম নিজেই কফি কাপে ঢেলে দিল। দুধ না মিশিয়ে সরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, জল খাবেন।"

"না জল খাবো না।" ক্ষৌণীশ হেসে নরোত্তমের দিকে তাকালো, "তা হলে আবার তোমাকে মিষ্টি আনতে ছুটতে হবে। কিন্তু তার আর সময় নেই। এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। চেষ্টা করবো, বেলা দেড়টার মধ্যে যাতে বাংরিপোষি পৌঁছুতে পারি।"

ইন্দ্রাণী তখন কফিতে দুধ আর চিনি মেশাচ্ছে। একটা ধূমায়িত কাপ এগিয়ে দিল ক্ষৌণীশের দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে লেগে আছে হাসি। কিছু বলবার ইচ্ছা থাকলেও, নরোত্তমের উপস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষৌণীশ আবার নরোত্তমের দিকে তাকালো, "তুমি ব্রেকফাস্টের বিলটা দাও।"

নরোত্তম প্রস্তুতই ছিল। ক্ষৌণীশের চাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল। জামার বুক পকেট থেকে একটি সামান্য চিরকুট বাড়িয়ে দিল। ক্ষৌণীশ দেখে, হিপ পকেট থেকে পার্স বের করলো। টাকা বের করে বাড়িয়ে দিল নরোত্তমকে। নরোত্তম টাকা হাতে নিয়ে নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলো। ক্ষৌণীশ মাথা

নেড়ে হাসলো, "তোমাকে আর কিছুই ফেরত দিতে হবে না। আমি ফেরবার পথে একটা রাত্রি এখানে থেকে যাবার চেষ্টা করবো। অবিশ্যি ঘর যদি খালি পাওয়া যায়।"

"এই বর্ষার সময় স্যার ঘর বেশির ভাগ দিন খালি থাকে।" নরোত্তম সসম্ভ্রমে হেসে বললো, "কিন্তু স্যার আপনি ঘশিপুরে কোথায় যাবেন ?"

ক্ষৌণীশ হিপ পকেটে পার্স ঢুকিয়ে হেসে বললো, "ঘশিপুর থেকে কোথায় আর যাবো বল। •সিমলিপাল ফরেস্টে ছাড়া, ঘশিপুরে আর কী দেখবার আছে ? খৈরি ছিল। সে তো স্বর্গে গেছে। সেই সঙ্গে স্বর্গে গেছেন সরোজ রাজ-চৌধুরীও। যদি ঘশিপুরে একটা রাত থাকি, তবে ওখানকার ক্রোকোডাইল প্রজেক্টে থাকবো।"

"এখন এই বর্ষার সময় জঙ্গলে যাবেন ?" নরোত্তমের মুখে যেন কিঞ্চিৎ উদ্বেগের ছায়া। "পারমিশন পাবেন তো ?"

ক্ষৌণীশ হাসলো, "দেখা যাক। আশা করি পাবো। আর বর্ষা তো শেষ হয়ে এলো। সেপ্টেম্বর মাস পড়ে গেছে।"

নরোত্তম আর কিছু বললো না। ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীর কফির কাপ শেষ। দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। ক্ষৌণীশ জিজ্ঞেস করলো, "নরোত্তম, বাংলোর বাগানে যে লোকটি কাজ করছে, ও কোথাকার লোক ?"

"স্যার ও ঝাড়গ্রামের লোধা ছেলে।" নরোত্তম জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো, "কেন স্যার ? ও কি কোনোরকম বেয়াদপি করেছে ?"

ক্ষৌণীশ হেসে মাথা নাড়লো, "না না কোনোরকম বেয়াদপিই করেনি। এমনিই জিজ্ঞেস করলুম। চলি।"

"আবার আসবেন স্যার।" নরোত্তম দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ঝুঁকে নমস্কার করলো।

ক্ষৌণীশ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ইন্দ্রাণী ব্যাগ হাতে নিয়ে আগেই উঠে গিয়েছে। নরোত্তম বারান্দায় গিয়ে, ইন্দ্রাণীকে নমস্কার করলো। ইন্দ্রাণী মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। ক্ষৌণীশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার দিগন্তবিস্তৃত দক্ষিণের দিকে তাকালো, "আমরা ঐদিক থেকেই এসেছি। এবার আমরা যাবো পশ্চিমে।" ও গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিং ধরে বসলো।

ইন্দ্রাণী উঠলো বাঁ দিক থেকে। বাগানের লোকটি কাজ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। নরোত্তম নিজেই এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে দিল। ক্ষৌণীশ সামনে এগিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে এনে, গেট দিয়ে বেরোবার সময় হাত তুলে নরোত্তমকে আবার বিদায় জানালো। নরোত্তমও দুহাত কপালে ছোঁয়ালো। ক্ষৌণীশ রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে দেখে, ডান দিকে ঘুরলো। বললো, "বাহারগোড়ায় এসে মিশেছে তিনটি রাজ্যের পথ। বাঙলা বিহার উড়িষ্যা। উত্তরে রাস্তা গেছে বিহারে। দক্ষিণে বাঙলা। আপাতত পশ্চিমে গেলেও, আমরা যাবো আসলে দক্ষিণ পশ্চিমে। সুবর্ণরেখা পেরিয়ে জামসোলা। জামসোলা থেকে এক ফার্লং-এর

মধ্যে আমরা উড়িষ্যার মধ্যে গিয়ে পড়বো। আমাদের যাত্রার শুভ ব্যাপার হলো একটাই।

"সেটা কী?" ইন্দ্রাণী মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো। ওর চুল উড়ছে।

ক্ষৌণীশ হেসে বললো, "এই মেঘলা ছায়া ঘন দিন, আর ঠাণ্ডা বাতাস।"

"কিন্তু তোমার নরোত্তম এ বর্ষায় জঙ্গলে যাওয়াটা যেন পছন্দ করছিল না!

"ও ভেবেছে, আমি যশিপুর ফরেস্ট অফিস থেকে সিমলিপালের জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি পাবো না।"

ইন্দ্রাণী আবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। কপাল ও কানের কাছে উড়ন্ত চুলের গোছা দু হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, "সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"মনে তো হয় না।" ক্ষৌণীশ হেসে তখন বাহারাগোড়ার গোল চক্র পাক দিয়ে পশ্চিমে ঘুরছে, "এর আগেও দুবার সিমলিপাল গেছি। তখন তো অনুমতি পেয়েছি। তবে, এরকম সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কখনো যাই নি। একবার গেছি মার্চে আর একবার মে-তে। দেখা যাক।"

ইন্দ্রাণীর মুখে যেন অস্বস্তির ছায়া পড়লো, "দেখো বাপু। এতোটা পথ গিয়ে, শেষে ফিরে না আসতে হয়।"

"ফিরে আসবো কেন খুশি?' ক্ষৌণীশ মোড় ফিরে পশ্চিমে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে সুবর্ণরেখার দিকে। বাঁ হাত স্টিয়ারিং থেকে তুলে ইন্দ্রাণীর অলকগুচ্ছ দুলিয়ে দিল "সিমলিপালের ফরেস্টে যেতে অনুমতি যদি নেহাত না পাই, তাহলে ভুবেনেশ্বর আর পুরীর রাস্তা কে আটকাবে? তবে আমার নিজের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, সিমলিপালে যাবার পারমিশন নিশ্চয়ই পাবো।"

ইন্দ্রাণীর ছায়া মুখে আলো ফুটলো। হেসে ক্ষৌণীশের কাছ ঘেঁষে বসে বললো, "এক জায়গায় রওনা হয়ে, আর এক জায়গায় যেতে মোটেই ভালো লাগবে না। বিশেষ করে পুরীর সমুদ্রের ধারে আমি এখন যেতে চাই না।"

ক্ষৌণীশ সুবর্ণরেখার সেতুর ওপরে গাড়ি বাঁ পাশে দাঁড় করালো। বললো, "এখন নেমে দেখবার সময় নেই। বাঁ দিকের নিচে দেখো সুবর্ণরেখা। তোমার বাঁ দিকে, নদী বাঁক নিয়ে চলে গেছে মেদিনীপুরের দিকে। নদী পেরিয়ে বাঁ দিকে ফরেস্টের মধ্যে একটা বাংলো আছে। একেবারে উড়িষ্যার সীমানা ঘেঁষে, কিন্তু মেদিনীপুরের মধ্যে।" ও এঞ্জিন বন্ধ করেনি। আবার গাড়ি স্টার্ট করলো, "হ্যাঁ, তুমি কী বলেছিলে? এখন তুমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে চাও না? যেতে হবে না। সিমলিপাল ফরেস্টেই আমরা যাবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এবার দেখো, আমরা বঙ্গ ছেড়ে উড়িষ্যায় ঢুকেছি।"

ডাইনে বাঁয়ে অনেকগুলো ট্রাক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষৌণীশ গাড়ির গতি কমিয়ে, উড়িষ্যায় প্রবেশ করলো। ইন্দ্রাণী তখন গুনগুনিয়ে গান ধরেছে, "আবার মন মানে না-দিনরজনী / আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি…"



প্রায় দু বছর আগে ক্ষৌণীশের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর পরিচয় হয়েছিল। পরিচয়ের সেতু ছিল সুধাকর। ক্ষৌণীশ গিয়েছিল "প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসে"। স্টোরসে যেতো ও প্রায়ই। কিন্তু সুধাকরের সঙ্গে তার আগে কোনদিন দেখা হয়নি। ক্ষৌণীশ ছিল "প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোস"-এর নিয়মিত খদ্দের। স্টোর্স-এর খোদ প্রোপাইটার সুপ্রিয় রায় চৌধুরী ওর বিশেষ বন্ধুস্থানীয় লোক। রায়চৌধুরী ওর চেয়ে বয়সে দু চার বছর বড়। প্রথম পরিচয় সূত্রে দুজনেই দুজনের কাছে ছিলেন আপনি সম্বোধনের লোক। সুপ্রিয় রায়চৌধুরী কলকাতার প্রাচীন বনেদি পরিবারের সন্তান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কলকাতায় তাঁদের এখনও আছে বিস্তর অস্থাবর সম্পত্তি। অবিশ্যি সম্পত্তি কোনোকালেই নিষ্কণ্টক হয় না। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বাড়ে। দাবি দাওয়া নিয়ে শুরু হয় নানান বিবাদ বিসম্বাদ। আর তা দাঁড়ায় গিয়ে কোর্ট কাছারি পর্যন্ত। রায়চৌধুরী পরিবারের সেই সব অশুভ ব্যাপার থেকে মুক্ত ছিল না। তবে এইসব নানান জটিলতার মধ্যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কোর্ট কাছারি মামলায় সর্বস্বান্ত হওয়ার চেয়ে, আপসে মিটিয়ে চলার পক্ষপাতী।

সুপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রথম জীবনে ভালোভাবে বি এ পাশ করে, লণ্ডনে গিযেছিলেন আইন পড়তে। তিন বছর সেখানে থেকে, যাকে বলে ব্যারিস্টার, তাই হয়ে তিনি ফিরে এলেন। তবে যেরকম প্রতাপশালী আইনজীবী হবার আশা ছিল, তা তিনি হতে পারেননি। আইন পড়তে গিয়ে, ব্যবসাটাই তাঁর মস্তিষ্কে জেঁকে বসেছিল। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে কলকাতার ব্যবসা-এলাকায়, ঐরকম জায়গায় জমি পড়ে থাকার কথা না। ছিলও না। ভাগ্যক্রমে জমিটা লিজ দেওয়া ছিল নিরানব্বুই বছরের শর্তে। এক ইংরেজ কোম্পানি সেখানে সামনের দিকে দোতলা বড় বাড়ি করে ব্যবসা শুরু করেছিল। তাদের ছিল প্রধানত দর্জি কারখানা, লাইব্রেরি আর স্টেশনারি শপ। সুপ্রিয় রায়চৌধুরী তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেতে সেই লিজ দলিল বের করেছিলেন। দেখেছিলেন, কেল্লা ফতে। ইংরেজ কোম্পানি ব্যাবসা গুটিয়ে ঐ বাড়ি, পেছনের জমি ও আলাদা একটি বাড়ি এক মাড়োয়ারিকে হস্তান্তরিত করে চলে গিয়েছিল। সুপ্রিয় দেখেছিলেন লিজ দলিলে স্পষ্ট লেখা ছিল, ঐ জমি বা জমির ওপরে যে-কোন ঘর বাড়ি যা কিছু, কোম্পানি অপরকে হস্তান্তরিত করতে পারবে না। সেটা ছিল এক নম্বর, দ্বিতীয়ত পরিষ্কার লেখা ছিল, লিজ শেষ হয়ে যাবার পরে, জমির

ওপরে তোলা বাড়ি-ঘর ভাঙা চলতে পারে, অথবা ন্যায্য মূল্যে জমির মালিক কিনতে পারে।

এতোখানি জেনেও, ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে মারোয়াড়িরা কিনলেন কেমন করে? সুপ্রিয় যখন সম্পত্তিটির দিকে নজর দিয়েছিলেন, তখন লিজের মেয়াদ শেষ হতে বাকি ছিল মাত্র আট বছর। কিন্তু তাঁর পক্ষে আট বছর অপেক্ষা করার সময় বা ধৈর্য কোনোটাই ছিল না। তিনি তখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। সুবিধা করতে পারছিলেন না। একটাই মাত্র লাভ হয়েছিল, হাইকোর্ট পাড়ার ডাকসাইটে আইনজীবিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মারোয়াড়ি ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে খুব সহজে সম্পত্তিটি আদায় করা যায়নি। চার বছর সময় লেগেছিল। সেই জমিতেই, পুরনো বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছিল 'প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স।'

এই একটি বিষয়ের সার্থকতায় সুপ্রিয় রায়চৌধুরী পিতৃপিতামহের দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন। কিছু সম্পত্তি তাঁর ছিলই। সেসব তাঁর বংশানুগত। কিন্তু প্রাচীন পরিবারের পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটলে অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। সেইভাবেই তিনি পেয়েছিলেন কিছু আদ্যিকালের পুরনো বাড়ি আর টুকরো জমির সন্ধান। জনসংখ্যার বিস্ফোরণে কলকাতায় বহুতল গৃহের উৎপাত শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে ক্ষৌণীশের পরিচয়। মধ্য কলকাতা, বেহালা আর আলিপুরে সন্ধান মিলেছিল, অন্তত তিনটি সম্পত্তির। নতুন আলিপুরের গজিয়ে ওঠা তথাকথিত অভিজাত এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল একটি পতনোন্মুখ একতলা বাড়ি। তার গোটা চৌহদ্দি ছিল প্রায় এগারো কাঠা। পুরনো বাড়িটার খোলা চত্বরে থাকতো কিছু রিকশা আর ঠ্যালা গাড়ি।

সুপ্রিয়র প্রথম নজরে পড়েছিল আলিপুরের বাড়ি জমির ওপরে। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, তাঁদেরই এক জ্ঞাতি, যাকে বলে তালে গোলে, সেই বাড়িটি নিজের দখলেই কেবল রাখেননি। ভাড়া তো আদায় করেছিলেনই এক মারোয়াড়ির কাছ থেকে। আগাম পঞ্চাশ হাজার টাকাও নিয়েছিলেন। সুপ্রিয়কে সেই জমি বাড়ি পেতেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের জ্ঞাতি মানুষটির কাছ থেকে যতো না বাধা এসেছিল, তার চেয়ে বেশি এসেছিল মারোয়াড়ি ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী শেষ পর্যায়ের লড়াইয়ে যখন হার মেনেছিলেন, তখন সুপ্রিয়র জ্ঞাতি ভদ্রলোকের জেলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বিনা সুদেতে পঞ্চাশ হাজার টাকা শোধ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুপ্রিয়। যেখানে জমির দামই এগারো লক্ষ টাকার ওপর, সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা শোধের দায়িত্ব নিতে পিছু হটবার কোনো কারণ ছিল না। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বিষয়টিকে ভগবানের মার হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যবসার কথাও ব্যক্ত করেছিলেন, জমিটির বিষয়ে। তাঁর প্ল্যানে ছিল সেই একতলা বাড়ি ভেঙে একটি বহুতল বাড়ি করবেন। মাড়োয়াড়ি ভদ্র-

লোক বুদ্ধিমান। তিনি সুপ্রিয়র সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁকে ফেরত দিতে হবে না। অন্তত তিন কামরার একটি ফ্ল্যাট যেন তিনি পান। অবিশ্যি টাকা তিনি আরও দেবেন। তবে তাঁকে অন্যান্য ক্রেতাদের চেয়ে বেশি সুবিধা দিতে হবে।

সুপ্রিয় রাজি হয়েছিলেন। প্রথম এই জমি বাড়ি কেন্দ্র করেই ক্ষোণীশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বাড়িটির ভাড়াটে তুলতে অসুবিধা তেমন হয়নি। কিছু নগদ টাকা দিতে হয়েছিল। ক্ষোণীশের করা আলিপুরের বহুতল বাড়ির নকশা দেখে সুপ্রিয় খুশি হয়েছিলেন। কেবল নকশা না। আটষট্টি ফ্ল্যাটের বারো-তলা বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল, চ্যাটার্জি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড ফার্ম।

আলিপুর দিয়ে শুরু। সুপ্রিয় ক্ষোণীশের কাজে খুবই খুশি ছিলেন। মধ্য কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল, এঁদো ডোবাসহ সাত কাঠার একটি জমি। তার ওপরে ছিল, পুরনো একটি দোতলা বাড়ি। তার আশেপাশে তখনই গজিয়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি বহুতল অট্টালিকা। সেখানেও বিনা যুদ্ধে সম্পত্তিটি পাওয়া যায়নি। সেই প্রথম সুপ্রিয় তাঁর পাশে পেয়েছিলেন ক্ষোণীশকে। ক্ষোণীশ কেবল স্থপতি আর গৃহ নির্মাণের কলাকৌশলী ছিল না। আইনগত পরামর্শ দেবার মতো কিছু বুদ্ধিও ওর ছিল। অতএব, সুপ্রিয়র প্রিয় পাত্র হতে বেশি দিন সময় লাগেনি। সুপ্রিয় হয়েছিলেন নাটুদা। এটাই তাঁর ডাক নাম। আর ক্ষোণীশ হয়েছিল 'তুমি'। সুপ্রিয় ক্ষোণীশকে এতোটাই আপন করে নিয়ে-ছিলেন, তাঁর গৃহে ছিল ক্ষোণীশের অবারিতদ্বার। ক্ষোণীশের স্ত্রী অমলও বাদ যায়নি। দুই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ জমে উঠেছিল।

আলিপুর আর মধ্য কলকাতা থেকেই, টাকার ঢল নেমেছিল। আলিপুরের বারোতলা গৃহ তৈরি হবার পরেই, চ্যাটার্জি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর অনেকের নজর পড়েছিল। তার আগেই কলকাতা, বম্বেতে ওর কাজ শুরু হয়েছিল! সেই সময়ে ক্ষোণীশের দিনগুলো কেটেছিল ঝড়ের বেগে। ঝড়ের বেগ যেমন ছিল, তার সঙ্গে টাকার প্লাবনও ছিল। ভাইপো অনীশ ছাড়াও, সৌভাগ্য-বশত ও পেয়েছিল কয়েকজন অল্পবয়সী আর্কিটেক্ট এঞ্জিনিয়ার। যাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল অনেকটা দাদা ভাইয়ের মতো। অবিশ্যি কাজের ক্ষেত্রে ঐসব সম্পর্কগুলো সব সময় ভালো ফল দেয় না। ক্ষোণীশ সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল।

সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর তৃতীয় জয় হয়েছিল বেহালার বাগান আর বাড়ি নিয়ে। আলিপুরের ও মধ্য কলকাতায় বহুতল বাড়ি হলেও, বেহালার বাগানে বহুতল বাড়ি করার মতো এলাকাটি ছিল অনুপযুক্ত। যদিও বাগান বাড়ি পুকুর শুদ্ধ প্রায় সাত বিঘার মতো জমি ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে খুব বেশি ভিতরে ছিল না, তবু সেখানে তখনও কেমন একটা গ্রাম্য চেহারা ছিল। সেই একই রকমে, সেই বাগান বাড়িও ভোগ করছিলেন এক জ্ঞাতি ভদ্রলোক। তখন তিনি সুপ্রিয়র

এলেম' সম্পর্কে বিশদ অবগত ছিলেন। অতএব, আদৌ লড়াইয়ে যান নি। কিন্তু এতোকাল যে বাগান বেহাত হতে না দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন, তার কি কোনো প্রতিদানই নেই ?

নিশ্চয়ই আছে। সুপ্রিয় কথাটা দেবার আগে ক্ষোণীশের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। ক্ষোণীশ তৎক্ষণাৎ ওর মতামত দিয়েছিল, জ্ঞাতি ভদ্রলোক প্রতিদান প্রত্যাশা করতেই পারেন। তা দেওয়াও উচিত। জ্ঞাতি ভদ্রলোক তেমন গরীব ছিলেন না। তিনি এক লক্ষ টাকা পেয়েই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু বাগানে তখন রীতিমতো ধান চাষ হচ্ছিল। সবজিও কিছু কম হচ্ছিল না। পুকুরটি ছিল বেশ বড়। মাছ থাকার কথা না। থাকলেও লুঠপাট হয়ে যেতো। যে-লোকটি বাগান দেখাশোনা করতো, বাগানের মালিক বলতে তাকেই বোঝাতো। নতুন মনিবকে সে সহজে মেনে নেয়নি। বাগানের আম জাম নারকেল সুপারি, এবং অন্যান্য ফলের গাছের তদারকি করার ভার ছিল তার ওপর। সব মিলিয়ে তার আয় কম ছিল না। সামান্য একজন চৌকিদার বা কেয়ারটেকার হিসাবে, তার ভোগ ছিল ভালো। বাগানে উৎপন্ন ফসল, সবজি ফল, সব কিছুতেই ছিল তার হাত। সুপ্রিয় তার ভোগের গ্রাসে মূর্তিমান বাধার মতো দাঁড়িয়েছিল।

লোকটির নাম ছিল কান্তি রায়। রায় এমন একটি পদবী, তার হাল হদিসের তল পাওয়া কঠিন। সুপ্রিয় ঠাণ্ডা মাথায় মধ্যবয়স্ক কান্তির সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করেছিল। বাগানের আসল একতলা বাড়িটির চাবি থাকতো তার কাছেই। আর সেই বাড়ির পেছন দিকেই সে মাটির দেওয়াল, টালির চালের পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকতো সপরিবারে। কান্তির মস্ত ঘোমটা ঢাকা বউয়ের প্রতি মা ষষ্ঠীর কৃপা ছিল অগাধ। সেই কৃপার সূত্রে, কনিষ্ঠতমটি নিয়ে সাত সন্তানের জনক। সুপ্রিয়র পক্ষে কোনোকালেই কান্তির সাতটি সন্তানের মধ্যে ক'টি পুত্র, কটি কন্যা, বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। একমাত্র তার একুশ বাইশ বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে চোখে না পড়ে উপায় ছিল না। আর একটি সতেরো আঠারো বছরের ছেলেকে চোখে পড়েছিল। কান্তির চেয়ে তার ছেলেরই পাড়ায় সমধিক পরিচিতি ছিল। বই খাতা কলমের সঙ্গে তাদের কোনোকালে সম্পর্ক ঘটেছিল কি না, বোঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু গায়ে গতরে তারা বেশ শক্ত সমর্থ ছিল। পাড়ায় তাদের দৌরাত্ম্যও কম ছিল না। কান্তির সেই কার্তিক গণেশকে পাড়ার সবাই সবিশেষ মান্য করে চলতো। কান্তিও দুই পুত্রের প্রতি নির্ভরশীল ছিল। আসলে তাদের নাম কার্তিক বা গণেশ ছিল না। বাপের বাহন হিসাবে যোগ্য পুত্র ছিল। ছেলে দুটি তখনই বেকার ছিল। বাগানের ওপর তারাও খবরদারি করতো।

সুপ্রিয় ক্ষোণীশের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। কান্তি সুপ্রিয়র সঙ্গে প্রথম ব্যবহারে দু চার দিন তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করে থাকলেও ঘরের চাবি খুলে দিতে আপত্তি করেনি। আগের মনিবের চেয়ে সুপ্রিয় যে জাঁদরেল, সেটাও বুঝেছিল, যখন দেখেছিল, স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ তাঁর অতিথি হয়ে, বাগান-

বাড়িতে এসেছেন, খাওয়া দাওয়া করেছেন। একটি বসবার ঘর ছাড়া, বাড়িতে ছিল একটি শোবার ঘর। শোবার ঘর সংলগ্ন বাথরুম। সুপ্রিয়র জ্ঞাতি ভদ্রলোক বাড়িটিকে ব্যবহারযোগ্য রেখেছিলেন। কিন্তু একটা পরিত্যক্ত আলমারি খুলে কিছু আঁশটে গন্ধওয়ালা বস্তু পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুগুলো আর কিছু না। রঙিন কিছু পর্নোগ্রাফির ছবি, ঐ জাতীয় কিছু ইংরেজি পত্রিকা। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষের ব্যবহারের কিছু সামগ্রী। সেগুলো কতোটা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য, অথবা রোগ ভয়ের জন্য, তা অবিশ্যি বোঝা সম্ভব ছিল না। মেয়েদের ব্যবহারের নাইলনের প্যান্টি, ব্রা আর কিছু প্রসাধন দ্রব্য। ওগুলোর যিনি মালিক, সেই জ্ঞাতি ভদ্রলোকের বোধহয় খেয়ালই হয়নি। সুপ্রিয় তাঁকে কাকা বলে ডাকেন। তাড়াহুড়োয়, আলমারি খালাস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুপ্রিয় আলমারিটি সাফ করেছিলেন।

থানার বড়বাবুকে দেখে, কান্তি, তার ছেলেরা, এবং পাড়ার লোকেরাও সচেতন হয়েছিল। সুপ্রিয় হাতের তাসটি ভালোই ফেলেছিলেন। অফিসার ইনচার্জ শুধু নয়, থানার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ভালো রেখেছিলেন। কান্তি ক্রমে আরও বশংবদ হয়েছিল। ক্ষৌণীশের সঙ্গে পরামর্শ করে, কান্তির বড় ছেলেটিকে কাজ দিয়েছিলেন তাঁর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সে। পরের ছেলেটিকে চাকরি দিয়েছিল ক্ষৌণীশ, ওর এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে। কান্তির আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। সুপ্রিয় নতুন মালি লাগিয়েছিলেন বাগানে। পুকুরের মজা অংশ কেটে পরিষ্কার করে, পানা মুক্ত করে, মাছ ছেড়েছিলেন। এসবের পরামর্শদাতা ছিল ক্ষৌণীশ। পুরনো বাড়ি রেখে, লাগোয়া একটি দোতলা বাড়ি তোলা হয়েছিল। যে-বাগান বাড়ি ছিল আগে নিতান্তই এক ব্যক্তির গোপন লালসা মেটানো আর কিছু আয়ের জায়গা, তাই হয়ে উঠেছিল, নিত্য নতুন আত্মীয় বন্ধুদের আগমনের স্থান। খাওয়া দাওয়া উৎসব স্থল। রাত্রিবাস। কান্তির দায়িত্ব বেড়েছিল। সেই হিসাবে মাইনেও। সে সুখী ছিল। সুপ্রিয়র কাছে কৃতজ্ঞ ছিল।

বাগানে আগের বাড়ির লাগোয়া দোতলার পরামর্শ আর প্ল্যান দিয়েছিল ক্ষৌণীশ। ও বলেই দিয়েছিল "দেখুন নাটুদা আপনার এ বাগান এমন কিছু ভেতর দিকে নয়। পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এ এলাকার চেহারা পালটাতে আরম্ভ করবে। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সিন্ধি আর মাড়োয়ারি কিছু ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই আশেপাশে জমির খোঁজ খবর করছেন। আমরা যা অনুমান করি ওঁরা তা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারেন। ওঁরা গন্ধ পেয়েছেন, কলকাতা নগরের শরীর বাড়তে বাড়তে সব দিকে ছড়াচ্ছে। তার মধ্যে এসব ফাঁকায় নগরের শরীর বাড়বে অনেক তাড়াতাড়ি। একেবারে রাস্তার ওপর হলে আপনাকে আমি একটা সিনেমা হল করতে বলতাম। পাড়ার মধ্যে বলে, সিনেমা হলের কথায় লোকে আপত্তিও করবে। আপাতত বাগান বাড়িটাকে সরগরম রাখার চেষ্টা করাই ভালো। কেবল আমার একটা অনুরোধ। আপনার আত্মীয় বন্ধু যাঁরাই আসুন, তাঁরা সারাদিন রাত্রি থাকবেন, পান ভোজন করবেন,

কিন্তু তার একটা সীমা থাকা দরকার। পাড়ার মধ্যে বেশি হইচই করা ভালো নয়। আর প্রেমিক প্রেমিকাকে কখনোই এই বাগান বাড়ি আসতে দেবেন না। এমন কি আপনার নিজের কোনো অ্যাফেয়ার থাকলেও, এ বাগানকে ব্যবহার করবেন না। তার জন্য আপনার আলাদা ফ্ল্যাট আছে।"

সুপ্রিয় ক্ষৌণীশকে কাঁধে চাপড় মেরে হেসে বলেছিলেন, "বুঝেছি। তোমার বউদি আর ছেলেমেয়েদের ছাড়া অন্য কারোকে নিয়ে আমি বাগানে আসবো না। তা আসবোই বা কী করে। কান্তি ইতিমধ্যেই আমাকে বাবা বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। তারা ছেলে আমার আসল জায়গায় চাকরি করে। ইমেজ বলে একটা কথা আছে তো। কিন্তু তুমি ধরেই নিচ্ছো কেন, আমার জীবনে গোপন কিছু থাকতে পারে?"

ক্ষৌণীশ জানতো, সুপ্রিয় রায়চৌধুরী মানুষটি ভালো। তবে ভালোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক থাকলেই যে তাঁকে মন্দ বলতে হবে, এরকম কোনো শর্তে ক্ষৌণীশের বিশ্বাস ছিল না। মতিভ্রম ব্যাপারটি ভালো না। পুরুষ কোথাও দুর্বল হতেই পারে যেমন পাবে স্ত্রীও। তবে সুপ্রিয়র দুর্বলতা যেখানে, তাঁর পক্ষে ঐসব জায়গা ঠিক ছিল না। অভিজাতপল্লীর মধ্যে এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী গৃহস্থের ঘরে, দেহের ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসতে আরম্ভ করেছিল। ক্ষৌণীশ জানতো, সে-রকম দু একটি 'গৃহস্থ ফ্ল্যাটে' সুপ্রিয়র যাতায়াত আছে। ও জবাবে বলেছিল, "না থাকলে ভালো। থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না। তবে আপনার মতো লোকের পথে চলাফেরার বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত।'

সুপ্রিয় রায়চৌধুরী বুদ্ধিহীন ব্যক্তি ছিলেন না। ক্ষৌণীশের চোখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় কিছু একটা অনুমান করেই বলেছিলেন "ঝেড়ে কাশো না। কতোটুকু জানো সেটা আন্দাজ করতে দাও।"

"দেখুন নাটুদা-আসলে আমি নিজে লোকটি খাঁটি নই।" ক্ষৌণীশ হেসে বলেছিল, "যে-কারণে কলকাতার বিস্তর আবর্জনা জঙ্গলের খবর আমি জানি। আপনার যা অবস্থা তাতে আপনি অনায়াসেই নিজের একটি আস্তানা করতে পারেন। এমন জায়গায় আপনার যাওয়া উচিত নয়, যেখানে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হতে পারে।"

সুপ্রিয় ভ্রূকুটি তীক্ষ্ম চোখে ক্ষৌণীশের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সত্যি করে বলো তো, কথাটা তুমি কার কাছে শুনেছো?"

"আমার এক ইস্পাত ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে।" ক্ষৌণীশ গোপন না করে অকপটে স্বীকার করেছিল, "আপনি যে মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটে যান, সে-কথা আমি শুনেছি। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মিসেস চাকলাদার যতোই ধড়িবাজ মহিলা হোন, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তাঁর সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ ঘটেছে। পুলিশের দয়ার ওপরেই তাঁর এমন রমরমা ব্যবসা। কিন্তু পুলিশ কী বস্তু তা আপনি আমার চেয়ে কম জানেন না।

আপনাকে যদি একদিন ফাঁদ পেতে ধরার ব্যবস্থা করে, সম্মান বাঁচবার জন্য, এক ঘায়ে কতো টাকা বেরিয়ে যাবে, আপনি এখনই হিসেব করতে পারবেন না। তা ছাড়া, গায়ে একটা দাগ লেগে থাকবে।"

সুপ্রিয়র চোখে মুখে রীতিমতো উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল, "বলো কী হে ক্ষৌণীশ! তা হলে তো ইতিমধ্যে আমার নাম পুলিশের খাতায় উঠে গেছে?"

"নিশ্চয় উঠেছে।" ক্ষৌণীশ মাথা ঝাঁকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলেছিল, "মিসেস চাকলাদারের হাতে আপনার মতো দামী শিকার কটা আছে? আমার ধারণা একটিও নেই। মহিলার সংগ্রহে যতো সুন্দরী আর রূপসী মেয়েই থাক, আপনি কেন ওসব ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থাকবেন?"

সুপ্রিয় তাঁর স্টোর্সের ঠাণ্ডা ঘরের ঘুরন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, ক্ষৌণীশের হাত ধরে উঠে দাঁড় করিয়েছিলেন। জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকে। বলেছিলেন, "ক্ষৌণীশ, তুমি একটা লোককে পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে মরার মুখ থেকে বাঁচালে। আমার লোভ আমার চিন্তা বুদ্ধি ভাবনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আমি অন্ধের মতো চলছিলুম। খবরের কাগজে এতো খালি কুঠি বেশ্যালয় সম্পর্কের খবর পড়ি, অথচ মিসেস চাকলাদারের বাড়ির ব্যাপারে কথাটা কখনো মনে আসেনি। সেখানেও যে পুলিশ রেইড করতে পারে, একবারও ভাবিনি। বরং ভেবেছিলুম, ঐরকম ভদ্র ফ্ল্যাটে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। মিসেস চাকলদারের সঙ্গে যে পুলিশের যোগাযোগ থাকতে পারে, সে-কথাটাই আমার কল্পনায়ও ছিল না। অথচ আমি নিজে জানি, কলকাতার পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। জানি নে, তুমি আমার সম্পর্কে কতোটা জানো—"

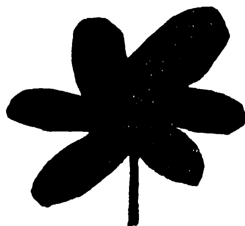
"দেখবেন নাটুদা, এমন ধরে নেবেন না। পরের হাঁড়ির খোঁজ করে বেড়ানো আমার কাজ।" ক্ষৌণীশ হেসে বলেছিল, "কাজ আমার অনেক। সেটা আপনিও জানেন। পুরুষ আর স্বামী হিসেবে আমি খুব খাঁটি বিশ্বস্ত, তেমন দাবি করিনে। কখন যে কী ঘটে যায় তার সব কার্যকারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনে। আমার ইস্পাত ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে একবার মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটে আমিও গেছিলাম। আমার ইস্পাত ব্যবসায়ী বন্ধু খুব গর্বের সঙ্গে বলেছিল, জানো প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের মালিক এস রায়চৌধুরী পর্যন্ত এখানে আসেন। কথাটা শোনার পর থেকেই আপনাকে বলবার সুযোগ খুঁজেছি। মিসেস চালকদারের ফ্ল্যাটে যারা যায়, তাদের কাছে একটা গল্প করার বিষয়। আপনার মতো লোকও সেখানে যায়।"

সুপ্রিয় ক্ষৌণীশের দুহাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "ক্ষৌণীশ, তুমি আমাকে বাঁচালে। আর জীবনে কোনো দিন ওমুখো হবো না। মিসেস চাকলাদারের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই, আমি সেখানে যাই। আজ থেকে চিরকালের জন্য বন্ধ। আমি জানি মিসেস চাকলাদার আমাকে সহজে ছাড়বেন না। কিন্তু তুমি আমাকে ঠিক সময়ে সাবধান করেছো। ঐ স্ত্রীলোকটি

আমাকে কোনোরকম ফাঁদে ফেলতে পারবে না। পারতো যদি তুমি আজ আমাকে কথাটা না বলতে। সত্যি ভোগের বাসনা মানুষকে কতোটা অন্ধ করে দিতে পারে। বুদ্ধি বিবেচনা আত্মসম্মানবোধও মানুষ হারিয়ে ফেলে। ক্ষৌণীশ তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলুম ভাই।"

কথাগুলো মনে হলে ক্ষৌণীশ নিজেকে করুণা করে মনে মনে হাসে। সুপ্রিয় রায়চৌধুরি নিশ্চয়ই ক্ষৌণীশের চেয়ে ধনবান ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের শ্রেণীগত চরিত্রে মিল ছিল। সুপ্রিয় রায়চৌধুরির চেয়ে ক্ষৌণীশ কোনো অংশেই চরিত্রবান ছিল না। তবে ওর একটাই মানসিক দ্বন্দ্ব। সেটা হলো দেহ ক্রয় এবং নির্বিচার ভোগ। সুপ্রিয় রায়চৌধুরি অনেক দূরে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। মিসেস চাকলাদার 'গৃহস্থ মহিলা' আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তা আর সম্ভব হয়নি। এবং সে ভেবেছিল, সুপ্রিয়কে পুলিশই হয়তো সাবধান করে দিয়েছিল।

সুপ্রিয় রায়চৌধুরি কি তারপরে বেলকাঠ ব্রহ্মচারী হয়ে গিয়েছিলেন? আদৌ না। বয়স হয়েছিল বটে। কিন্তু একেবারে সবকিছু ত্যাগ করতে পারেননি। স্থান এবং পাত্রী বদল হয়েছিল। এবং অবিশ্যিই সমস্ত ব্যাপারটি ছিল একটা সীমার মধ্যে।



ক্ষৌণীশ প্রাচী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সে গেলেই ইন্দ্রাণীকে দেখতে পেতো। স্টোর্সে ক্ষৌণীশের যথেষ্ট খাতির ছিল। সবাই জানতো ক্ষৌণীশ চাটুয্যে রায়চৌধুরির কেবল প্রিয়পাত্র না। রায়চৌধুরি পরিবারে ওর যাতায়াত ছিল। সুপ্রিয় রায়চৌধুরির স্ত্রী মমতা হলেন স্টোর্সের একজন ডিরেক্টর। মমতা রায়-চৌধুরি ক্ষৌণীশের বউদি। ক্ষৌণীশ যখন স্টোর্সে যেতো, প্রথম দিকে ছিল সাধারণ একজন খরিদ্দার। তারপরে যখন ওর আর্কিটেক্ট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে সুপ্রিয়র যোগ হয়েছিল তখন থেকেই অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করেছিল। সুপ্রিয় বলেই দিয়েছিল, ক্ষৌণীশ সোজা ঢুকবে খোদ ডিরেক্টারের চেম্বারে। তার জন্য কারোকে কৈফিয়ৎ দেবার দরকার ছিল না। জবাবদিহিও না। অতএব স্টোর্সের সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারির কাছে ক্ষৌণীশের সম্মান ছিল আলাদা। আর সকলেই

জানতো, ক্ষৌণীশের সাহায্যেই প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের কর্তা সুপ্রিয় রায়চৌধুরি কেমন করে বহুতল বাড়ির ব্যবসা করেছিলেন।

ক্ষৌণীশ প্রথম যখন স্টোর্সে কেনাকাটা করতে গিয়েছিল, তখন ম্যানেজারেস ইন্দ্রানী মিত্র ছিল না। ওর নিয়মিত যাবার মাস তিনেক পরে ইন্দ্রাণীর চাকরি হয়েছিল। সুপ্রিয়র সঙ্গে তখন সবেমাত্র ক্ষৌণীশের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রানীকে দেখেছিল। মুগ্ধ বলতে যা বোঝায়, তা হয়নি। দেখে ভালো লেগেছিল। যেমন আরও দশটা মেয়েকে এক পলক দেখলে ভালো লাগে, সেইরকম। কিন্তু এমন কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না যে, ইন্দ্রানীর সঙ্গে যেচে আলাপ করবে। তাছাড়া ঐ সময়ে সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে কাজে বিশেষ ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। তখনও ক্ষৌণীশকে সুপ্রিয় নাম ধরে ডাকতেন না। সম্পর্কও তেমন নিবিড় হয়নি। হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। তার মধ্যেই ক্ষৌণীশ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "মিঃ রায়চৌধুরি আপনার স্টোর্সে তো একজন ম্যানেজার ভদ্রলোক আছেন, আবার একজন মহিলা ম্যানেজার এসেছেন দেখছি।"

"আর বলবেন না ভাই।" সুপ্রিয় খানিকটা হতাশ হেসে বলেছিলেন, "মেয়েটি আমার স্ত্রী মমতার বান্ধবীর মেয়ে। নাম ওর ইন্দ্রানী। কলকাতার কায়েত মিত্তিরদের বাড়ির মেয়ে। অনেকটা আমাদের রায়চৌধুরিদের মতোই, নামে ডাকে গগন ফাটে, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। সেইরকম মিত্তিরদেরও অবস্থা। বংশবৃদ্ধি আর ভাগ হতে হতে যাকে বলে ক্ষয়িষ্ণু, তাই ওদের অবস্থা। মেধা বিদ্যেয় আগে যতোটা নাম ধাম ছিল, এখন তাও নেই। পুরনো দিনের নাম ভাঙিয়ে যতো দিন চলে। ইন্দ্রানী মেয়েটি বুদ্ধিমতী। কইয়ে বলিয়েও আছে। ভেতরটাও একান্ত ফাঁপড়া ভুষি নয়। বিদ্যে আছে পেটে এবং মগজেও। পেটে বিদ্যে বলতে বোঝায়, যারা অন্নের দায়ে বিদ্যেকে কাজে লাগায়। স্টোর্স যেভাবে বেড়েছে, একজন বিশ্বাসী মেয়ে অফিসার আমাদের দরকার ছিল। মেয়েরা আছে কোনো কোনো ডিপার্টমেণ্টে। কিন্তু সকলের দিকে নজর রাখার জন্য একজন দরকার ছিল। তা বলে আমি ইন্দ্রানীর মতো বয়েসের মেয়ের কথা একেবারেই ভাবিনি। আমাদের দরকার ছিল আরও অভিজ্ঞ, বয়স্কা মহিলা। বয়স্কা বলতে বৃদ্ধা নয়। শেষ পর্যন্ত মমতা ধরে পড়লো আমাকে। আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলুম। কিন্তু টিকলো না। দেখা যাক, কেমন করে।"

ক্ষৌণীশের সঙ্গে সুপ্রিয়র সম্পর্কটা ক্রমে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, ওকে আর বিভাগে বিভাগে ঘুরে সওদা করতে হতো না, ম্যানেজার অনিল দাসকে ডেকে পাঠাতেন নিজের চেম্বারে। ক্ষৌণীশ কাগজে প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিমাণ আর তালিকা লিখে দিতো। সুপ্রিয়র চেম্বারেই ওর সব দ্রব্য প্যাকেটে ঝোলায় চলে আসতো। পেমেণ্ট হতো সেখানে বসেই। আর কফি বা স্ন্যাক্স দিয়ে আপ্যায়ন করতেন স্বয়ং সুপ্রিয়। কখনও কখনও বড় হোটেলের বারেও

ক্ষৌণীশকে নিয়ে যেতেন। নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতেও। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ব্যবধান কমে এসেছিল। সুপ্রিয় আস্তে আস্তে ক্ষৌণীশকে প্রকৃতই ভাই ও বন্ধুর মতো গ্রহণ ও বিশ্বাস করেছিলেন। অবিশ্যি তার কারণও ছিল। ক্ষৌণীশের কাছে তাঁর সম্পদ অর্থের বিষয়েই কেবল অকপট হন নি। তাঁর জীবনের অত্যন্ত গোপন বিষয়ও ক্ষৌণীশ অবগত ছিল।

ক্ষৌণীশ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে, বারো থেকে পনেরো বছর ও কোনো দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পায় নি। চিন্তা ভাবনাকে স্থির রেখে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ও ওর নকশার বিশাল টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এক টানা বারো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করেছে। ওর কাজ দেখে তরুণ এঞ্জিনিয়াররা অবাক মেনেছে। প্রেরণাও পেয়েছে। স্ত্রী অমলা অফিসে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে। ক্ষৌণীশকে খাওয়ার জন্য তাগাদা দিয়েছে। কাজ শেষ না করে ক্ষৌণীশ মাথা তোলে নি। কেবল টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকেই ওর দিন কাটে নি। ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ভারতের নানা প্রান্তে। বিশেষ করে বম্বে ও ব্যাঙালোরে। দু জায়গাতেই ওর অফিস আছে। বম্বে ও ব্যাঙালোরের অফিসে ও কোনো বাঙালিকে কাজে রাখে নি। ওর অবর্তমানে বম্বে অফিসের প্রধান সুরেন্দ্র পাটিল। ব্যাঙালোর অফিসে বীরভদ্র রাও। বয়সে দু জনেই তরুণ। দুজনেই এঞ্জিনিয়ার। আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা কথাটাকে লোকে ভালো মনে নিতে চায় না। কারণ শব্দটির সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে, একটা এমন অর্থ, ইংরেজিতে যাকে বলে এ্যামবিশন। ক্ষৌণীশ কোনো কালে ভেবে পায় নি, জীবনের ক্ষেত্রে এ্যামবিশন থাকাটা দোষের কী? উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা মানেই যেন উগ্র স্বার্থপরতা বোঝায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিম্নগামী করে গিয়েছেন পুরাণের লেখকরা। এমনকি ইংল্যাণ্ডের মহাকবি শেক্সপীয়রও তার থেকে বাদ যান না। এ্যামবিশন শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের লোভ স্বার্থপরতা আর মাৎসর্য। অথচ যে-মানুষের মনে কোনো উচ্চাশা না থাকে, সে জীবনে দাঁড়াবে কেমন করে? উচ্চাশা বা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লোভ স্বার্থপরতার কোনো সম্পর্ক নেই। ক্ষৌণীশ ওর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা যাচাই করেছে। অসদুপায় অবলম্বন না করেও নিজের মেধা, শিক্ষা কর্তব্য আর শ্রম দিয়ে, যথাযথ উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করলে, তার একটা ফল পাওয়া যায়। দৈব পুরুষাকার কথাগুলো ও শুনেছে। জানে জ্যোতিষীর কথাও। ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অবকাশ যাপন হলো জ্যোতিষী চর্চা। তার বক্তব্য, "দেখ, তোমার সম্পর্কে আমি যা-ই ভবিষ্যদ্বাণী করি না কেন, মনে রেখো, কর্মফলই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। কর্মকে তুমি পুরস্কার বলতে পারো। কিন্তু আমি তোমাকে কোনোদিন হীরে জহরত মনিমুক্তা পাথর ধারণ করতে বলবো না। ওটা একটা সান্ত্বনা। কোনো জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গেই আমি বিতর্কে যাবো না। তোমার কাজে উদাম

থাকবে না, অথচ কেন তোমার ব্যবসায়ে উন্নতি হচ্ছে না, এর জবাব কোনো জ্যোতিষীই দিতে পারবেন না। তিনি যদি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তা হলে তোমাকে একটি হীরে ধারণ করিয়ে, টোটকা দাওয়াই বাতলাতে পারেন। বলতে পারেন, কোনো গ্রহ আপনার মধ্যে আলস্যের সৃষ্টি করছে। কোনো অশুভ গ্রহ আপনাকে কাজে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু শুভ গ্রহ এসে সেই আলস্য আর বাধা দূর কারার জন্য লড়ছে। আপনি জীবন ধারণে নিয়মিত হোন। কারণ, কোষ্ঠিতে দেখছি, জতেকের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলেও, তা প্রয়োগ হচ্ছে না। কাজে মনোযোগ দিয়ে অগ্রসর হোন, দেখবেন, আপনার শুভ গ্রহ ফলদায়ক হচ্ছে।"

ক্ষৌণীশ ওর জ্যোতিষী বন্ধুর কথাকে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। জীবন ধারণে নিয়মিত হবে। কাজে উদ্যম নিয়ে লেগে থাকতে হবে। দৈবযোগে যদি ভালো মন্দ কিছু ঘটেও, সেটাকে জীবনের অনিবার্য বিষয় বলেই, মেনে নিতে হবে। মৃত্যুকে যেমন জয় করা কোনোকালেই এই মরণশীল গ্রহে সম্ভব হবে না, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুর্ভোগ থেকেও মানুষের মুক্তি নেই। যেমন বর্তমান বিশ্বের মানুষের মুক্তি নেই মারণাস্ত্রের আশঙ্কা থেকে।

ক্ষৌণীশ ওর পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও রমণীসঙ্গ যদি 'পদস্খলন' বলে গণ্য হয় তা হলে ওর জীবনে তা বার কয়েক ঘটেছে। কিন্তু সেই সব কোনো ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। ঘটনাগুলোকে প্রেম আখ্যাও দেওয়া যাবে না। বম্বের যে-বিবাহিতা মহিলা ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, সেখানে ওর নিজের কোনো উদ্যোগ ছিল না। মহিলার সঙ্গে কিছু দিন মেলামেশার পরেই, সুরেন্দ্র পাটিল ওকে স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল, "স্যার, আপনি যদি ঐ বাঙালি মহিলার সঙ্গে বেশি মাখামাখি করেন, তা হলে আমাদের ফার্মের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। বম্বের বাঙালি থেকে কোনো মহলই মহিলাকে ভালো চোখে দেখেন না। আমাকে মাপ করবেন স্যার, সকলেই জানে, মহিলা বহুভোগ্যা। তিনি একজন স্বেচ্ছাচারিণী ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর সংস্পর্শকে সবাই অশুভ বলে মনে করে।"

ক্ষৌণীশের এমন কোনো অবস্থা হয় নি, মহিলাকে ত্যাগ করতে পারবে না। প্রথমত যাকে বলে ইনভলবমেণ্ট, তা আদৌ ওর মনে স্থান পায় নি। অতএব প্রেম বলে কিছু ছিল না। উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সখ্যতা ছিল। সে-সখ্যতার মধ্যে দৈহিক বিষয়টিও ছিল। ক্ষৌণীশ যখন অনুমান করতে শুরু করেছিল, মহিলা ওর ওপর অন্যায়ভাবে ভর করে নিজের বিশেষ কাজ গুছিয়ে নেবার সুযোগে আছেন, সুরেন্দ্র পাটিল সাবধান করেছিল তখনই। ও সাবধান হয়েছিল। যাকে বলে বলিদান, সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল সেই ভাবেই। ওর নিজের জগত পরিবেশ আর শ্রেণীগত চরিত্রের দিক থেকে, বলতে হয়, ও অটল চরিত্রের পুরুষ। মহিলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে ওর মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিমর্ষতা জাগে নি।

বম্বের আর একটি গুজরাতি পরিবারের অত্যন্ত গুণী আর্কিটেকট মেয়ের সঙ্গেও ওর ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি এগিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ওর কাজের মধ্য দিয়েই। কোটিপতি ভোরা পরিবারের সেই মেয়েটি ছিল একমাত্র সন্তান। সে ক্ষেত্রে ক্ষৌণীশের নিজের উদ্যোগকে অস্বীকার করা যায় না। মেয়েটিকে ওর ভালো লেগেছিল। রূপ তার তেমন ছিল না। এমন কি, স্বাস্থ্যও ছিল না তেমন একটা উজ্জ্বল। ঐ মেয়েটির ক্ষেত্রে তার গুণ, বিনীত কোমল স্বভাব ক্ষৌণীশকে আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটির বাবা মা ওকে ব্রাহ্মণ জেনে, রীতিমত্যো ভক্তি করতেন। মেয়েটি নিজেই ক্ষৌণীশের ইচ্ছামতো নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ওদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে, বম্বের বিশেষ করে পার্সি সমাজে গুঞ্জন উঠেছিল। মেয়েটি পার্সি ছিল না। অথচ পার্সি পরিবার থেকে মেয়েটিকে বধূ করবার একটা প্রয়াস ছিল। ভোরাদের পরিবার হিন্দু হলেও, তাদের চালচলনে পার্সি প্রভাব এসেছিল কোনো ভাবে। ক্ষৌণীশ যখন আবিষ্কার করেছিল, মেয়েটির বাবা মা'র প্রত্যাশা, ও তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করবে, তখনই থমকে গিয়েছিল, ও মেয়েটিকে ওর বিবাহিত জীবনের সব কথা খুলে বলেছিল। মেয়েটি করুণ হেসেছিল। ক্ষৌণীশকে পরিষ্কার বলেছিল, "আমি তোমার জীবনের কোথাও কোনো রকম বাধা স্বরূপ দাঁড়াবো না। বলবো না, তুমি আমাকে বিয়ে কর। কোনো পুরুষের মিস্ট্রেস হয়ে থাকার মতো রুচি শিক্ষা চরিত্র কোনোটাই আমার নেই। কেবল একটি কথা মনে রেখো, আমাকে নিয়ে কখনো ভয় পেও না। আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেনো। মনে রেখো সেইভাবেই। আমি তোমার সঙ্গে কাজ করে সুখী হয়েছি। তোমাকে মনে রাখবো চিরকাল।"

অতএব, মিস ভোরা ওর জীবনে কোনো উপদ্রবই ঘটায় নি। বরং ওর সততা আর সত্যি কথায় মনটা বিমর্ষই হয়েছিল। কিন্তু কাজের তোড়ে সে সব কোনো কিছুই স্থায়ী হতে পারে নি। ক্ষৌণীশের জীবনের তৃতীয় ঘটনা মহীশূরের কুর্গ লেফট্যাণ্টে কর্নেলের মেয়ে মনোরমার সঙ্গে। বিলেতে থাকা-কালীন, ও পশ্চিম য়ুরোপের সব দেশগুলোই মোটামুটি বেড়িয়ে দেখেছিল। দেখেছিল সেই সব দেশের সব বয়সের রমণী পুরুষ। স্থান ভেদে পাত্র পাত্রীরাও ছিল নানা রকমের ও রূপের। কখনও কোনো তরুণী মেয়েকে দেখে যে মুগ্ধ হয়নি, এমন না। মুগ্ধ হবার মতো সুন্দর তরুণ তরুণী কিছু দেখেছিল। কিন্তু ভারতের কুর্গ কন্যার কাছে সে সব ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

মনোরমা ছিল সাড়ে পাঁচ ফুটের কিঞ্চিদধিক দীর্ঘ। উজ্জ্বল সোনার মতো রঙ বলতে যেমন বোঝায় তেমনি ছিল ওর গাত্র বর্ণ। মনে হয়েছিল সমস্ত শরীরটি সোনা দিয়ে তিল তিল করে তৈরি করা। বাঙলার পটে যে আকর্ণবিস্তৃত দুর্গা প্রতিমার ছবি, মনোরমাকে দেখে মনে হয়েছিল, ও তেমনি মহিষমর্দিনী। ক্ষৌণীশ মনে মনে বলেছিল, ইতর ভাষায় যদি মনোরমার রূপের বিষয়ে এক কথায় বলতে হয়, তবে সেই শব্দটি হবে চাবুক! কোথায় লাগে বিশ্বসুন্দরী।

মনোরমার বয়স সম্ভবত তখন ছিল, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে। অবিবাহিতা। ক্ষৌণীশের বিস্মিত মুগ্ধ চোখ ফেরাতে দেরি হয়েছিল। ফেরাতে দেরি হয়েছিল বটেই। ফিরিয়ে নিতে গিয়ে উড়ন্ত ভ্রমরের মতো চোখের তারা দুটো সব সময়েই মনোরমার সেই অপরূপ মূর্তির দিকে গিয়ে পড়েছিল। মনোরমাও তা লক্ষ্য করেছিল। ওর মুখে বারে বারে রক্তের ছটা লেগেছিল। মুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি একরকম। কামুক-পুরুষের দৃষ্টি ভিন্ন। মেয়েরা তা বুঝতে পারে তাদের নারী-প্রকৃতি দিয়ে। মনোরমাও ক্ষৌণীশের মুগ্ধ দৃষ্টিতে, ওর নিজেকে আরতি হতে দেখেছিল।

ক্ষৌণীশের এক মক্কেলের গৃহে কুর্গ লেফট্যানেন্ট কর্নেল ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেখানে পানের আসর জমেছিল ভালো। লেঃ কর্নেল সাহেব জবরদস্ত সুরাপায়ী ছিলেন। তিনি দেখতে ছিলেন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের বৃষস্কন্ধ সুপুরুষ মূর্তি। যাঁর চেহারায় যোদ্ধা ও আভিজাত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। ঘটনাচক্রে লেঃ কর্নেল ও তাঁর মেয়েকে ক্ষৌণীশের সঙ্গেই, এক গাড়িতে ব্যাঙালোর যেতে হয়েছিল। কুর্গ বাবা মেয়ে দুজনকেই ক্ষৌণীশের বিনীত অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল। লেঃ কর্নেল তাঁর কন্যাকে নিয়ে, ক্ষৌণীশেরই অতিথি হয়েছিলেন। কোনো অসত্যই এর মধ্যে নেই, ঐ সময়টায় ও কাজে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মনোরমা নামটা বাঙালির কানে সেকেলে লাগে। কিন্তু মনোরমা লেখাপড়া শিখেছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ক্ষৌণীশ প্রতিটি মুহূর্তে মনোরমাকে চক্ষে হারাচ্ছিল। মনোরমা তা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছিল। ক্ষৌণীশের মুগ্ধতায় আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল। এবং মনোরমা বোধহয় নিজেও জানতো না, ক্রমাগতই ক্ষৌণীশের আবেগের সীমায় পা বাড়াচ্ছিল।

লেঃ কর্নেলের ব্যাঙালোরের কাজ মিটে গিয়েছিল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর এক আত্মীয় এসে মনোরমাকে মাইশোর নিয়ে যাবে। তিনি দিল্লি হয়ে ফিরে যাবেন তাঁর কাজের স্থান আম্বালায়। কিন্তু আত্মীয়টি সময় মতো আসেননি। তাঁর কোনো খবরও ছিল না। অতএব মনোরমাকে যখন একলা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, ক্ষৌণীশ লেঃ কর্নেলের কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিল. তাঁর আপত্তি না থাকলে ক্ষৌণীশ নিজেই মনোরমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। লেঃ কর্নেল খুশি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং নিশ্চিন্তেই দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন। সেইদিনই ক্ষৌণীশ নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে মনোরমাকে নিয়ে মাইশোর রওনা হয়েছিল।

ব্যাঙালোর থেকে ক্ষৌণীশ মনোরমাকে নিয়ে মহীশূর যায় নি। মনোরমার গন্তব্য ছিল, ব্যাঙালোরের পশ্চিমে কুর্গ-এর মারকারার নিকটবর্তী গ্রামে। দূরবর্তী পথ ছিল বন্ধুর ও সুন্দর। মাঝে মাঝে অরণ্য ছিল ছায়ায় নিবিড়। যে-অরণ্যে চন্দন বৃক্ষরা ছিল তাদের আপন মহিমায়। আর মনোরমা ওর রমণী মহিমায় ও দৃষ্টিতে আবেগ প্রকাশ করেছিল। লজ্জা গোপন করতে পারে

নি। ক্ষৌণীশ নিরালা অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মনোরমার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। মনোরমা সে হাত নিজের হাতে নিয়েছিল। সে হাতে নিজের মুখ রেখেছিল। ক্ষৌণীশ ওকে একবার বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। কপালে ও ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে ওকে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত ও সুখী করেছিল। কিন্তু তারপরেই মনোরমার জিজ্ঞাসা ছিল, ক্ষৌণীশের মত গুণী ব্যক্তি সামান্য মনোরমার মধ্যে এমন কী পেয়েছেন যে চোখ ফেরাতে পারছেন না। আর আমাকেও খুন করেছেন।

ক্ষৌণীশ জবাব দিয়েছিল, "মনোরমা আমি পুরুষ। তবে মানুষ। এছাড়া তোমার কাছে আমার আর কোনো পরিচয় নেই। আমি পৃথিবীর সেই আদিম পুরুষ, যে চিরকাল রূপের আরতি করে এসেছে। তুমি তোমার বাবা মায়ের কন্যা। কিন্তু আমার চোখে তুমি বিশ্ব নিয়ন্তার এক অপরূপ সৃষ্টি।"

মনোরমার দু চোখে লজ্জা সুখ আবেগ ফুটেছিল। রমণী পুরুষের যে-উক্তিতে চিরকাল মুগ্ধ হয়েছে, ক্ষৌণীশ সে-কথাই শুনিয়েছিল মনোরমাকে। মনোরমা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এ যুগের সেই পুরনো স্বাধীন রাজ্য কুর্গ-এর মেয়ে হলেও, ও বড় হয়েছিল রক্ষণশীল পরিবারে। কিন্তু পরিবারের মধ্যে নারীর স্বাধীনতাও ছিল অনেকখানি। মনোরমা পুরুষের মুগ্ধতা বলতে বুঝতো, সব শেষের কথা বিবাহ। ক্ষৌণীশ গোড়া থেকেই মনোরমাকে অবহিত রেখেছিল, ও বিবাহিত। দুই সন্তানের জনক। মনোরমার কাছে সেটা প্রথম দিকে বাধা মনে হয় নি।

মনোরমার সঙ্গে পরিচয়ের পর, দেখা গিয়েছিল, ক্ষৌণীশের ব্যাঙালোরের কাজ বেড়ে গিয়েছিল। আসলে কাজ বাড়ে নি। ওর যাতায়াত বেড়েছিল। ব্যাঙালোরে পৌঁছেই ওর দৌড়েছিল কুর্গে। বীরভদ্র রাও প্রথম দিকে বিষয়টি সঠিক ধরতে পারেনি। ভেবেছিল স্যার হঠাৎ এত ঘন ঘন ব্যাঙালোরে আসছেন কেন? কাজ বেড়েছে কোথায়? বলেন মাইশোর যাচ্ছেন। মাইশোরে কাজ তো ছিল মাত্র একটাই। বীরভদ্র নিজেই তা দেখাশোনা করছিল। আর তার কাছে সংবাদ ছিল, মিঃ চ্যাটার্জি মাইশোর দু ঘণ্টার বেশি থাকেন না। তিনি কুর্গে যান। কুর্গে কেন? নতুন কোনো কাজ? কুর্গেরও পরিবর্তন হচ্ছিল, কিন্তু সেরকম কোনো বড়ো পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয় নি। অথচ খ্যাতনামা স্থপতি মিঃ কে চ্যাটার্জি ঘন ঘন কুর্গে যাচ্ছিলেন।

ক্ষৌণীশ বুঝতে পারছিল না, ওর কুর্গের ঢল নামা স্রোতের অবসান কোন্ দিক থেকে আসতে পারে। মনোরমা ধরেই নিয়েছিল, ক্ষৌণীশ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, ওকে বিয়ে করবে। এমন কি, স্ত্রীকে ত্যাগ না করলেও, মনোরমার আপত্তি ছিল না। ও ছিল অজটিল, সারল্যের প্রতিমা। ক্ষৌণীশও একরকম স্থির করেই নিয়েছিল, মনোরমার বাবার আপত্তি না থাকলে, ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে। কিন্তু মনোরমার বাবা লেঃ কর্নেল নিজেই ক্ষৌণীশ মানারমার বিষয়ের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি ক্ষৌণীশকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন।

খোলাখুলি কিছু না লিখেও, বেশ স্পষ্টভাবেই ক্ষৌণীশকে তাঁর মনের কথা জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "আমি একজন পুরুষ। আপনিও একজন পুরুষ। আপনার অবস্থা আমার না বোঝার কোনো কারণ নেই। আমি একজন পিতা। আপনি একজন পিতা। আমাদের উভয়েরই স্ত্রীরা বেঁচে আছেন। আমি আমার সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের চোখে নিজেকে খাটো করতে পারবো না। মনোরমাকে আপনি আশীর্বাদ করবেন, ও যেন সুখী হয়। আপনি এ পত্র প্রাপ্তির পর আর কুর্গে গিয়ে মনোরমার সঙ্গে দেখা না করলে, আমি নিশ্চিন্ত ও সুখী হবো।"

মনোরমা পর্ব এখানেই ইতি হয়েছিল। ক্ষৌণীশের মনে একটা ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল, মনোরমা একটা কিছু ঘটিয়ে বসবে কি না। প্রায় ছ মাস বাদে মনোরমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিল। আরো ছ মাস পরে ব্যাঙালোরে অফিসে বসে লেঃ কর্নেলের নিজের মুখে সংবাদ শুনেছিল, তাঁর একমাত্র বিবাহিত কন্যা তার স্বামীর বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। কুর্গের সেই বৃষস্কন্ধ সুপুরুষ লেঃ কর্নেলের স্বরে কোনো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু পিতার চোখ দুটি জলে ভিজে উঠেছিল।

ক্ষৌণীশ মনোরমার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করেছিল। কথাটা ও কারোকে প্রকাশ করে বলতে পারে নি। ও গোঁফ দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আরও বেশি করে। গৃহে অমল কিছুই বুঝতে না পারলেও, স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। ঐরকম কর্মব্যস্ত অথচ বৈরাগ্যের অবস্থা ছিল প্রায় দশ মাস। ক্ষৌণীশ খুব বেশি পাগলামি করেনি। ওর এক দুরন্ত বন্ধুপত্নী হঠাৎ ওর চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছিল। মৃতের আত্মা দেখতে পায় কি না, ওর জানা ছিল না। ও যেদিন সেলুনে গিয়ে গোঁফ দাড়ি কামিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন যদি মনোরমার আত্মা ওকে দেখে থাকে, তবে নিশ্চয়ই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে, বাঁকা ঠোঁটে হেসেছিল।

প্রাচী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের কর্মচারিরা সকলেই ক্ষৌণীশকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করে চলতো। কারণ, ও ছিল খোদ মালিকের স্নেহভাজন ভ্রাতৃতুল্য ও বন্ধুর মতো। সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর বাড়ির সঙ্গেও ক্ষৌণীশের সম্পর্ক আত্মীয়ের মতো। ওর স্ত্রী অমলও প্রায়ই রায়চৌধুরীদের বাড়ি বেড়াতে যেতো। স্টোর্সের ম্যানেজারেস্ তরুণী ইন্দ্রানীকে ও দূর থেকেই দেখেছে। দুজনের পরিচয় ঘটবার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

ক্ষৌণীশ স্টোর্সে রোজ যেতো না। না গেলেও টেলিফোনে সুপ্রিয়র সঙ্গে কথা হতো। টেলিফোনেই ঠিক হতো, সন্ধ্যারাত্রিটা কোথায় কাটানো হবে। ক্ষৌণীশের বাড়িতেও মাঝে মধ্যে বন্ধু, বন্ধু-পত্নীদের রাত্রে আড্ডা জমতো। আড্ডার জায়গা অনেক ছিল। তা ছাড়া নানা দিনে নানা জায়গায় পার্টির অভাব ছিল না। ক্ষৌণীশের চ্যাটার্জি আর্কিটেকট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড রীতিমতো বড় আর বিশ্বস্ত সংস্থা হয়ে উঠেছিল। কলকাতা,

বম্বে, ব্যাঙালোরে রাজ্য সরকারের প্রসন্ন দৃষ্টিও, ওর ফার্মের ওপর পড়েছিল। সেই বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে, ক্ষৌণীশের ব্যক্তি জীবনও সমাজের নানান স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু একটা বিষয় ওকে ভাবতেই হয়েছিল। ফার্মকে যদৃচ্ছা বাড়তে দিলে, সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। ভরাডুবির সম্ভাবনাও ছিল। ভাইপো অনীশ ছাড়াও, অন্যান্য বেতনভোগী এঞ্জিনিয়ার কর্মচারিদের সহায়তা পেলেও, কখন কোন দিকে হঠাৎ ফার্ম বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, সে-বিষয়েও ওকে ভাবতে হতো।

ক্ষৌণীশ বাইরে ছুটোছুটির কাজ কমিয়ে দিয়েছিল। দায়িত্ব দিয়েছিল ওর বিশ্বস্ত তরুণ কর্মীদের ওপর। তবে সব কিছু লক্ষ্য রাখতো। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কেও সব সময়ই সচেতন ছিল। এরকম অবস্থাতেই ও একদিন স্টোর্সে ঢোকবার মুখে সুধাকর ওর সামনে পড়েছিল। দুজনেই অবাক আর খুশি! সুধাকরই প্রথম বলেছিল, "স্টোর্সের সকলের মুখেই তোমার নাম শুনি। তুমি নাকি স্টোর্সের কর্তা রায়চৌধুরীর ঘরের মানুষ। আমি ভাবতাম, তুমি আমাদের সেই ক্ষৌণীশ চাটুয্যে নাকি? কারণ সবাই বলে, ক্ষৌণীশ চাটুয্যে আর্কিটেকট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ার।"

ক্ষৌণীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি এই স্টোর্সে প্রায়ই আসো নাকি?"

"তা আসি। তবে তোমার মতো খোদ কর্তার ঘরে আমি যাইনে। ভদ্রলোকের সঙ্গে অ[illegible] বিস্তর আলাপ পরিচয় আছে।" সুধাকর বলেছিল, "এখানকার অধিকাংশ কর্মচারির সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। সকলেই চেনেন। অফিস থেকে বেরিয়ে এখানকার কফি বারে প্রায়ই ঢুঁ দিয়ে যাই।"

ক্ষৌণীশ বলেছিল, "চলো, সুপ্রিয়দার ঘরে যাই।"

"মাফ করো ভাই ক্ষৌণীশ।" সুধাকর হেসে মাথা নেড়েছিল, "মালিকের ঘরে আমি যাবো না। তুমি যাও। তবে তার আগে অ[illegible]র সঙ্গে এক কাপ কফি খেলে খুশি হবো। অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো।"

ক্ষৌণীশ আপত্তি করেনি। সুধাকরের সঙ্গে কফি বারে গিয়েছিল। ক্যাশ কাউন্টারের এক পাশে ইন্দ্রানী দাঁড়িয়েছিল। সুধাকরের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, কিন্তু ওর চোখে ছিল উৎসুক কৌতূহল। সুধাকর ডেকেছিল, "কফি বারে আসবে নাকি ইন্দ্রানী?"

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রানীর দিকে সেই প্রথম চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিল। ইন্দ্রানীর লজ্জা-নম্র হাসি মুখ আর অনতিদীর্ঘ উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের লাবণ্যময়ী চেহারা দেখে ভালো লেগেছিল। ইন্দ্রানী কিছু জবাব দেবার আগেই সুধাকর বলে উঠেছিল, "সরি। তুমি নিশ্চয় এ ভদ্রলোককে তোমাদের স্টোর্সে দেখেছো। আমার কলেজের বন্ধু ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি।" সে ক্ষৌণীশের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রানীর পরিচয় দিয়েছিল, "মিস ইন্দ্রানী মিত্র। এই স্টোর্সের ম্যানেজারেস।"

"ওঁকে আমরা সবাই চিনি।" ইন্দ্রানী দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার

করে হেসে বলেছিল, "উনি আমাদের চেনেন না। অবশ্য আমাদের চেনবার কথাও নয়।"

ক্ষৌণীশও দুহাত তুলে নমস্কার করে হেসেছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র কাছে যে ও ইন্দ্রানীর পরিচয় পেয়েছিল, সে-কথা বলেনি। ইন্দ্রানীর চেহারা দেখে ও খুশি হলেও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ইন্দ্রানী সুধাকরকে. বলেছিল, "মিঃ চ্যাটার্জি তো আমাদের ডিরেক্টরের ঘরে যাবেন।"

"না। মিঃ চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে কফি বারে বসবে।" সুধাকর বলেছিল, "আমার ওসব কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গ বিশেষ ভালো লাগে না। ক্ষৌণীশ অবিশ্যি আমাকে ওর সুপ্রিয়দার ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।"

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রানী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল! ইন্দ্রানী বলেছিল, "আপনারা গিয়ে বসুন, আমি এদিকটা একটু দেখে যাচ্ছি।"

ক্ষৌণীশ সুধাকরের সঙ্গে কফিবারে গিয়ে ঢুকেছিল। কর্মচারিরা সবাই অবাক হয়ে ঘটনাটি দেখেছিল। তারা কোনো দিন ক্ষৌণীশকে কফিবারে ঢুকতে দেখে নি। খোদ কর্তার সঙ্গে পরিচয়ের আগে কেনাকাটা করতে দেখেছে। দুই বন্ধু একটা খালি টেবিলের সামনে গিয়ে বসেছিল। পুরনো দিনের কথা উঠেছিল। নানান কৌতুককর ঘটনা বলতে বলতে দুজনেই খুব উপভোগ করেছিল। দশ মিনিট পরেই এসেছিল ইন্দ্রানী। বসেছিল সুধাকরের পাশের চেয়ারে। বলেছিল, "সুধাকরবাবু, আপনাদের দুই বন্ধুতে বোধহয় অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে। আজ আমাকে না ডাকলেই পারতেন। আপনাদের –"

"ভবছো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবো না।" সুধাকর হেসে বলেছিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমাদের পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে কোনো অসুবিধে হবে না।"

ক্ষৌণীশ বলেছিল, "পুরনো দিনের কথা, পুরনোই হয়ে গেছে। বরং সুধাকর নতুন কিছু শোনাও।"

"আমার তো নতুন কিছু শোনাবার নেই ভাই।" সুধাকর হেসে বলেছিল, "দেখতে পাচ্ছো, পরিবর্তনের মধ্যে আমার মাথার টাক বেড়েই চলেছে। তা ছাড়া আর নতুন কোনো খবর নেই।"

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রানী শব্দ করে হেসে উঠেছিল। ক্ষৌণীশ বলেছিল, "সুধাকর, তুমি কথাটা মিথ্যে বলো নি। টাক বৃদ্ধি ছাড়া তোমার কথাবার্তা আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।"

"কিন্তু তোমার ঘটেছে।" সুধাকর কালো কফির কাপে চুমুক দিয়েছিল, "কলেজের সেই টিঙটিঙে রোগা ছেলেটি আর নেই। বিলেতের জল খেয়েছো বেশ কিছুকাল। অন্য জলের প্রভাবও পড়েছে তোমার চেহারায়। অবিশ্যি অন্য কারণও আছে। চ্যাটার্জি আর্কিটেকট অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিংএর বৃহস্পতির দশা স্থায়ী হয়েছে। তোমার পরিশ্রম সার্থক। একটা কিছু দাঁড় করাবার

যোগ্যতা তোমার আছে। আমি যে-অলস সে-অলসই আছি। ভালোই আছি। সেই হিসেবে জ্যোতিষী না জেনেও বলতে পারি, তোমার দায় দায়িত্ব টেনশন আছে। আমি হচ্ছি সত্যিকারের টেনশন ফ্রি-মানুষ।"

ক্ষৌণীশ হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "কথাটা ভুল বলো নি। বুঝতে পারিনে, আমি কাজের পেছনে ছুটছি, না কাজ আমাকে তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু ফার্মকে আমি আর বাড়াতে চাইনে।"

"হ্যাঁ, অনেক তো করলে। এবার একটু স্থির হয়ে বসো।" সুধাকর বলেছিল, "কাজ করা ভালো। কিন্তু সেটাকে নেশা করে তোলা ঠিক নয়। স্ত্রী পুত্র কন্যা সংসার ঠিক মতো দেখছো তো ?"

ক্ষৌণীশ হেসে ইন্দ্রানীর দিকে একবার দেখেছিল "সংসার যখন পেতেছি তখন দেখতে তো নিশ্চয়ই হয়। তবে অমল নিজেই সংসারের দায়িত্ব বহন করে, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া আর দেখ্‌ভালের দায়িত্বও ওর। সে সব ব্যাপারে ওর কোনো খুঁত নেই।"

"তা হলে এখন বেশ গুড বয় হয়ে গেছো।"

"ব্যাড বয় কবে ছিলুম যে গুড বয় হবো ?"

"ব্যাড বয় তুমি কোনো কালেই ছিলে না।" সুধাকর কৌতুক হেসে বলেছিল, "তবে তোমাকে আমরা একটু নটি বয় বলেই জানতুম। সেই দুষ্টুমি যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ক্ষৌণীশ চাটুয্যের অধঃপতন হয়েছে বলতে হবে।"

ক্ষৌণীশ হেসে আবার ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়েছিল, ও লক্ষ্য করেছিল, ইন্দ্রানী ওর মুখ থেকে একবারও মুখ ফেরায় নি। আর, ওরই বা কেন ইন্দ্রানীকে দেখে, মনের গভীরে একটা চমক লাগছিল, বুঝতে পারছিল না। হেসে বলেছিল, "সুধাকর, একজন মহিলার সামনে আমাকে বেইজ্জত করতে চাইছো ?"

"বেইজ্জত !" সুধাকর ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আমি তো দেখছি, ইন্দ্রানী এখানে এসে বসা ইস্তক, ক্ষৌণীশ চাটুয্যের দিক থেকে ওর প্রাণকাড়া নজর সরাতে পারছে না। তুমি যে কীরকম ক্ষতিহীন দুষ্টু ছেলে, সেটাও সহজেই ধরা পড়ে যাচ্ছে।"

ইন্দ্রানীর মুখে রক্তের ছটা লেগেছিল। এবং আশ্চর্য ! ও সুধাকরের কথার প্রতিবাদ করে নি। বরং চোখ নামাতে বাধ্য হয়েছিল। বলেছিল, "দুষ্টুমিটা কী ব্যাপার, তা বুঝতে পারলাম না।"

"দুষ্টুমিটা ওর প্রকৃতিগত।" সুধাকর মোটা লেন্সের আড়ালে, চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে হেসেছিল, "ওর দুষ্টুমিটা ওর চোখে মুখে চেহারাতেই আছে। তার রিফ্লেকশন দেখছি তোমার চোখে মুখেও। দেখে অবাক হইনি মোটে। ক্ষৌণীশ হলো সেই জাতের পুরুষ, যাকে দেখলে মেয়েরা আপনিই ঘনিষ্ঠ হতে চায়।"

ইন্দ্রানী যেন প্রতিবাদ করবে বলেই মুখ তুলে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষোণীশের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু মাথা নেড়ে হেসেছিল। মুখ নত করেছিল। তখন ক্ষোণীশেরই দায় ছিল ইন্দ্রানীকে উদ্ধার করার। ও একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলেছিল, "সুধাকর, তোমার কোনো কথাটাই সত্যি নয়। আমার বিষয়ে যা বললে, তা যেমন সত্যি না, সত্যি না তেমনি মিস মিত্র সম্পর্কে তোমার মন্তব্য। একজন সদ্য পরিচিত লোকের সামনে কেন তুমি ওকে বিব্রত করছো?"

"ইন্দ্রানী আমার বন্ধু।" সুধাকর ইন্দ্রানীর নত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলেছিল, "একটু হয়তো ওকে বেকায়দায় ফেলেছি, কিন্তু ও আমার ওপর চটবে না।"

ইন্দ্রানী মুখ তুলেছিল। ওর রক্তচ্ছটা মুখে সলজ্জ হাসি ছিল, "আপনার মুখে কোনো কথা আটকায় না। তবে আপনার বন্ধু যে কথাটা সিরিয়াসলি নেন নি তাতেই রক্ষে।"

সুধাকর আর ঘাঁটায় নি। কিন্তু ক্ষোণীশ কি ইন্দ্রানীর চোখের উৎসুক অনুসন্ধিৎসা দেখে নি? ক্ষোণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে যে ইন্দ্রানীর চোখে মুখে একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছিল সেটা মিথ্যে না। আর ওর নিজেরই বা কি ঘটেছিল। ওর মস্তিষ্কের কোন্ সুদূর কোণে যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। কেন? ইন্দ্রানীর চেহারা চোখে মুখে কী ছিল? কফি পানের পর ইন্দ্রানীকে উঠতে হয়েছিল। তখনও অফিস করছিল। কাজ ছিল অনেক। ক্ষোণীশকে বলেছিল, "হয়তো আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে আরও অনেকবার। কিন্তু কথা হবে না।"

"কেন? সুধাকর অবাক চোখে ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমাদের পরিচয় হলো, অথচ কথা হবে না, তার কারণ কী?"

ইন্দ্রানী হেসে জবাব দিতে গিয়ে ক্ষোণীশকে দেখে নিয়েছিল, "উনি আসেন আমাদের বস্-এর কাছে। আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের সঙ্গে…"

"মিস মিত্র, আপনি না জেনে আমার ওপর অবিচার করছেন।" ক্ষোণীশ বাধা দিয়ে বলেছিল, "কারোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মতো মানুষ আমি নই। আমি সেই জাতের মানুষ যে অনায়াসে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে। কোনো কারণেই দরজা বন্ধ রাখাটা আমার স্বভাবে নেই। আপনার মতো তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে যেখানেই দেখা হোক, আপনি কথা না বললেও আমার মতো তুচ্ছ মানুষ কথা বলবে।"

সুধাকর হেসে বলেছিল, "ক্ষোণীশের এই স্বীকারোক্তিটা একশো ভাগ সত্যি। যতোদূর জানি, দরজাটা বন্ধ রাখেনি বলে, বিস্তর বেনোজলের উৎপাত ওকে সহ্য করতে হয়েছে। এখনো হয় কি না জানিনে। তা বলে ইন্দ্রানীকে আমি বেনোজলের দলে ফেলতে চাই নে। আজ আমার আর একটা প্রস্তাবও ছিল…" কথা শেষ না করে সে ইন্দ্রানী আর ক্ষোণীশের দিকে একবার

দেখেছিল। বলেছিল, "আমার প্রস্তাবটা এই, ক্ষোণীশর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হলো। নিতান্ত কফি গিলে আজকের সন্ধ্যাটা শেষ করতে চাই নে। তোমার যদি তেমন কাজ না থাকে, চলো একটু ক্লাবে গিয়ে বসবো।"

ক্ষোণীশ বলেছিল, "প্রস্তাবটা আমারই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমার ঐ বুড়ো অভিজাতদের ক্লাবে আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করে না। আমি নিজেও ঐ ক্লাবের মেমবার। পারতপক্ষে যাইনে। সুপ্রিয়দার জন্য মাঝে মধ্যে যেতে হয়। ক্লাবটার একটি সম্পদ তার সবুজ লন। ছুটির দিনের শীতের সকালে বেলা এগারোটা থেকে বারোটা কাটানো যায়। গরমের সন্ধ্যাও উপভোগ্য। তার চেয়ে, একটু দূরে একেবারে সবুজের মাঝখানে চলো যাই। সেই ক্লাবটা বেশি ভালো লাগবে হয় তো।"

"কথাটা মন্দ বলো নি।" সুধাকর বলেছিল, "জানো টেকো সুধাকর একটি মাত্র ক্লাবেরই মেমবার। সে-কথাটা মিথ্যে নয়। তুমি যে-ক্লাবের কথা বলছো, সেখানে কয়েকবার গেছি। উত্তম প্রস্তাব। ইন্দ্রানী যাবে তো?"

ইন্দ্রানীর ডাগর কালো চোখে দ্যুতি ফুটেছিল। বলেছিল, "পা বাড়িয়েই আছি, কেবল…"

"তোমার বাড়ি পেঁছুনোর সমস্যা।" সুধাকর হাত তুলে অভয়দান করে বলেছিল, "আমি তোমাকে অনেক দিন তোমার বাড়ি পেঁছে দিয়েছি। আজও দেবো। আর যদি ক্ষোণীশ সে-দায়িত্ব নেয়. তা হলেই বোধহয় তুমি বেশি খুশি হবে।"

ইন্দ্রানী তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলেছিল, "না না, ওঁকে কেন কষ্ট দেবো?"

"কষ্ট পাবো এটা ধরে নিচ্ছেন কেন?" ক্ষোণীশ ইন্দ্রানীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কলকাতার বাইরে থাকেন নাকি? তাতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। গাড়ি আমি চালাবো না। ড্রাইভার আছে।"

সুধাকর ইন্দ্রানীর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, "যাও, ম্যানে-জারেস, তাড়াতাড়ি তোমার কাজের পাট মেটাও। আমার কিছু সামান্য কেনা-কাটা আছে, সেরে নিই।"

"আমিও একবার সুপ্রিয়দার সঙ্গে দেখা করি।" ক্ষোণীশ উঠে দাঁড়িয়েছিল, "উনি নিশ্চয় শুনেছেন, আমি স্টেটসে এসেছি।"

ইন্দ্রানী বলেছিল, "মিঃ চ্যাটার্জি, ডিরেক্টরের কাছে যেন আজকের প্রোগ্রামের কথা বলবেন না। বললেও আমার নাম বলবেন না।"

ক্ষোণীশ হেসে বলেছিল, "কোনো কথাই বলবো না। সুপ্রিয়দা হয় তো আমাকে নিয়ে কোথাও যাবার কথা বলবেন। আমি কোনো অজুহাত দেখিয়ে ওকে আজ পাশ কাটাবো।"

সমস্যা দেখা দিয়েছিল দুটো গাড়ি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল, ক্ষোণীশের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার ক্লাবে চলে যাবে। সুধাকরের গাড়িতে যাবে সবাই। স্বভাবতই ইন্দ্রানী বলেছিল, সুধাকর আর ক্ষোণীশ সামনে বসবে।

ও একলা পেছনে বসবে। সুধাকর ভ্রূকুটি চোখে ঠোঁটের কোণে হেসে ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "তোমার এতো শুচিবায়ুর কথা তো জানতুম না। যদি তিনজনেই সামনে না বসি, তা হলে তুমি পেছনে একলা বসবে কেন? ক্ষৌণীশও তোমার সঙ্গে পেছনেই বসবে।

"ভালোই জানেন, আমার ওসব কোনো বায়ু নেই।" ইন্দ্রানী বলেছিল, "তিনজন গাদাগাদি করে সামনে বসলে, মিঃ চ্যাটার্জি'র অসুবিধে হবে ভেবেই কথাটা বলেছি।"

সুধাকর জিজ্ঞাসু চোখে ক্ষৌণীশের দিকে তাকিয়েছিল। ক্ষৌণীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে বলেছিল, "মিস মিত্রর অসুবিধে না হলে আমার কোনো অসুবিধে নেই।"

প্রথম দিনের পরিচয়েই ক্ষৌণীশ ইন্দ্রানী অপরিচয়ের আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রানী একটি ব্র্যান্ডি মেরিতেই তৃপ্ত ছিল। প্রথম দক্ষিণের সেই ক্লাবটিতে গিয়ে ও খুশিও হয়েছিল। ক্ষৌণীশকে জানিয়ে রেখেছিল, ঐরকম মনোরম জায়গায় ভবিষ্যতে যেতে পারলে ওর ভালো লাগবে। ক্ষৌণীশ বলেছিল, "ব্যাপারটা তো তেমন হাতিঘোড়া কিছু নয়। এ অধমকে একটু স্মরণ করবেন। তেমন কাজের চাপ না থাকলে নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে এখানে আসবো।"

"কী ভাবে স্মরণ করবো? ইন্দ্রানী ওর চোখের তারা ঘুরিয়েছিল, "সুধাকরবাবুর মারফৎ?"

সুধাকর নিজেই মাথা নেড়ে বলেছিল, "আমার মারফৎ কেন? পরিচয়টা ঘটেছে আমার দ্বারাই। কিন্তু এর পর দুজনের যোগাযোগ করতে আমার কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। তোমরা যখন যেখানে খুশি নিজেরা দেখা সাক্ষাৎ করতে পারো। ক্ষৌণীশের কাছে যেতে হলে আমি নিজেই যাবো।"

ক্ষৌণীশ ওর বড় ব্যাগ খুলে, একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল, ইন্দ্রানীর দিকে, "এ কার্ডেই আমার সব হদিশ আছে। ফোন করবেন।"

ইন্দ্রানী কার্ড নিয়েছিল। চোখ বুলিয়ে অস্বস্তির সুরে বলেছিল, "এ যে দেখছি, আধ ডজন টেলিফোন নাম্বার রয়েছে। সব গুলোতে খোঁজ করতে হলে তো আপনাকে পাওয়াই দায় হবে।"

ক্ষৌণীশ তখন বিশেষ দুটি নাম্বারের উল্লেখ করে বলেছিল, "ঐ দুটোর যে-কোনো একটাতে আপনি আমাকে পাবেন। তবে আমাকে প্রায়ই বাইরে বেরোতে হয়। দুচার ঘণ্টার জন্যে না পেলে, বিরক্ত হয়ে আশা ছেড়ে দেবেন না।"

"ধৈর্য হারিও না।" সুধাকর হেসে বলেছিল, "সবুরে মেওয়া ফলে।"

প্রথম দিন পরিচয়ের পর্বে, ইন্দ্রানী সুধাকরের গাড়িতে বাড়ি ফিরেছিল। ক্ষৌণীশের অন্যমনস্কতা কাটেনি। ইন্দ্রানীকে দেখার পর থেকেই, ওর মনে একটা অন্ধকার পর্দা বারে বারে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু সেই অন্ধকারের পর্দা

সরিয়ে, কিছুই বেরিয়ে আসেনি। তারপরে প্রায় এক সপ্তাহ বাদে ও যখন প্রাচী ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে গিয়েছিল, ইন্দ্রানীকে ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে চমকে উঠেছিল। সেইরকম দীর্ঘাঙ্গী না হলেও, মনে হয়েছিল, সেই কুর্গে'র কন্যা মনোরমাকে ও দেখছে! বুঝতে পেরেছিল, ইন্দ্রানীকে দেখার পর থেকেই কেন ওর ভিতরে একটা অন্ধকার পর্দা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। ওর চোখের ওপর থেকে সেই অন্ধকার পর্দা সরিয়ে, ইন্দ্রানী নতুন চেহারায় দেখা দিয়েছিল। ও সুপ্রিয়র ঘরে যাবার আগে ইন্দ্রানীর নমস্কারের জবাবে নমস্কার করেছিল, "আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করেন নি ?"

ইন্দ্রানী সলজ্জ হেসে বলেছিল, "ইচ্ছে থাকলেও ভরসা করতে পারিনি। ভেবেছি, আপনি ভাববেন মেয়েটা নির্লজ্জ।"

"ফোন করেই সেটা টেস্ট করতে পারতেন।" ক্ষৌণীশ ওর নতুন আবিষ্কারে ইন্দ্রানীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিল।

ইন্দ্রানী স্টোর্সের সকলের জিজ্ঞাসু কৌতূহলিত দৃষ্টির সামনে ক্ষৌণীশের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করেছিল। কেবল বলেছিল, "আগামীকাল তো শনিবার। আমি বিকেলে ফ্রি আছি। কিন্তু আপনি হয় তো ব্যস্ত থাকবেন।"

"থাকবো না। আপনি কী ভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ?" ক্ষৌণীশের চোখে মুখে মুগ্ধতার সঙ্গে নতুন উৎসাহের ঝলক লেগেছিল, "আপনাকে কি আমি এখান থেকেই তুলবো ?"

ইন্দ্রানী চকিতে একবার আশেপাশে চোখের কোণে দেখে নিয়ে বলেছিল, "না, না, আপনি এখানে আসবেন না। আপনার অফিস তো কাছেই। বিকেল চারটেয় আমি সেখানেই যাবো।"

"ভুলবেন না যেন।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রানীর অস্বস্তির কারণটা বুঝে, আর দাঁড়ায়নি। সুপ্রিয়র ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

ক্ষৌণীশের পরে মনে হয়েছিল, মনোরমার সঙ্গে ইন্দ্রানীর মিলের চেয়ে অমিলটাই হয় তো বেশি। তবু কোথায় একটা সাদৃশ্য ছিল। ক্ষৌণীশের সেই দুর্বল জায়গাতেই ইন্দ্রানী ওর আসন পেতেছিল।



সেই সূচনা পর্ব দিয়ে, আজ দু বছর হতে চললো, ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রানীর সম্পর্ক নিয়ে ওদের পরিচিত পরিবেশে নানান প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে প্রায় বছর খানেক। একটা বছর কেটেছিল কিছুটা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবেই। 'কিছুটা'

এই কারণে, পরিচিত পরিবেশ আর সমাজের সর্পিল কপালে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা দেখা দিতে সময় লাগে। বিবাহিতা স্ত্রীর যে ইন্দ্রিয়টি সবচেয়ে বেশি সজাগ আর সংবেদনশীল, সেটির অলক্ষ্যে থাকে তার স্বামী। অন্তত অমলের মতো স্ত্রীর পক্ষে এ কথাটা একশো ভাগ সত্যি। ক্ষোণীশ ভেবেছিল, স্বামী হিসেবে ও যে অবিশ্বাসী, অমল তা কোনো দিন জানতে পারেনি। অনেক বুদ্ধিমান পুরুষও এক্ষেত্রে যেমন নির্বোধের মতো ভেবে থাকে, ক্ষোণীশ তাদের থেকে আলাদা না। ইন্দ্রানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগেও, ওর জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছে অমল তার স্ত্রীর স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় দিয়ে, অনেকখানিই অনুমান করতে পারতো। কিন্তু কোনো দিন কিছু প্রকাশ করেনি। না করার কারণ, ওর কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না। জানতো ক্ষোণীশ অস্বীকার করবে। অমল প্রাণের ক্ষতকে গোপন রেখেছিল।

ক্ষোণীশের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক পরে। যখন অমল শেষ পর্যন্ত মুখ না খুলে পারেনি তখন, যখন ইন্দ্রানীর সঙ্গে ক্ষোণীশের সম্পর্ক একটা নিশ্চিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ক্ষোণীশ জানতো না, ওর আচার আচরণের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও তা বাইরের লোকচক্ষুতে ধরা পড়ার অবস্থায় আসেনি। এমন কি, ওর ছেলে মেয়েরাও তাদের বাবা সম্পর্কে কোনো দিন মন্দ কিছু ভাববার অবকাশ পায়নি। কিন্তু বিবাহিত ক্ষোণীশ কোনো কালেই ওর স্ত্রী অমলকে যথার্থ চিনতে পারে নি। বুঝতে পারে নি, পুরুষ হয়ে ও যাকেই ফাঁকি দিক স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। স্ত্রীদের এটা কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না। তার নারী সত্তার মধ্যেই সেই অনুভূতি নিয়ে সে জন্মেছে। জন্মকাল থেকে সমাজে সংসারে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে, সেই সত্তা একটি সংস্কারের মতো প্রাণের গভীরে মিশেছিল। যে-পুরুষকে সে তার জীবনের সব কিছু দিয়ে বরণ করেছে, যার কাছে সে সকল সত্তা নিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, এবং জীবনের ধারণা মতো, তার পরম লগ্নে যাকে পরম বলে জেনেছে, সেই পুরুষও যে নিজের অজ্ঞাতেই তার বিশেষ পরিচয়টাকে প্রকাশ করেছে দিনে দিনে। সংসারের অধিকাংশ পুরুষ তা জানতে পারে না। সেই বিশেষ পরিচয়ই হলো তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

ক্ষোণীশ জানত না, পুরুষের সেই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে, ও অর্জন করেছে পিতৃত্ব। সংসারে যাকে ও স্ত্রী বলে এনেছিল, তাকে নিজের সন্তানের জননীর পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে ওর সুখ দুঃখের ভাগ বহন করেছে বছরের পর বছর প্রতিটি দিনে। কাজ দিয়ে কোনোও সাহায্য না করতে পারলেও অমলই ওর জীবনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সাফল্য অসাফল্যের সুখ ও উদ্বেগের অংশীদার। জীবনের এই প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়ে, স্বামী যে স্ত্রীর কাছে, সন্তান আর মায়েরই এক সত্তার রূপ ধারণ করে, ক্ষোণীশের মতো পুরুষরা যথাসময়ে তা বুঝতে পারে না। এটা কেবল ক্ষোণীশের দুর্ভাগ্য না। পুরুষ-শাসিত এই সমাজের মধ্যেই সেই দুর্ভাগ্যের অঙ্কুর নিহিত থাকে। ক্ষোণীশ

সেই সমাজের ক্রীড়নক মাত্র। ও যতো বড় সফল পুরুষ হোক, এ ক্ষেত্রে সফল হওয়া কঠিন।

ক্ষোণীশের বোঝা উচিত ছিল, ওর সাফল্যের দানে অমলকে যতো ধনী করেছিল, তার চেয়েও অমল অনেক বেশি রক্তমাংসের মানুষ। স্বামীর যে-দানে ধনী হয়ে স্ত্রী একটি মাটির সুন্দর পুতুল হয়ে ওঠে, অমল সেই ধাতুর মেয়ে ছিল না। ক্ষোণীশ এই সমাজের চোখে একজন উদার স্বামী নিশ্চয়। এবং ও অমলের সম্পর্কে প্রকৃতই উদার ছিল। অমলকে ওর অর্থ বিত্ত বিলাস সামগ্রী-সমূহের অদেয় কিছুই ছিল না। ওর প্রাইভেট লিমিটেড ফার্মের কর্তৃত্ব থেকে সমস্ত রকমের অধিকার দিয়েছে। অমলের স্বাধীন মতো খরচ করবার ব্যাঙ্কে টাকা ছিল যথেষ্ট। নারীর চিরকালীন দুর্বলতার বিষয় যা সব বলা হয়েছে, সেই বস্ত্র অলংকারের কোনো অভাব রাখে নি ক্ষোণীশ। সেই হিসাবে বিলাস ব্যসনেরও না। অর্থের দিক ছাড়াও, অমলের ব্যবহারের জন্য দেশের তৈরি সব চেয়ে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি ছিল। ড্রাইভার ছিল সর্বক্ষণের। অমলের পায়ে ক্ষোণীশ কোনোরকম বেড়ি পরায় নি। অমল তার ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি যেতে পারতো। যার সঙ্গে খুশি মেশারও বাধা ছিল না। বেড়ি বলতে যা বোঝায়, তা অমল নিজের হাতে পরিয়েছে। ঝকঝকে নতুন অথচ মেকি টাকার মতোই এই সমাজের যে-দিকটা আছে, অমল কোনোকালেই সেই সমাজের প্রতি একটুও আকর্ষণ বোধ করে নি। একা একা যত্রতত্র গাড়ি নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ওর কোনো দিনই হয় নি। ক্ষোণীশেরই পরিচিত বন্ধুরা ওর বন্ধুর মতোই। কিন্তু বন্ধু-পত্নীর সীমাটা লঙ্ঘন করার মানসিকতা ওর ছিল না। যেমন সুপ্রিয় রায়চৌধুরী অমলেরও সুপ্রিয়দা। কিন্তু ওর জীবনে ক্ষোণীশের যে-স্থান, সে-স্থানে ওর ঘোরতর ধার্মিক প্রাণ কোনো দেবদেবীকেও বসাবার কথা ভাবতে পারতো না।

অমলের স্বামী সংসার সন্তান দেব দেবী ছাড়া ওর ঘনিষ্ঠ, ওর ভাসুরদের পরিবারের জা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা। নিজের ছেলে মেয়ের শিক্ষার দায়-দায়িত্বও ছিল ওর নিজের হাতে। ক্ষোণীশ সে-ব্যাপারেও অমলের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। অমল জানতো, সে দায়িত্ব ওকে হাতে তুলে দেবার জন্য কারোর কোনো ভূমিকা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই নিজের দায়িত্ব বোধে ছেলেমেয়েদের সব বিষয়ে ওর দৃষ্টি ছিল সজাগ। ও আধুনিক মায়েদের মতো পণ্ডিতদের বই পড়ে সন্তানদের মানুষ করতে শেখে নি। ছেলেবেলা থেকে, জ্ঞাতসারেই, ওর নিজের যে-সব অপূর্ণতা ছিল, সেগুলোকে ও পূর্ণ করতে চেয়েছিল সন্তানদের মধ্যে। ও দরিদ্র বাবা মায়ের সন্তান হলেও, সেখানে অবিদ্যার অন্ধকার কদাপি কোনোরকম ছায়া ফেলতে পারে নি। অভাব অনেক কিছু অপূর্ণ রেখে দিয়েছিল। ছেলে রূপ আর মেয়ে রেশমি বয়সের দিক থেকে বারো আর নয়। রূপ আর রেশমি, কেউই এখন পর্যন্ত অমল আর ক্ষোণীশের শিরঃপীড়ার কারণ হয়নি। কলকাতার বাঙলা মিডিয়ামের ভালো স্কুলে ওদের

শিক্ষার ক্ষেত্র। ইংলিশ মিডিয়াম সম্পর্কে ক্ষৌণীশের কোনো দুর্বলতা ছিল না। অমলেরও ছিল না। ক্ষৌণীশ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়ে দেবার বিপক্ষে ছিল। লেখাপড়ার বিষয়ে অকারণ মেতে ওঠার মধ্যে যে-উচ্চাশার জন্ম হয়, কোনো কারণে একবার পতন হলে, তার পরিণতি কোনোকালেই ভালো হয় না। স্বাভাবিক মেধা আর অনুশীলন মতো যার যতোটা শিক্ষা হবার ততোটাই যথার্থ। যারা সন্তানকে লেখাপড়ায় কেষ্টবিষ্টু করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকে, তারা অকারণ উদ্বেগে নিজেদের ক্ষতি করে। লেখাপড়ায় ভীত করে তোলে ছেলেমেয়েদের।

ক্ষৌণীশ ওর সংসার ও পারিবারিক জীবনে কোনো রকম সংকটের মুখোমুখি হয় নি! নিজের অবিশ্বস্ততার জন্য অমলকে যে-কষ্ট দিয়েছে, তা বোঝবার ক্ষমতা ওর ছিল না। অমলও কোনোদিন সে-প্রসঙ্গ তুলে সংসারে সংকট সৃষ্টি করেনি। স্বামীর সেই সব অবিশ্বস্ততা অমল মেনে নেয় নি। সহ্য করেছে ভবিষ্যতের আশায়। আশা ছিল, ক্ষৌণীশ ওর কাজের মধ্যে, ঝোঁকের মাথায় যা করছিল, এক সময়ে তা থেকে নিরস্ত হবে। ক্ষৌণীশের কর্মের উদ্যোগ, পরিশ্রম আর কুশলতার প্রতি ওর শ্রদ্ধা ছিল। অমল সংসার সন্তানের ভাবনা থেকে স্বামীকে রেহাই দিলেও, ওর কাজের জীবনে কোনো সাহায্যই না করতে পারার জন্য মনে মনে একটা অনুশোচনা বোধ ছিল। অথচ অমলের সেই অনুশোচনা বোধ নিয়ে ক্ষৌণীশের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। অমলের অনুশোচনা বোধ সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাও ছিল না।

ক্ষৌণীশ কোনোকালেই জানতে পারেনি, অমল হলো সেই শ্রেণীর স্ত্রী, যে নিজের সম্পর্কে অন্ধ অচেতন না। অধিকারের মধ্যেই স্ত্রীর যাবতীয় বিষয় সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন বদ্ধমূল ধারণা ওর ছিল না। নিজের রূপ যৌবনের চিন্তা থেকে ও মুক্ত ছিল না। সে ক্ষেত্রে ওর নিজের সম্পর্কে একটা সহজ বোধ ছিল। সে-বোধটা হলো, সংসারে ওর চেয়ে সুন্দরী রূপসী আছে বিস্তর। কিন্তু সৌন্দর্য আর রূপ মানেই, ওৎ পেতে পুরুষ ধরা না। অথচ পুরুষ যে অন্যায় ক্ষমতা ভোগ করে, সেই ক্ষমতার দ্বারা তারা স্ত্রীকেও বঞ্চিত করে। অমল জানতো, ক্ষৌণীশ একজন সেই জাতেরই পুরুষ। ক্ষৌণীশ গুণী মানুষ। সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। ওকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী মুগ্ধ হয়, অন্তরে ঈর্ষা হলেও, অমল অসহায়। এবং সমানই অসহায়, যদি ক্ষৌণীশও মুগ্ধ হয়। কেবল অসহায় না। কষ্টও অনিবার্য। সেই অসহায় কষ্টেও, অমল ক্ষৌণীশকে মনে মনে ক্ষমা করেছিল। তার একটা বড় কারণও ছিল। ক্ষৌণীশ এমন কিছু করে নি, যাতে অমল লোকচক্ষে অপমানিত হয়। যদিও অসহায় কষ্টের মধ্যে একটা অপমান বোধের কাঁটা বিঁধেই থাকে। কিন্তু এই সমাজে এটাই বোধ হয় অনিবার্য। অমল এ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল।

ক্ষৌণীশ অবিশ্বস্ত স্বামী হিসেবে যা-ই করে থাক; একমাত্র মনোরমার ক্ষেত্রেই ও মনের দিক থেকে ইনভলবড হয়ে পড়েছিল। যাকে বলে প্রেমে পড়া।

অবিশ্যি তার দৌড়ই বা কতোখানি ছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ কুর্গ-কন্যা বিষয়ে ওর এক বন্ধুপত্নীই প্রেমের আধারটি চূর্ণ করেছিল। তবু স্বীকার করতে হয়ে, ওর সারা জীবনে একমাত্র মনোরমাই 'প্রেম'। তারপরেও ওর জীবনে যা-ই ঘটে থাকুক, সে সব হলো হিন্দু বিধবার মাংস ভক্ষণের মতো। বৈধব্যটা যেমন তাদের জীবনে একটা ঘটনা, ক্ষৌণীশের জীবনে মনোরমাও সেইরকম। মেয়ে বন্ধু আর প্রেমিকাতে তফাত আছে। মনোরমা ছিল ওর প্রেমিকা। মনোরমা এই জগত ও সমাজের বিশ্বাস মতে, প্রাণ দিয়ে তা প্রমাণ করে গিয়েছে। ঐ দাগটা ক্ষৌণীশের প্রাণে একটা স্পষ্ট দাগ রেখে গিয়েছে। মূর্তি চূর্ণ করা যায়। দাগ মোছা কঠিন। কিন্তু দেহজ আকাঙ্ক্ষা থেকে ক্ষৌণীশের মুক্তি ছিল না। আর সেই আকাঙ্ক্ষায়, ইন্দ্রানীর আবির্ভাব ঘটেছিল মনোরামার ছায়ায়।

ক্ষৌণীশের অগোচরেই, অমল একটা সময় থেকে উৎকণ্ঠা বোধ করেছিল। যে-ক্ষৌণীশ সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সাবধান করে, ইন্দ্রানীর ক্ষেত্রে ও নিজেই সেখানে অন্ধ হয়েছিল। অবিশ্যি এ ব্যাপারে ইন্দ্রানীর ভূমিকা ছিল ক্ষৌণীশের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী। ক্ষৌণীশের দুর্বলতা ইন্দ্রানী সহজেই ধরে ফেলেছিল। আর সে-দুর্বলতা যে নিতান্তই ক্ষৌণীশের জীবন প্রবাহে এটা ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র, তাও ওর অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নিয়েছিল। সেই কারণেই, ও প্রথম থেকেই, 'বন্ধু'-র ভূমিকার চেয়েও 'প্রেমিকা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে তাড়াহুড়ো করেনি। অগ্রসর হয়েছিল ধীরে। এবং অব্যর্থ পথেই।

অমলের প্রথম উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল, ক্ষৌণীশের সঙ্গে ওর নিয়মিত বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা। সে-কথাটা ক্ষৌণীশের মুখ থেকে ওকে শুনতে হয়নি। বন্ধুরাই ওর খোঁজ করেছিল। অমলের কপালে দুশ্চিন্তার রেখার সঙ্গে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা জেগেছিল। ক্ষৌণীশ ওর সারাদিনের কাজের পর যে-সব বন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত সান্ধ্যকালীন আড্ডায় বসতো, তাদের ছেড়ে ও কোথায় যায়? সেরকম ক্ষেত্রে, অমলই ক্ষৌণীশের সঙ্গী হয়। অন্তত কলকাতায় তাই হতো। এমন অনেক দিন হয়েছে। ক্ষৌণীশ অমলকে টেলিফোনে অফিসে ডেকে এনেছে। ক্লাবে গিয়েছে। বন্ধুরা এলে ভালো। না এলেও ক্ষতি ছিল না। তবে বেশির ভাগ দিনই ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিত। ক্লাবে না হলে বন্ধুদের গৃহে। অথবা নিজের গৃহে। গৃহে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডায় অনেক সময় ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হতো। অমল চেষ্টা করতো, স্বামীর আড্ডা যেমনই হোক, ছেলেমেয়েদের পড়ার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। এবং অমল নিজের গৃহে স্বামীর বন্ধু ও বন্ধপত্নীদের আড্ডায় নিজেও যোগ দিতো। ভালোও লাগতো।

ক্ষৌণীশের সঙ্গে ইন্দ্রানীর পরিচয়ের তিন মাসের মধ্যেই, অমল দেখেছিল, স্বামীর সঙ্গে তার বন্ধুরের যোগাযোগ কমে এসেছে। অথচ ক্ষৌণীশ আগে নিয়মিত করতো না, সেটাই শুরু করেছিল। বাড়ি রোজই সেই আগের

মতো দেরিতেই ফিরতো। এমন কি সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো ব্যক্তিও ক্ষৌণীশকে প্রায়ই হারাচ্ছিলেন। আগের মতো সপ্তাহে অন্তত দু দিন সুপ্রিয়র সঙ্গে ক্ষৌণীশের সান্ধ্য আড্ডা হতোই। ওঁর সঙ্গে ক্ষৌণীশের কেবল আড্ডার সম্পর্ক ছিল না। ব্যবসাগত দিক থেকেও দুজনের মধ্যে নানা কথা হতো। অমল গোড়ার দিকে কোনো দিনই স্বামীকে জিজ্ঞেস করেনি, সে কোথায় গিয়েছিল। কার সঙ্গে, সে-প্রশ্নের তো কোনো অবকাশই ছিল না। অমল কেবল খবর দিতো, ক্ষৌণীশকে বাড়িতে টেলিফোন করে কারা খোঁজ করেছেন। অমল লক্ষ্য করতো, ক্ষৌণীশের খুশি মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। কিছুটা বিরক্তিও বটে। অমলের কথার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থেকে যেতো জিজ্ঞাসা। ক্ষৌণীশ তার যথার্থ জবাব দিতে পারতো না। অথচ ওকে মিথ্যা করে কিছু বলতেই হতো। অন্ধ পুরুষটি বুঝতে পারতো না, অমল তার মিথ্যা কথাগুলো ধরতে পারতো এবং অমলের উদ্বেগ বাড়তে থাকতো।

ক্ষৌণীশ অমলের সন্দেহের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, নিয়মিত বন্ধুদের আগেই টেলিফোনে ওর ব্যস্ততার কথা জানিয়ে রাখতো। ক্ষৌণীশ ব্যস্ত থাকবে কি না থাকবে, তা নিয়ে বন্ধুদের মাথা ব্যথা ছিল না। এ ক্ষেত্রে কেবল বন্ধুদের ধরলে হবে না। বন্ধুপত্নীরাও বাদ যেতেন না। কিন্তু অনেকের যেমন মাথা ব্যথা ছিল না, তেমনি কারোর কারোর মাথা ব্যথাটা ছিল অতিশয় বেশি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিস করা' সেই মাথা ব্যথাওয়ালা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীদের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটছিল। কারণ দোহনের পক্ষেও ক্ষৌণীশ বন্ধু হিসেবে ভালো গাভী ছিল। সেই গাভীর দুধ কে পান করছিল? এটা জানতে না পারলে তাদের জীবনে শান্তি থাকার কথা না। কারণ তাদের আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছিল। ক্ষৌণীশ কোথায়?

ক্ষৌণীশ কোথায়, সেটা ও একমাত্র সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর কাছে অকপটে ব্যক্ত করেছিল। সুপ্রিয় শুনে বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁর স্টোর্সের ম্যানেজারেসের সঙ্গে ক্ষৌণীশের অ্যাফেয়ার! তা হলে স্টোর্সে ক্ষৌণীশের সঙ্গে তার ওঠা বসা চলে না। ক্ষৌণীশ সে-দিক থেকে সুপ্রিয়কে নিশ্চিন্ত করেছিল, "আপনি একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। স্টোর্সে আমি এক আধ দিন ইন্দ্রানীর সঙ্গে দু একটি কথা বলেছি। তাও নিতান্ত ভদ্রতা বশেই। কর্মচারিদের মনে কোনো সন্দেহ জাগতে পারে, সে বিষয়ে আমি নিজে যতোটা সাবধান, ইন্দ্রানী তার চেয়ে বেশি।"

"তা বুঝলুম হে।" সুপ্রিয়র মুখের দুশ্চিন্তা কাটেনি, "তুমি আমাকে মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটে যেতে বারণ করেছিলে। খুব জোর বাঁচিয়েছিলে। কিন্তু ইন্দ্রানী তোমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, তা তো বুঝতে পারছি নে। আর এ কথা তোমার বউদি মমতাকেও আমি বলতে পারবো না।"

ক্ষৌণীশ হেসে বলেছিল, "সুপ্রিয়দা, কোথায় আর টেনে নিয়ে যাবে? টেনে নিয়ে যাবার তো একটাই রাস্তা আছে।"

"জাহান্নামে।" সুপ্রিয় হেসে বলেছিলেন, "সেটা জানি বলেই তো আমার টেনশন হচ্ছে। তোমার বা তোমার সংসারের কোনোরকম ক্ষতি হোক, আমি তা চাইনে।"

ক্ষৌণীশ হেসে বলেছিল, "ক্ষমা করবেন সুপ্রিয়দা। তবু না বলে পারছি নে। জাহান্নামটা তো বিছানা ছাড়া আর কোথাও নয়।"

"ঐ ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি থাকতে পারি নে।" সুপ্রিয় দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করেছিলেন, "তুমি যেমন আমাকে একটা নিষিদ্ধ জায়গা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলে, তেমনি আমিও তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। ইন্দ্রানীকে কি তুমি নগদ বিদায় করতে পারবে? দেখ বাপু, তুমি আমার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেই পারো। আমি ধোয়া তুলসী পাতা নই। ভোগ করার লোভ থেকে এ বয়সেও যে আমার মুক্তি ঘটেছে, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। কিন্তু আমি কোনোকালেই কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিনি। ঐ বস্তুটি কী, আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। তবে মমতার সম্পর্কে আমাকে সজাগ থাকতে হয়েছে। সেই জন্য আমার দুর্ভাবনা, ইন্দ্রানী তোমাকে জাহান্নামের কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যাবে। কেন না, এ তো আর মিসেস চাকলাদারের ফ্ল্যাটের ঘরে প্রেম বেচা কেনা নয়। ইন্দ্রানী সম্পর্কে আমাকে খোঁজ খবর করতে হয়।"

ক্ষৌণীশ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেছিল, "খোঁজ খবর আবার কী করবেন? মমতা বউদির বন্ধুর মেয়ে। পুরনো মিত্তির বাড়ি থেকে। মোটামুটি ভালো লেখাপড়া শিখে এসেছে। সে সব খোঁজ খবর নিয়ে তবেই তো ইন্দ্রানীকে আপনার স্টোর্সে চাকরি দিয়েছেন।"

"চাকরির ব্যাপারে খোঁজ খবর করা এক কথা।" সুপ্রিয় মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "প্রেমের ব্যাপারে খোঁজ খবরটা আলাদা। এ ব্যাপারে মেয়েদের নাড়ি নক্ষত্রের কথা জানা কঠিন। বোঝাও প্রায় অসম্ভব। ইন্দ্রানী ওর চাকরির ব্যাপারে ঠিকই আছে। রিপোর্ট ভালো। এখন আমাকে জানতে হবে, মেয়ে হিসেবে ওর মতিগতি আর গতিবিধিটা কেমন।"

ক্ষৌণীশ জিজ্ঞেস করেছিল, "আর সেটা আপনি খোঁজ করবেন মমতা বউদির কাছে?"

"মমতার বান্ধবীর মেয়ে যখন, তখন মমতাকে ছাড়া আর কার কাছে খোঁজ করবো?" সুপ্রিয় অনায়াসেই বলেছিলেন, "ইন্দ্রানীর মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।"

ক্ষৌণীশ ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল, "সুপ্রিয়দা, আপনি একটা বিপজ্জনক খেলা খেলতে যাচ্ছেন। হয় আপনি আমাকে ডিচ্ করবেন নয় তো নিজেকে।"

"তোমাকে বা আমাকে ডিচ্ করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?"

"মমতা বউদিকে আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন?"

"জিজ্ঞেস করবো, তোমার বান্ধবীর মেয়েটির চরিত্র কেমন, সে বিষয়ে একটু খোঁজ নাও।"

"কেন খোঁজ নেবেন ?"

সুপ্রিয় জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পাননি। নির্বাক বিব্রত চোখে ক্ষৌণীশের দিকে তাকিয়েছিলেন। ক্ষৌণীশ ঠোঁট টিপে হেসেছিল। সুপ্রিয় আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন, "হুঁ, বুঝেছি। মমতা প্রথমেই জানতে চাইবে, মেয়েটার চরিত্রের খোঁজ খবর কেন করছি। আর আমি যদি ঠিক মতো জবাব দিতে না পারি, তবে মমতা ধরেই নেবে, মেয়েটা নিশ্চয়ই স্টোর্সের কোনো ক্ষতি করেছে। তবে তুমি যদি ভেবে থাকো, মমতা ইন্দ্রানীকে নিয়ে আমাকে কোনোরকম সন্দেহ করবে, তা হলে ভুল করবে! তোমার সঙ্গে মেলামেশার কথাটাও বলা উচিত হবে না। তা হলে তোমাকে সত্যি ডিচ্ করা হবে। কারণ মমতা বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা কথাটা পেটে চেপে রাখতে পারবে। তারপরেই তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রসব করবে।"

. ক্ষৌণীশের মুখে করুণ হাসি ফুটেছিল, "তা হলেই ভেবে দেখুন সুপ্রিয়দা, কোন্ দিকে আপনি পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন। বরং আমি বলি, ইন্দ্রানী কেমন মেয়ে, সেটা আমাকেই বুঝতে দিন।"

"তারপর যখন ভরাডুবি হবে, তখন হয় তো সব কিছুই বোঝার বাইরে চলে যাবে।"

"ভরাডুবির আশঙ্কা করছেন কেন ? ইন্দ্রানী তো আমার হাতেখড়ি নয়।"

নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু গোলমালটা হলো, ইন্দ্রানীর মধ্যে তুমি মনোরমার ছায়া দেখতে পেয়েছো। অতএব শাড়ি গহনার নগদ বিদায়ে ব্যাপারটা মিটবে কি না সন্দেহ। 'প্রেম' ব্যাপারটিকে আমি বড় ভয়ের চোখে দেখি। কারণ ওর চেয়ে বড় ব্যাধি আর কিছু নেই। আর ব্যাধিটা হলো মানসিক। মেয়েটার সম্পর্কে ঠিক মত না জানলে, তোমাকে ডাইনির হাতে সমর্পণ করা হবে কি না, সেটা বুঝতে পারছি নে।"

"সুপ্রিয়দা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মনোরমার ছায়া আছে বলেই যে আমি ইন্দ্রানীর প্রেমে হাবুডুবু খাবো, তা ভাববার কোনো কারণ নেই।"

"তুমি হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেছো। এটা যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।"

"যদি দেখে থাকেন, তবে জানবেন ইন্দ্রানীর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি একেবারে অন্ধ নই।"

সুপ্রিয় শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত কোনো দিনই হতে পারেননি। কোনো অবিবাহিতা মেয়ে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে একেবারে অবারিত করে মিশতে পারে, এটা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। তিনি বেশ্যাবৃত্তি বুঝতেন। সেটা যে-ভাবেই হোক। কিন্তু ইন্দ্রানীর মতো একটি মেয়ে ক্ষৌণীশকে পাকড়াও করেছিল, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। ইন্দ্রানীকে আর যাই হোক দেহোপজীবিনীর পর্যায়ে চিন্তা করা সম্ভব ছিল না।

ক্ষৌণীশ সুপ্রিয়র দিকটা ভালোভাবেই রক্ষা করেছিল। সুপ্রিয় যখন সমস্ত বিষয়টি জেনেছিলেন, তখন থেকে অমলকে টেলিফোন করাও বন্ধ করেছিলেন। কারণ, ক্ষৌণীশের খোঁজ করা ছাড়া, অমলকে টেলিফোন করার কোনো দরকার ছিল না। অথচ একবারও ভেবে দেখেন নি, অমলের মনেও কোনো প্রশ্ন জাগতে পারে। ক্ষৌণীশ সুযোগ নিতে পারে। নিয়েওছিল। কারণ ও জানতো সুপ্রিয়দা অমলকে টেলিফোন করে ওর খবর দেবেন না। ক্ষৌণীশ প্রায় নিয়মিত বলতে আরম্ভ করেছিল, সান্ধ্য আড্ডাগুলো ওর সুপ্রিয়র সঙ্গেই ঘটছিল। ভেবেও দেখেনি। অমলের মনে নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসা ও-ই তুলে দিয়েছিল। এবং সুপ্রিয়র বাড়িতে অমলের যাতায়াত ছিল। কোনো কারণে বন্ধও হয়নি। এবং মমতা বউদির সঙ্গে মিথ্যাচার করছে। কেবল সুপ্রিয়র বাড়ি থেকেই অমল সেটা বোঝেনি। ওর যে সব বন্ধুরা নিয়মিত খোঁজ করতো, তা থেকেও বুঝতে পারতো, ক্ষৌণীশ সত্যি কথা বলতে পারছে না।

ক্ষৌণীশ আর অমলের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল সেটাই। অমল যখন বুঝতে পেরেছিল, ক্ষৌণীশ মিথ্যা বলেছে, তখনই ওর মনে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা জাগতো, কেন? ক্ষৌণীশ কেন মিথ্যা বলেছে? ও কোথায় কী ঘটাচ্ছে? ক্ষৌণীশের বোঝা উচিত ছিল, গোটা পৃথিবীর সঙ্গে কলকাতাও খুব ছোট শহর। এবং বাইরে থেকে এ শহরকে যতোটা নাগরিক মনে হয়, ততোটাই গ্রাম্য। ক্ষৌণীশ মিথ্যা বলছিল, এ বিষয়ে অমলকে কারোর কিছু বোঝাবার ছিল না। ওর নিজের অনুভূতি দিয়েই, স্বামীকে ও চিনতে শিখেছিল। ওকে একটা সন্দেহের বিষাক্ত সাপ ক্রমে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছিল। কারণ ক্ষৌণীশের মিথ্যাচারের কারণটা ছিল ওর কাছে অনাবিষ্কৃত। কিন্তু কতকাল? মাত্র পাঁচ ছ' মাসের মধ্যেই, অমলকে সেই সাপের ছোবল খেতে হয়েছিল। আর ছোবলটা খেতে হয়েছিল মমতার কাছ থেকেই, "ও'র (সুপ্রিয়) মুখ থেকে আমি কিছু শুনিনি। তবে মিত্তির বাড়ির ব্যাপার তো! খুশির (ইন্দ্রানী) মাও আমাকে কিছু বলেনি। বলবেই বা কী করে? মেয়ে তার মাকে নাকি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। তাই ওর মা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। আমার কাছেও মুখ খোলেনি। ওর এক পিসির মুখ থেকেই শুনলুম, ক্ষৌণীশের সঙ্গে নাকি খুশির দহরম মহরম চলছে বেশ কিছু কাল ধরে। আমি অবিশ্যি কর্তাকে (সুপ্রিয়) ছাড়ি নি। কিন্তু উনি আমার মুখে সব শুনে আকাশ থেকে পড়লেন! কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি…"

"মমতা বউদি, আপনি কার কথা, কী বলছেন, আমি কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি নে।" অমল এই পর্যন্ত ছলনা করতে পেরেছিল। মমতা যে কী বলছিলেন, প্রত্যেকটি কথাই ওকে ছোবলের মতো বাজছিল। সন্দেহের অধিক, নিশ্চিন্ত যা ওর অনুভূতি থেকে বুঝেছিল, মমতা সেই কথাই ব্যক্ত করছিলেন। এবং খুশি যে একটি মেয়ের নাম তাও বুঝেছিল।

মমতা আরও পরিষ্কার খুলে বলেছিল, ইন্দ্রানী কে। কী তার পরিচয়।

ক্ষৌণীশের সঙ্গেই বা তার কী সম্পর্ক। মমতা যখন এ ঘটনা অমলকে বলেছিলেন, ক্ষৌণীশ তখন ওর অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে বম্বে গিয়েছিল।

"মমতা বউদি, কথাটা যদি সত্যিই হয়, তা হলেই বা আমার কী করার আছে?" অমল মুখের হাসি বজায় রাখতে চেয়েছিল, "আপনার দেবর যদি সেরকম কিছু করেন, আমি কী করতে পারি?"

মমতা অবাক হয়েছিলেন, "কী করতে পারো মানে কী? তোমাকে তো তোমার স্বামীকে ফেরাতে হবে। আমি অবিশ্যি ওঁকে (সুপ্রিয়) বলেছি, তুমি মেয়েটাকে ক্ষৌণীশের জীবন থেকে সরাও। উনি বলছিলেন, মেয়েটাকে তো আমি কিছু বলতে পারি নে। বরং বলতে পারি ক্ষৌণীশকে: আমি বলেছি, তাই বলো। খুশির মা'কেও আমি বলেছি, মেয়েকে সামলাও। প্রেম করতে হয় করুক, তার জন্য হাজারো ছেলে রয়েছে। ক্ষৌণীশকে কেন? তবে ওর মাকে বলেই বা লাভ কী? সে বেচারির কিছুই করার নেই। ক্ষৌণীশ অফিসের কাজে বাইরে গেছে। তুমি কিন্তু আমার নাম বলো না। আমার যা বলবার তা আমি তোমাকেই বলবো।"

"মমতা বউদি, কেন মিছিমিছি কষ্ট করে এসব কথা বলতে আসবেন?" অমল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, অপমানের হাত থেকে বাঁচতে। যা বোঝবার ও বুঝেছিল আগেই। মমতা বউদি কেবল 'সেই' মেয়েটির পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন।

মমতা তাঁর বিশ্বাস মতেই বলেছিলেন, "কষ্ট করে বলতে আসবো কেন? তোমার এটুকু উপকার আমি করতে পারি নে? হ্যাঁ, খুশির পিসিই বা কতোটা বলতে পারবে। বললে, সে নাকি তার স্বামীর মুখ থেকে শুনেছে। আমি তো জানি. খুশির পিসে কলকাতার এক পুরনো সাহেবি ক্লাবের কেরানী। বোধহয় খুশির সঙ্গে ক্ষৌণীশকে ক্লাবে দেখে থাকবে।"

"মমতা বউদি, আপনি আর এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন না।" অমল প্রায় হাত জোড় করে অনুরোধ করেছিল, "যে-বিষয়ে আমি কিছুই করতে পারবো না, সে-বিষয়ে আমার কিছু শুনেই বা কী হবে?"

মমতা প্রায় ধমকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে খুশিদের বাড়ি নিয়ে যাবো। খুশিকে তোমার সামনে দাঁড় করাবো।"

"না না মমতা বউদি, তা হতেই পারে না।" অমল করুণভাবে মুক্তি চেয়েছিল, "আমি কোথাও যেতে চাইনে। কারোকে আমার সামনেও দাঁড়াতে হবে না। কেনই বা হবে। আপনাদের দেবর তো ছেলেমানুষ নন, জোর করে তো তাঁকে কেউ কারোর সঙ্গে মিশতে বলে নি। এমন ব্যাপারে আমি কারোর কছে যেতে পারিনে। কথাও বলতে পারিনে।"

মমতা অমলের মনের অবস্থা বুঝতে পারেননি। একজন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্তব্য হিসাবে যা করা উচিত, তিনি তাই করতে বলেছিলেন। অমলের কথাবার্তা তাকে অবাক করেছিল। যদিও তিনি মোটেই নিরস্ত হননি। প্রথম

দিন ঐ পর্যন্ত জানিয়ে তিনি বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, "তুমি ছেড়ে দিলেও, আমি ছাড়বো না।"

অমলের নিজেরই কি ছাড়বার কথা। কিন্তু ধরা ছাড়ার বিষয়টা কী? ক্ষৌণীশ যে মিথ্যাচার করছিল, তা ওর অজ্ঞাত ছিল না। হয়তো আরও কেউ কেউ ঘটনাটি জানতো। অমলকে সামনে এসে বলতে চায়নি। অমল কোনো কোনো দিন অফিসে গিয়েছে। যেমন ও মাঝে মাঝেই গিয়ে থাকে। ইচ্ছে করেই ক্ষৌণীশের অফিস থেকে বেরোবার সময় গিয়েছে। ক্ষৌণীশ অন্তত, যদি ওর সঙ্গে অফিস থেকে বাড়ি ফেরে। তাও কোনো দিনই হয়নি। ক্ষৌণীশ বিশেষ কাজের আছিলায় বেরিয়ে গিয়েছে। বড় ভাসুরের ছেলে অনীশ ক্ষৌণীশের অত্যন্ত কাছের মানুষ। ওকেও ক্রমাগত গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। ছোট কাকার বিষয়ে ও-ও ভালো মন্দ কিছুই বলতো না। তবে, সুপ্রিয় রায়চৌধুরীর স্ত্রী মমতার কাছ থেকে কিছু শোনবার চেয়ে, অনীশের মুখে শোনা ভালো ছিল। মমতা জানা মানেই, গোটা কলকাতার কানে কানে কথা পৌঁছে যাওয়া।

মমতা যেদিন কথাটা অমলকে বলেছিল, তার দু'দিন পরেই অবিশ্যি অনীশের কাছ থেকে মর্মান্তিক খবর শুনতে হয়েছিল। অনীশ নিজে থেকে খুব প্রয়োজন না হলে ছোট কাকিমার কাছে আসতো না। সম্ভবত ওর ধারণা ছিল, ক্ষৌণীশের সব কথাই অমল জানে। ও এসে জিজ্ঞেস করেছিল, "ছোট কাকা বম্বে যাবার আগে তোমাকে কিছু বলেছিল?"

"আমাকে?" অমল ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়েছিল, "না তো। কেন, কী হয়েছে?"

"বম্বে থেকে টেলিফোন এসেছিল, ছোট কাকাকে বম্বেতে যেতে হবে।" অনীশ বলেছিল, 'পাটিল আমাকে টেলিফোন করেছিল। আমি তো অবাক। ওকে বলেছি ছোট কাকা তো বম্বেতেই গেছেন! তিন দিন হয়ে গেল! জবাবে পাটিল আমার চেয়ে অবাক হয়ে বললো, আজব কথা শোনাচ্ছো। স্যার বম্বেতে এলে আমি জানতে পারতাম না? যাবেনই বা কোথায়? তুমি তো আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। তোমরা ভালো মতো খোঁজ নাও? উনি ঠিক দিনে ঠিক ফ্লাইটে রওনা হয়েছিলেন কি না। আমিও এখানে খবর নিচ্ছি। বম্বেতে ওঁকে খুবই দরকার।"

"তা তো বুঝলাম।" অমল অধৈর্য উদ্বেগে বলেছিল, "কিন্তু তোমার ছোট কাকা গেলেন কোথায়? তিনদিন আগে উনি বম্বে গেছেন। আমাকেও তাই বলে গেছেন। অথচ বম্বে থেকে পাটিল টেলিফোন করছে তোমার ছোট কাকা সেখানে পৌঁছোন নি? এ কী রকম কথা! আজ পর্যন্ত তো এরকম ঘটেনি। কীভাবে কোথায় খোঁজ খবর করা যায়, আমি কিছুই জানি নে। তোমরা এখুনি খবর নাও।"

অনীশ অমলের কাছে এসেছিল ছোট কাকার খবর নিতে। খবর পাওয়া

দূরে থাকুক, উলটে ছোট কাকিমাকেই সে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কেবল তাই না। অমল অনীশকেই যেন ক্ষোণীশের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে দায়ী করেছিল। অতএব, অনীশের আর কিছুই বলার ছিল না। অমলের আসলে একটা উদ্বিগ্ন প্রত্যাশা ছিল, অনীশ তার ছোট কাকা সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু অনীশ কিছুই শোনায় নি। সে বলেছিল, "আমি কলকাতার ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখছি, ছোট কাকা ঐদিন বম্বে যাওয়ার কোনো টিকেট কেটেছিল কি না।"

"আশ্চর্য" অমল অনীশের কাছ থেকে কিছু শোনবার উদ্দেশ্যেই বলেছিল, "তুমি কি তা হলে বলতে চাও, তোমার ছোট কাকা, আমাকে, অফিসে তোমাদের সবাইকে মিথ্যে কথা বলেছেন? বম্বের নাম করে তিনি অন্য কোথাও গেছেন?"

অনীশ মাথা নেড়ে বলেছিল, "ছোট কাকি, আমি যদি ব্যাপারটা কিছু জানবোই, তবে তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেন? পাটিলের টেলিফোন পেয়ে আমি তোমার কাছেই আগে ছুটে এসেছি। যদি ছোট কাকা তোমাকে কিছু বলে গিয়ে থাকে। অফিসিয়ালি যে-কথা জানানো যায় না, তা হয় তো তোমাকে জানাতে পারে। এই ভেবেই আমি তোমার কাছে এসেছি।"

"কিন্তু তোমার ছোট কাকা আমাকে আলাদা করে কিছুই বলে যাননি।" অমল অনীশের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, "সকালে ব্রেকফাস্ট করে একটা লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাত্রে যখন ফিরে আসে, তখন বেশির ভাগ দিনই তার কথা বলার মতো অবস্থা থাকে না। সারাদিন তোমার ছোটকাকা তোমাদের কাছে অফিসেই থাকে অথবা অফিসের কোনো কাজে ঘোরাঘুরি করেন। আমার চেয়ে, তোমার ছোটকাকার কথা তোমরা ভালো জানো।"

অনীশ প্রায় অসহায়ের মতো বলেছিল, "শোনো ছোট কাকি, আমরা তোমার চেয়ে বেশি কী আর জানবো? কাজের বিষয়ে তোমার চেয়ে হয় তো বেশি জানি। আমাদের এখন কোথায় কী কাজ হচ্ছে, সেসব আমার নখদর্পণে। কিন্তু ছোট কাকার বিষয়ে আমি আর বেশি কী জানবো? তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে।"

"অনীশ, তাহলে বৃথাই তুমি আমার কাছে এসোছো।" অমল করুণ চোখে অনীশের দিকে তাকিয়েছিল, "ভেবেছিলুম, আমিই সকলের চেয়ে অন্ধ। অন্ধ আর মূর্খ। তোমরাও যে তোমাদের ছোট কাকার সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি কিছু জানো না, আমি তা ভাবিনি। তোমাকে তা হলে আমি সত্যি কথাই বলি, গত ছ' সাত মাস ধরে তোমার ছোটকাকার মতিগতি গতিবিধির কথা আমি কিছুই জানিনে। শুধু এইটুকু বুঝেছি তিনি অফিসের কাজ ছাড়াও অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তা তিনিই জানেন। আমি কোনো দিন জিজ্ঞেসও করিনি। তিনি কিছু বলতে চেয়েছেন। কী বলতে চেয়েছেন, আর বোঝাতে চেয়েছেন, আমি কিছুই জানি নে। ভেবেছিলুম,

তোমাদের, বিশেষ করে তোমার সঙ্গে ছোট কাকার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। ফার্মের অনেক গোপন কথা তিনি তোমাকেই বলেন। যা হয় তো আমাকেও বলেন না। আজ যদি ছোট কাকার হদিস করতে আমার কাছে তোমাকে ছুটে আসতে হয়, তা হলে ভুল করেছো। অনীশ, বম্বের নাম করে তোমার ছোট কাকা কোথায় গেছেন, আমি কিছু জানিনে···কিছু না। তোমার ছোট কাকা···" উদগত কান্না তার কণ্ঠরোধ করেছিল। অনীশের কাছে সে নিজেকে আর গোপন করতে পারে নি। দুহাতে মুখ ঢেকে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

অনীশ স্বভাবতই খুব অসহায় বোধ করেছিল। রূপ রেশমি দুজনেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। মা'কে কাঁদতে দেখে, ওদের মন উৎকণ্ঠিত ও জিজ্ঞাসু হয়েছিল। রূপ অনীশের একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে বড়দা? মা কাঁদছে কেন? বাবার কি কিছু হয়েছে?"

"না, ছোটকাকার কিছু হয়নি।" অনীশ রূপের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল, "তিনি ভালোই আছেন। মা কাঁদছেন অন্য একটা ব্যাপারে। সেসব তোমাদের শোনার কোনো দরকার নেই। তোমরা বাইরে যাও।"

রূপ রেশমি কেউ বোকা ছিল না। সম্পর্কের দিক থেকে, আপাতত চাটুয্যে বাড়ির বড় ছেলে অনীশ। সেই হিসেবেই সে নিজের ভাই বোন আর দুই কাকার ছেলেমেয়েদের সকলের বড়দা। রূপ অনেকটাই ক্ষৌণীশের প্রতিরূপ বলা যায়। রেশমিও দেখতে অনেকটা ওর বাবার মতোই হয়েছে। রূপ অনীশের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। দুই ভাই বোনের চোখেই ছিল সংশয় আর সন্দেহের ছায়া। কিন্তু ওরা অবাধ্য হয়নি। অনীশের নির্দেশ মেনে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল। অনীশ ডেকেছিল, "শোনো ছোট কাকি, আমার বিশ্বাস ভয় পাবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। ছোটকাকা আজ পর্যন্ত অপিসের কাজে কোনোরকম অবহেলা করেনি। করলে আমি তা মেনে নিতুম না। তুমি জানো, ছোটকাকা আমার কাছে বাবার চেয়েও বেশি। আমি তার বিশ্বস্ত কর্মী। অনুচর, ভাইপো। এমনকি ছোটকাকা আমাকে বন্ধুর মর্যাদাও দেয়। কিন্তু ছোটকাকার সব কথা আমার জানবার কথা নয়। হয়তো তার জীবনে এমন ঘটনা থাকতে পারে, যা সে নিজে না বললে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না। এটা ছোটকাকারই শিক্ষা। যে মানুষ তার ফার্মের গোপন সব বিষয়ে আমাকে দায়িত্ব দেয়, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে, সে নিজে না বললে, আমার জানার কোনো অধিকার থাকে না।"

"অনীশ, এতো কথা বলছো কেন?" অমল নিজেকে সামলে নিয়েছিল, "তুমি তোমার ছোট কাকার বিশ্বস্ত। আমারও তুমি বিশ্বস্ত। তুমি বংশের বড় ছেলে। ছোট কাকা তোমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। একটা কথা বল, তোমরা কি ছোট কাকাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত আছো?"

অনীশ তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। অমল নিজেই অনীশকে ওর অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিল, "তোমার জবাব দেবার অসুবিধে

থাকলে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তোমার ছোটকাকা যাই করুন, আমি চাই তিনি সুস্থ থাকুন। বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকুন। তিনি আমার চেয়ে এ সংসারকে অনেক বেশি চেনেন। তবু, অনীশ, মানুষ দেবতা নয়। দেবতারও শুনি মতিভ্রম হয়। তোমার ছোটকাকার যাতে সব দিক থেকে ভালো হয়, তোমরা সেদিকে নজর রেখো। তা হলেই আমি শান্তি পাবো।"

অমল জানতো, অনীশ মুখ খুলতে পারছিল না। মমতা রায়চৌধুরি যে-বিষয়ে বলে গিয়েছিলেন, অনীশ বা অফিসেরও কেউ কেউ তা জানে, অমলের এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পাছে, ক্ষৌণীশ সম্পর্কে কোনো অশালীন বা অসম্মানজনক কথা ওদের মুখ থেকে প্রকাশ পায় সে বিষয়ে ওরা সাবধান ছিল। অমল অনীশকে বিদায় দেওয়ার আগে, উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিল, "তোমাদের এখন এক মাত্র কাজ, ছোটকাকার হদিস করা। একটা কোনো খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।"

অনীশের বিদায়ের মুহূর্তেই টেলিফোন বেজে উঠেছিল। অমল টেলিফোন ধরেছিল। টেলিফোন এসেছিল ক্ষৌণীশের অফিস থেকে। অনীশের খোঁজ করছিল। অমল টেলিফোনের রিসিভার এগিয়ে দিয়েছিল, "অনীশ তোমার টেলিফোন।"

অনীশ টেলিফোন ধরেছিত। অমল দেখেছিল, অনীশের ভ্রূকুটি চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটেছে। তারপরেই ও হেসে বলেছিল, "যাক খবরটা তাহলে পাকা। আমি ছোটকাকিকে খবরটা জানিয়েই অফিসে যাচ্ছি।" সে রিসিভার রেখে বলেছিল, "ছোটকাকা বম্বে থেকে টেলিফোন করেছিল, মাত্র কয়েক মিনিট আগে। ছোটকাকা আগে বম্বে না গিয়ে ব্যাংগালোরে গেছলো। ব্যাঙালোর থেকে আজই বম্বে পৌঁছেছে। শেষ মুহূর্তে নাকি ব্যাঙালোরের বীরভদ্রব কাছ থেকে বিশেষ খবর পেয়ে, ছোটকাকাকে বম্বে ফ্লাইট ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তাহলে ছোটকাকি, তোমার দুশ্চিন্তার কিছু রইলো না। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। ছোটকাকার ফিরতে আরো তিন দিন দেরি হবে। আর যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই। রূপ আর রেশমি তোমাকে কাঁদতে দেখে, বেচারিরা ভয় পেয়েছে। তোমার মুখ থেকে কিছু শুনতে না পেলে ওদের মন শান্ত হবে না।"

অনীশ বিদায় নিয়েছিল। অমল রূপ আর রেশমিকে বুঝিয়েছিল, ক্ষৌণীশের বম্বের পরিবর্তে ব্যাঙালোর যাবার খবর জানা ছিল না বলেই, ভয়ে সে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু বম্বে থেকে খবর পৌঁছে গিয়েছে। অমল ছেলে মেয়েদের যা-ই বোঝাক অনীশের কাছে নিজেকে যতোই গোপন করুক, বম্বের পরিবর্তে, হঠাৎ ব্যাঙালোর যাবার মধ্যে ক্ষৌণীশের যে একটা মিথ্যাচার রয়েছে তা ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানিয়ে দিয়েছিল। মমতা ওর সকল অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ও না চাইলেও, মমতা বিষয়টিকে তাঁর পবিত্র ও আবশ্যিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। এবং সেই দায়িত্ব বোধেই তিনি আরও অনেকের ওপর

সেই কর্তব্যের ভার হয় তো চাপিয়ে দেবেন।

অমলের যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষৌণীশ কোনোকালেই অমলের সব দিক জানবার বোঝবার চেষ্টা করেনি। কারণ, তার ছিল কর্মের জগত। আর সেই সঙ্গেই, ঘরের বাইরে, রমণী বন্ধুর দু চারটি ঘটনা। সে-সবের সঙ্গে অমলের কোনো যোগ থাকতে পারে না। ও ব্যস্ত ছিল নিজেকে নিয়েই। নিজের কাজ, নিজের স্খলন, সবই ছিল ওর নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু অমলের ব্যাপারটা ছিল বিপরীত। তার জীবনের সবটাই কেন্দ্র করেছিল ক্ষৌণীশকে। সে অনেক বেশি চিনতো। ইন্দ্রাণীর বিষয় জানার পরে, বম্বের রহস্যও ভেদ হয়েছিল। একবার যখন পরোপকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল, সে তো সহজে বিদায় নেবে না। পরোপকার তো কেবল কর্তব্য না। মমতা রায় চৌধুরীর মতো মহিলার সেটা নেশাও যে বটে! মহিলার দোষই বা কী? জীবনে কোনো উৎকণ্ঠা উদ্বেগের বালাই ছিল না। জানতেন স্বামীটি সোনার খনির মালিক। চরিত্রটি একেবারে মন্ত্রপূতঃ কবচের মতোই শক্ত বন্ধনে ছিল। সংসারের দায় দায়িত্ব কিছুই ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টালা থেকে টালিগঞ্জ বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পরচর্চার জাবর কেটে তাঁর দিন কাটে। ক্ষৌণীশের বম্বের বিষয় জানবার পরের দিনই তিনি অমলকে টেলিফোন করেছিলেন, "ক্ষৌণীশ কোথায় গেছে জানো?"

"জানি।" অমল সতর্ক হয়ে উঠেছিল, "প্রথমে গেছলেন ব্যাঙালোরে। ব্যাঙালোর থেকে গতকাল পৌঁছেছেন বম্বে।"

মমতা জিজেস করেছিলেন, "আর কিছু খবর রাখো?"

"খবর আর কী রাখবো" অমলের রিসিভার ধরা হাত কাঁপছিল। ও গলার স্বর স্থির রাখার চেষ্টা করেছিল, "কাজের মানুষ কাজে গেছেন। দুদিন বাদেই ফিরবেন।"

অমল কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। মমতার কর্তব্যপরায়ণতায় তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি, "ক্ষৌণীশ যেদিন কলকাতার বাইরে গেছে, খুশিও সেদিন থেকেই ছুটি নিয়েছে। কিন্তু খুশি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে নেই। সেও কলকাতার বাইরে গেছে।"

"তা তো সে ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতেই পারে।" অমলের মনে হয়েছিল, ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসবে। ও দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রেখেছিল, "তার সঙ্গে আপনার দেবরের কী সম্পর্ক? তিনি তো হামেশাই কাজের জন্য কলকাতার বাইরে যান।"

মমতা বলেছিলেন, "ক্ষৌণীশ যে কাজের জন্য হামেশাই বাইরে যায়, তা আর নতুন কী? কিন্তু নতুন হলো, এবার ক্ষৌণীশের বাইরে যাবার দিন থেকেই খুশিও হাওয়া। তোমাকে আমি খুশি আর ক্ষৌণীশের ব্যাপার সবই খুলে বলেছি। সব ব্যাপারকে এতো সহজ করে নিলে চলে না। তোমাকে আমি বলছি, খুশি ক্ষৌণীশের সঙ্গেই বাঙ্গালোর বম্বে ঘুরতে গেছে। তোমার

কী সর্বনাশ ঘটছে, তা কি বুঝতে পারছো ?

"মমতা বউদি, বুঝতে পেরেই বা আমি কী করবো ?" অমল শক্তি ফিরে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, "সেরকম ঘটনা যদি কিছু ঘটেও, আমি তো আপনার দেবরকে ত্যাগ করতে পারবো না।"

মমতা ধমক দিয়েছিলেন "ত্যাগ করবে কেন ? হয়তো ক্ষৌণীশই তোমাকে ত্যাগ করবে। তা যাতে না করতে পারে, সেটাই দেখতে হবে। এতো নরম হলে চলবে না। ক্ষৌণীশ এবার ফিরে এলেই, তুমি ওকে শক্ত হাতে চেপে ধরো। পরিষ্কার জানাও, তুমি ওর আর খুশির ব্যাপার সবই জানো। স্ট্রেট চার্জ কর, খুশিকে নিয়ে বাইরে যাবার ঘটনা তুমি সব জানো। তারপরে কী করতে হবে সে কথা তোমাকে আমি বলবো।"

"আচ্ছা !" অমল আর একটি কথাও না বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। শোবার ঘরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল।



ক্ষৌণীশের গাড়ি যখন বাংরিপোষি বাংলোর বন্ধ গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন বেলা দেড়টা। ও এঞ্জিন বন্ধ না করে হর্ন বাজালো। গেটের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। লাল মাটির উঠোন। বাঁ দিকে একটা মস্ত আম গাছ। ডান দিকে বাংলো বাড়ির সিঁড়ি আর কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সোজা তাকালে চোখে পড়ে একটি ঘর। উঁচু দাওয়া। পাকা ঘরটির পাশে একটি মাটির ঘরও আছে। দাওয়ার ওপর বসেছিল দুটো দশ বারো বছরের মেয়ে। একটি ফ্রক পরা মেয়ে ছুটে এসে গেট খুলে দিল। গেটের লোহার গরাদের পাল্লা দুটো মেয়েটির পক্ষে যথেষ্ট ভারি। তবু সে ইন্দ্রানীকে দেখতে দেখতে গেট খুললো।

ক্ষৌণীশ উঠোনের লাল ধুলো উড়িয়ে একেবারে বাংলোর সিঁড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালো। ছাদ ঢাকা লম্বা বারান্দা। বারান্দা থাম দিয়ে ঘেরা। বাংলোর ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। বাংলোর সামনেই মস্ত বড় একটা ইঁদারা। কপিকলের দড়ির সঙ্গে বাঁধা বালতি রয়েছে নিচের শান বাঁধানো চাতালে। সিঁড়িতে ছায়া পড়েছে বিরাট একটা নিম গাছের।

ক্ষৌণীশ গাড়ির দরজা খুলে নামলো। বাঁ দিকের দরজা খুলে ইন্দ্রানীও নামলো। ওর ঘাড়ের কাছে শক্ত করে বাঁধা চুল কপালের ওপর গালে এসে পড়েছে। দু জনের কারোরই মুখে মাথায় বিশেষ ধুলো নেই। কারণ কলকাতা থেকে যেমন মেঘলা আর বাতাস দেখে বেরিয়েছিল, গোটা পথের সবখানেই আবহাওয়া ছিল সেই রকম। জামসোলা ছাড়াবার পর, ঝড়পুকুরিয়া রোডে এক জায়গায় প্রায় কুড়ি মিনিট অঝোরে বৃষ্টি হয়েছিল। গাড়ির কাচ বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই বৃষ্টিতে ইন্দ্রানী উচ্ছ্বাসে গান গেয়েছিল। ক্ষৌণীশ গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়েছিল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে ইন্দ্রানীকে বাঁ হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছিল। ইন্দ্রানী গান না থামিয়ে মাথাটা এগিয়ে দিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্য গান থামিয়ে, মুখ বাড়িয়ে ক্ষৌণীশের ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। ঝড়পুকুরিয়ার বৃষ্টির রাস্তা তখন ফাঁকা।

ক্ষৌণীশ একটা সিগারেট ধরাতেই, ঘোমটা মাথায় একটি স্ত্রীলোক এগিয়ে এলো। তার কালো মুখ ডাগর চোখে সম্ভ্রমের হাসি। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। বাঙালী বউদের মতো তার হলুদ রঙের লাল পাড় শাড়ি আটপৌরে ঢঙ-এ পরা। কথা বললো একটু বেশি 'স' কার মিশিয়ে, কিন্তু একেবারে বাঙলায়, "নমস্কার বাবু। ভাল আছেন ?"

"এই যে লক্ষ্মী এসেছো ?" ক্ষৌণীশ এখন কিছু ক্লান্ত। কিন্তু তাকে বেশ খুশি দেখালো, "ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকতে যাবো। আমি ভালো আছি। তুমি ভালো আছো ? তোমার মেয়েরা ?"

লক্ষ্মী ইতিমধ্যে ইন্দ্রানীর দিকে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসু চোখে একবার দেখে নিয়েছিল। বললো, "ভাল আছি বাবু। এক বছর পরে আসলেন। দরজা খুলে দিব ?"

"দেবে না ?" ক্ষৌণীশ হেসে ইন্দ্রানীর দিকে একবার দেখলো, "সেই কোন্ সকালে কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। এখন আর দাঁড়াতে পারছি না। তুমি যেন আবার জিজ্ঞেস করতে যেও না, আমি বাংলো বুক করেছি কি না। যদি কেউ আসে, আমরা তোমার ঘরে গিয়ে উঠবো। একটা রাত কাটাতেই হবে।"

লক্ষ্মী তার পান খাওয়া লাল ঠোঁট বিস্তৃত করে হেসে বললো, "ও সব বুক টুক করার কথা আপনাকে আমি জিগেস করব ? আপনি আগে ত ঘরে ঢুকেন। তারপরে কেউ আসলে দেখা যাবে।" সে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে গেল।

ইন্দ্রানী পিছন থেকে লক্ষ্মীকে দেখছিল। লক্ষ্মীর বয়স সম্ভবত তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি। তার কালো মুখ ডাগর চোখে একটি শ্রী আছে। স্বাস্থ্যটিও ভালো। ইন্দ্রানী হেসে চোখের কোণে ক্ষৌণীশের দিকে তাকালো। কাছে এসে গলার স্বর নামিয়ে বললো, "কী ব্যাপার চাটুয্যে মশাই ? লক্ষ্মী মনে হচ্ছে বাবুর খুবই পেয়ারের লক্ষ্মী। আপনার প্রেমে কি এও হাবুডুবু খাচ্ছে নাকি ?"

ক্ষৌণীশ চকিতে একবার সিঁড়ির ওপর বারান্দার দিকে দেখে নিল। ও

ইন্দ্রানীর চেয়েও গলা নামিয়ে বললো, "তোমাকে আগেই ওর সম্পর্কে বলেছি। শী ইজ উইডো। অল্প বয়সে তিনটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। ওর স্বামীই ছিল এই বাংলোর চৌকিদার। ওড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট লক্ষ্মীকে স্বামীর চাকরিটা দিয়ে, বাঁচিয়েছে।"

"সে কথা তো আগেই শুনেছি।" ইন্দ্রানী হেসে, চোখের তারা নাচিয়ে নিচু করে বললো "কিন্তু এক বছর আগে দেখা বাবুকে যেরকম মনে করে রেখেছে, কেমন একটু ধন্দ লেগে যায়। তারপরে ঘরের বুকিংটুকিং না থাকলেও বাবুকে যেভাবে ঘর খুলে দিতে গেল।..."

ক্ষৌণীশ হেসে বললো, ভুলে যাচ্ছো খুশি, এই নিয়ে এখানে আমি তিনবার এলাম। হ্যাঁ, ওর ওপর আমার বিশেষ সিমপ্যাথি আছে। মানুষ ভালো। অনেষ্ট। ওর হাতে খাওয়ার খরচের টাকা নিশ্চিন্তে তুলে দিতে পারো। হাতের রান্না ভালো, তোমাকে কোনো দিক থেকেই ঠকাবে না। অথচ ও ইচ্ছে করলে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারে। এই অসময়ে অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ও আমাদের বাইরে বসিয়ে রাখলেও কিছু বলবার ছিল না। অবিশ্যি বলতে পারো, এমন জায়গায় বাংলোয় ক'টা লোক আর আসে। ঠিক, কিন্তু আইনগত বুকিং-এর কাগজপত্র থাকা উচিত।

"সবই মেনে নিচ্ছি।" ইন্দ্রানীর মুখের হাসির চেয়ে চোখের দৃষ্টিতে একটি অর্থবহ হাসি ফুটলো। শরীরের একটি আলস্যের ভঙ্গি করে বললো, "তবে ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি'র সিমপ্যাথি বলে কথা। তাও আবার কোনো মেয়েকে! দেখে তো মনে হলো, উইডো লক্ষ্মী এখনো বেশ..."

ক্ষৌণীশ হেসে উঠলো। বললো, "চলো ঘরে গিয়ে তোমার কথার জবাব দেবো।"

ইন্দ্রানী মুখ খোলবার আগেই লক্ষ্মী ডান দিকের বারান্দার শেষ প্রান্তে দেখা দিল, "আসেন বাবু। ঘরের দরজা খুলে দিয়েছি। উদিককার ঘরটা খুলে দিলাম। আপনি বললে, সামনের ঘর খুলে দিতে পারি।"

"থাক লক্ষ্মী। ওদিকের ঘরটা নিরিবিলি আছে। ঐ ঘরেই আমরা থাকবো।" ক্ষৌণীশ ওর হিপ পকেট থেকে পার্স বের করলো। বললো, "বেলা দেড়টা বেজে গেছে। খিদে পেয়েছে খুব। তুমি যা পারো এ বেলার মতো ব্যবস্থা কর। রাত্রে ভালো করে খাওয়া যাবে। আর বাথরুমে জল দিতে বল। এখুনি চান করতে হবে।" ও পার্স থেকে একটি একশো টাকার নোট বের করলো।

লক্ষ্মী বারান্দা থেকে নেমে এসে একশো টাকার নোট দেখে হেসে বললো, "এতো টাকা দিচ্ছেন কেন? এ বেলা ডাল ভাত আলু ভাজা আর মুরগির মাংস। কিন্তু একশো টাকার খুচরা কি পাব?"

"পাবে পাবে।" ক্ষৌণীশ নোটটা বাড়িয়ে দিল, "এ বেলা মুরগি দিতে পারো ভালো। ডাল আর আলু ভাতে দিলেও খেয়ে নেবো। আমাদের সঙ্গে মাখন আছে। তবে মাখনের টিনটা এখানে খুলতে চাই না। গলে যাবে।

একটু কাঁচা লঙ্কা দিবে। কী বলো খুশি ?"

ইন্দ্রাণী ওর ছো' গোছা বাঁধা, পিছন থেকে রবার টেনে খুলে বললো, "খাওয়ার চেয়েও এ·শ দরকার চানের। খাবার যা পাওয়া যাবে তাতেই চলে যাবে।"

লক্ষ্মী ক্ষৌণহাত থেকে নোটটি নিয়ে বললো, "আপনি গাড়ির পেছু দিকটা খুলে দি· আমি মেয়েদের পাঠাচ্ছি, ওরা ঘরে মাল তুলে দেবে। জল ল দেবার লে এখুনি ডেকে দিচ্ছি।"

লক্ষ্মী পা য়ে চলে গেল। ক্ষৌণীশ গাড়ির দরজা খুলে ইগনিশনের মুখ থে কে চা গোছা খুলে নিয়ে গাড়ির পিছন দিকে গেল। চাবি ঘুরিয়ে হ্যান্ডেল টেটে খুললো। ইন্দ্রাণী কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বছর বারো ট ফ্রক পরা মেয়ে এলো। ক্ষৌণীশ সরে দাঁড়াতেই মেয়ে দুটি দুহাতে স্যুটকেস আর ব্যাগ তুলে নিল। ব্যাগটি যতোটা হালকা ভেবেছিল, ভারি ছিল তার বেশি। ক্ষৌণীশ হাত বাড়িয়ে ফোমের ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, "যা, তোরা বাকি মালগুলো সব ঘরে নিয়ে যা। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।" মেয়ে দুটি একবারেই দুহাতে সব মাল তুলে নিল। ক্ষৌণীশ বুটের চাবি বন্ধ করে, ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালো, "চলো, ঘরের ভেতরে যাই। চানের জল তুলে দেবে এখুনি।"

"এখানে ইলেকট্রিক নেই ?" ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "পাম্পও নেই ? সবই ম্যানুয়েল ?"

ক্ষৌণীশ হেসে বললো, "সব জায়গায় যদি যন্ত্রের সাহায্যে পেতে হয়, তা হলে আর বনে বাদাড়ে বেড়াতে এসে লাভ কী ? বৃষ্টি যদি না হয়, রাত্রে এই নিম গাছতলার চেয়ারে বসেই সময় কেটে যাবে। বাতি পাবে। ভয় নেই। গরম হবে না। সন্ধের পরেই দেখবে ঠান্ডা হয়ে এসেছে।"

ক্ষৌণীশের কথা শেষ হবার আগেই, সতরো আঠারো বছর বয়সের একটি খালি গা ছেলে এলো, পরনে ওর হাফ প্যান্ট। মাঝারি লম্বা, ছেলেটির স্বাস্থ্য বেশ শক্ত পোক্ত। ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে চেষ্টাকৃত বাঙলা আর ওড়িয়া মিশিয়ে বললো, "আমি জড় তুলে দিব।"

"চলো খুশি ঘরে যাই।" ক্ষৌণীশ ফোমের ব্যাগ নিয়ে সিঁড়িতে উঠলো।

ইন্দ্রাণী তখন গেটের দিকে দূরের আকাশে ঠেকে থাকা পাহাড়ের রেখা দেখছিল। ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে একটা আলস্য জড়ানো তৃপ্তি। হাই তুলে ক্ষৌণীশের পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকলো। বারান্দার এদিকটা অন্যরকম। খোলা উঠোন এদিকেও। অথচ সামনে না। কয়েকটি গাছপালার পরেই, দেখা যায় পিচের রাস্তা। যে-রাস্তা ধরে ওরা এসেছে। ঘরও বেশ বড়। দুটো সিঙ্গল খাটে ফোমের গদীর ওপর শুধু তোশক পাতা রয়েছে। আর দুটো বালিশ। মাথার ওপরে গুটিয়ে রাখা আছে মশারি। দুটি মেয়েই ঘরের এক দিকে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ক্ষৌণীশ তখনও

সিগারেট টানছে। ইন্দ্রাণী ঘুরে ঘুরে ঘর দেখছে। মাঝ দরজা খোলা। পাশেই রয়েছে আর একটা ঘর। ইন্দ্রাণী সামনের দিকের জানালা খুলে দিল। ঘরে ঢুকলো এক রাশ আলো।

লক্ষ্মীর সঙ্গে সেই মেয়ে দুটি এলো। তাদের হাতে কাচের গেলাস, জলের জাগ। লক্ষ্মীর হাতে ধবধবে শাদা পরিচ্ছন্ন বিছানার চাদর হলুদ বেড কভার। দ্রুত হাতে সে দুটো বিছানা তৈরি করে ফেললো। বিছানা তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘরের চেহারা গেল বদলে।

সতেরো আঠারো বছরের ছেলেটি জল ভরা কুঁজো নিয়ে ঢুকলো। লক্ষ্মী পরিষ্কার কাঁচের জাগে কুঁজো থেকে জল ঢেলে, খাটের শিয়রের কাছে ছোট টেবিলের ওপর রাখলো।

দেখেই ইন্দ্রাণী তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো। কাচের গেলাসে মুখ ঢাকা জাগ থেকে জল ঢেলে চুমুক দিল। এক চুমুকে বেশ খানিকটা জল শুষে নিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুশিতে ঝলকে উঠলো, "আঃ! কী ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল! শুধু এ জল খেয়েই আমার চলে যাবে।"

লক্ষ্মী হেসে উঠে বললো, "শুধু জল খেয়ে থাকবেন? জল আপনার পেটে থাকবে না। সব হজম হয়ে যাবে। এ জল হজমি আছে। যতো খাবেন, ততো খিদে পাবে।"

"তা হলে তো মুশকিল!" ইন্দ্রাণী হেসে বললো, "জল খেলেই যদি খিদে পায় তবে তো বেশি জল খাওয়া যাবে না।"

লক্ষ্মী আবার হাসলো। মেয়ে দুটিও হাসছিল। ঘর পরিষ্কারই ছিল। তবু ওদের একজন ঝাঁটা খুব চেপে আস্তে ঝাঁট দিচ্ছিল।

ক্ষৌণীশ তখন ফোমের ব্যাগটি একটা টেবিলের ওপর রেখে, তার মুখ খুলতে ব্যস্ত ছিল। ব্যাগ খুলে বের করলো একটি দেশি ভোদকার বোতল। গেলাস নিয়ে ঢাললো সামান্য। ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞেস করলো, "চলবে নাকি?"

"মাফ কর।" ইন্দ্রাণী ঢক ঢক করে জলের গেলাস শেষ করলো, "আমি চান করবো। এই জামা কাপড় ছাড়বো। তুমিই বা এখন আবার ওটা নিতে গেলে কেন?"

ক্ষৌণীশ লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "খাবার পেতে এখনো ঘণ্টা দেড়েক নিশ্চয় লাগবে। তার মধ্যে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাবে বলে।"

"আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাদের খাবার দিতে পারি।" লক্ষ্মী বললো, "আপনি সেই যে মুরগির মাংস দিয়ে খিচুড়ি খেতে ভালবাসেন, সেটা করলে তাড়াতাড়ি হবে। আলুও দিয়ে দেব। লংকা পাবেন। আর গাওয়া ঘি।"

ক্ষৌণীশ গেলাস তুলে ঢক করে রাশিয়ান স্টাইলে ভারতীয় ভোদকা গলায় ঢেলে দিয়ে বললো, "ওহ্ লক্ষ্মী। ওরকম করে বলো না। জিভে জল এসে যাচ্ছে। তুমি তাই রান্না কর।"

"তুমি দেখছি বাবুর পছন্দসই সবই ভালো জানো।" ইন্দ্রাণী হেসে বললো।

লক্ষ্মীও সসম্ভ্রমে হেসে বললো, "এবার নিয়ে বাবু তিনবার আসলেন, একবার পাঁচ দিন ছিলেন। বাবু বলেন লাপ্সি। বাবুর বন্ধুরাও সে লাপসি খেতে ভালবাসতেন। বাবুকে আপনি রান্না করে খাওয়ান। বাবুর পছন্দ অপছন্দ আপনি ভাল জানেন।" লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লক্ষ্মীর সঙ্গে মেয়ে দুটিও চলে গেল। বাথরুমের পিছনের দরজা খোলা ছিল। ছেলেটি টবে আর বালতিতে জল ভরছে। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালো। ইন্দ্রাণীও তাকিয়েছিল। খোলা দরজার দিকে দেখে বললো, "তোমার লক্ষ্মী আমার চুলের সিঁথির দিকে দেখছিল। কিন্তু ও ধরেই নিয়েছে, আমি তোমার..."

"আজকাল আবার ওসব কেউ দেখে নাকি?" ক্ষৌণীশ ঠোঁট উল্টে হেসে, বোতল থেকে ছোট এক পেগ গেলাসে ঢাললো, "ও সব এক সময়ের লেখকরা সেণ্টিমেণ্টাল গল্প লিখতো। সিঁদুর দিয়ে বিবাহিতা স্ত্রী প্রমাণ করা। আজকাল সবাই জানে, মিছিমিছি সিঁদুর লাগিয়েও বউ সাজা যায়। অনেক বিবাহিতা মহিলাই আজকাল সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না।"

ইন্দ্রাণী হলুদ বেড কভার পাতা বিছানায় কাত হয়ে, আধশোয়া ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিল। আঁচল পড়লো খসে। বললো, "যাই বলো, পূর্ব ভারতে এখনও সিঁদুরের খুব কদর। বঙ্গ কলিঙ্গে তো বটেই। আসামেও তাই। বিহারেও দেখেছি সিঁদুরের বেশ চল্ আছে। পশ্চিম আর দক্ষিণ ভারত আলাদা। এখন থেকে সিঁদুরের একটা কৌটো সঙ্গে রাখবো।"

"মাথায় যখন ঢুকেছে তখন রাখবেই।" ক্ষৌণীশ ভোদকার গেলাস নিয়ে ইন্দ্রাণীর মাথার কাছে বসলো, "কিন্তু তার কোন দরকার নেই। সিঁদুরের জন্য কি কিছু আটকে আছে?"

ইন্দ্রাণী বাঁ হাত বাড়িয়ে ক্ষৌণীশের কোমরে একটি চাঁটি মারলো। যতোটা লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হলো, আসলে তার চেয়ে খুশিই বেশি। হাসলেও ভুরু কুঁচকে বললো, "আমি কি তাই বলেছি নাকি? তুমি তো একটা অসভ্য!"

"তুমি যদি সভ্য হতে বলো, হতে পারি।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর বাঁ হাতটা নিজের ডান হাতে তুলে নিল। বাঁ হাতে গেলাস, "কেন না, সভ্য অসভ্য সবই তোমার হাতে। তুমি কাছে থাকলেই যে আমার অসভ্য হতে ইচ্ছে করে।"

ইন্দ্রাণী ঝটিতি ওর ডান হাত বাড়িয়ে, ক্ষৌণীশের হাত থেকে গেলাসটা টেনে নিল। ভোদকা ঢেলে দিল নিজের গলায়। ক্ষৌণীশ কিছু বলবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। ইন্দ্রাণীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। একটা শব্দ করে, এলো চুল মুখ চাপলো ক্ষৌণীশের কোলে। ক্ষৌণীশ শূন্য গেলাসটা কেড়ে নিল। ওর চোখে উদ্বেগ। বললো, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? নিট্ ভোদকা গলায় ঢেলে দিলে? জল খাবে?"

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর মাথায় হাত রাখলো। ইন্দ্রাণী কোনো জবাব দিল না। মুখ তুললো না। গলা দিয়ে একটা গোঙানো শব্দ বেরুলো। ক্ষৌণীশ হাত

চালিয়ে দিল ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের দিকে। গলার স্বর উদ্বিগ্ন "খুশি! গলার কাছে ঠেকে নেই তো? বুক জ্বালা করছে?"

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো। ঢুকলো গিয়ে বাথরুমে।

ক্ষৌণীশ উঠে গেলাস রেখে বাথরুমের দিকে গেল। থুঃ থুঃ শব্দ ভেসে এলো। ক্ষৌণীশ বাথরুমে ঢুকে দেখলো, ইন্দ্রাণী বেসিনের সামনে মুখ নিচু করে আছে। বেসিনের কলে জল নেই। ক্ষৌণীশ দেখলো, তিনটি বালতি আর একটি টব জলে ভরতি। মগ ছিল দুটো। একটা মগে জল নিয়ে ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বললো, "জল দাও মুখে।"

ইন্দ্রাণী মগটা নিয়ে মুখের ভিতর জল নিয়ে কুলকুচো করলো কয়েক বার। ছিটিয়ে দিল চোখে মুখে। ক্ষৌণীশের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "কিছুই হয়নি। ওটা যে এতো ঝাঁজালো, বুঝতে পারিনি।"

"কেমন করে বুঝবে?" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর হাত থেকে মগটা নিয়ে, বালতিতে ডোবালো। জল ভরে তুলে দিল ইন্দ্রাণীর হাতে, "তুমি কি কোন দিন নিট ভোদকা খেয়েছো নাকি? জানো, হঠাৎ একটা বিপদ ঘটে যেতে পারতো?"

ইন্দ্রাণী মুখে জল দিয়ে আবার কুলকুচো করে ক্ষৌণীশের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "বিপদ আবার কী ঘটতে পারতো? আমি কি ড্রিংক করিনে নাকি?"

"ড্রিংক তুমি কর। সে ড্রিংক আলাদা।" ক্ষৌণীশের চোখে মুখে এখনও উদ্বেগের ছায়া। "এক বোতল সোডার সঙ্গে হাফ পেগ জিন আর লাইম। বড় জোর কখনো সামান্য হুইস্কির সঙ্গে গেলাস ভরতি জল। হার্ড ড্রিংক বলতে সেটাই তুমি সময় মতো নিতে চাও না। এক গেলাস বীয়ার খেলে তোমার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। আর তুমি নিট ভোদকা ঢক করে গলায় ঢেলে দিলে?"

ইন্দ্রাণীর চোখ এখন স্বাভাবিক। হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "বেশ করেছি। তুমি যে খাও?"

"আমার সঙ্গে তোমার তুলনা চলে?" ক্ষৌণীশ ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকালো, "পাগলের মতো কথা বলছো? আমার তো অভ্যেস আছে। না না খুশি, আমি ওসব পছন্দ করিনে। বিদেশ বিভুঁয়ে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে একটা বিপদ আপদ ঘটলে, তখন কী হবে বলো তো?"

"বিপদ আপদ কী ঘটতে পারে? মরে যেতে পারি নাকি?"

"তা মানুষের জীবনের কথা কি কিছু বলা যায়? সামান্য ব্যাপারই অসামান্য হয়ে উঠতে পারে।"

"মরি তো মরবো। তাতেই বা ক্ষতি কী?"

"মরি তা মরবো বললেই হলো? তারপরে হ্যাপা পোয়াবে কে?"

"কিসের হ্যাপা?"

"পুলিশের হ্যাপা। আবার কিসের হ্যাপা? বিবাহিতা স্ত্রী হলেই রক্ষে নেই, তায় আবার প্রেমিকা! খুন যে করি নি, তা প্রমাণ করতেই জান বেরিয়ে

যাবে। তারপরে খবরের কাগজের মুখরোচক সংবাদ তো আছেই।"

ইন্দ্রাণীর মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। হাতের মগটা ছুঁড়ে ফেললো টবের জলে। ঝেঁজে বললো, "এতোই যদি ভয়, তাহলে আমাকে নিয়ে না বেরোলেই হয়? তোমার অমলকে নিয়েই এখন থেকে বেড়াতে বেরিও।" ও বাথরুমের বাইরে চলে গেল।

ক্ষৌণীশও গম্ভীর মুখে ঘরে গেল। ইন্দ্রাণী তখন পেস্ট শাম্পু আর স্নানের পর পরবার জামা বের করছে স্যুটকেস্ খুলে।

ক্ষৌণীশ কিছু না বলে, টেবিলের কাছে গেল। গেলাসে আবার ভোদকা ঢাললো। চুমুক দেবার আগে একটা সিগারেট ধরালো। বসলো ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে মোড়ার ওপর। এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। হয় তো কথাটা একটু শক্ত কথাই বলেছে। কিন্তু এখনই তার জন্য ইন্দ্রাণীকে শান্ত করার দরকার নেই। স্নানের পর ওর মেজাজ এমনিতেই অনেকটা ভালো হয়ে যাবে। পেট ভরে খাবার পরে, শান্ত হবে নিজে থেকেই। যদি একটু ঘুমিয়ে নেয়, তা হলে তো কথাই নেই। ক্ষৌণীশ নিজে এখন স্নান করে, খেয়ে শুতে চায়। সকাল থেকে গাড়ি চালিয়ে ও ক্লান্ত। সাধারণত ও নিজে এতোটা রাস্তা ড্রাইভ করে না। দুজনের এই অরণ্য ভ্রমণে, ইচ্ছা করেই ড্রাইভার নেওয়া হয়নি। ও গেলাস তুলে গলায় ঢাললো। ইন্দ্রাণী বাথরুমে গিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করলো। ক্ষৌণীশ মনে মনে বললো, "হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা!"

স্নান শেষে খাওয়াটা মন্দ হলো না। লক্ষ্মী ঘরের টেবিলেই ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীকে গরম খিচুড়ি পরিবেশন করলো। প্লেট চামচ সবই বেশ পরিষ্কার। মুরগির মাংসসহ, ডিম মেশানো খিচুড়ি রান্নাও হয়েছে চমৎকার। গাওয়া ঘি আর কাঁচা লংকা, খিচুড়ি ভোজনকে রসিয়ে তুললো নতুন স্বাদে।

ইন্দ্রাণী একটা ঝামেলা বাঁধাবার চেষ্টা করলো। বললো, "আমি পরে খাবো।"

"তা হলে আমিও তাই খাবো।" ক্ষৌণীশ তৎক্ষণাৎ কথার পিঠে কথা গুঁজে দিল।

লক্ষ্মী অবাক হলেও, বিচলিত হলো না। বরং পান খাওয়া ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললো, "গরম গরম খাবার খেয়ে নিন। আমি এত তাড়াতাড়ি আপনাদের জন্য রান্না করলাম। আপনারা না খেলে আমিও খেতে পারব না।"

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এখনো খাও নি?"

"আমার খেতে এমনিই বেলা হয়। আপনারা আসি গেলেন। আপনাদের খাবার করলাম। এবার খেতে যাবো।" লক্ষ্মী হেসে বললো।

ইন্দ্রাণীকেই আগে যেন অনিচ্ছায় খেতে বসতে হলো। ক্ষৌণীশও বসলো। দুজনেই নিঃশব্দে খাবার খেয়ে নিল। খেয়ে যে দুজনেই তৃপ্ত, তাও বোঝা গেল। ক্ষৌণীশ মুখ ধুয়ে এসে আগেই একটা সিগারেট ধরালো। এখন ওর পরনে

একটা সিলকের লুঙ্গি আর হাফ হাতা পাতলা একটা জামা। ও যখন পেট ভরে খেয়ে সিগারেট টানছে, ইন্দ্রাণী তখন বাথরুম থেকে এসে, ঘরের বাইরে বারান্দায় ক্ষৌণীশের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ক্ষৌণীশ সিগারেট শেষ করে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। বাঁ হাত তুলে কবজির ঘড়ি দেখলো। তিনটে বেজে দশ মিনিট।



ক্ষৌণীশ নিবিড় একটি ঘুম দিয়ে যখন উঠলো, তখন ওর ঘড়িতে চারটে বেজে তিরিশ মিনিট। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, পিছনের বারান্দায় রোদ এসেছে। সামনের জানলার দিকে দেখলো। উঠোনে ছায়া। ইঁদারার ধারে এই গ্রামেরই কিছু বউ মেয়ে ভিড় করেছে। ক্ষৌণীশ এ দৃশ্য আগেও দেখেছে। বাংলোয় ইঁদারার জল নিতে কাছে-পিঠের বউ মেয়েরা আসে।

ঘরের মধ্যে অন্য খাটের বিছানা শূন্য। দেখলেই বোঝা যায়, বিছানায় কেউ শোয়নি। দরজা খোলা। ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই বাইরে। সে গাড়ি চালায়নি বটে, পথের ক্লান্তি ছিল। তবু একটু বিশ্রাম করতে পারতো। ক্ষৌণীশ বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বেরিয়ে এলো। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাক-ধরা মাথার চুলে চিরুনি চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে বারান্দার আর এক প্রান্তে গেল। সেই প্রান্তে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর ঘর দেখা যায়। লক্ষ্মীর ঘরের বারান্দায় কেউ ছিল না। দুটি ছাগল ছিল দাওয়ার ওপরে। দাওয়ার নিচে শুয়ে আছে একটি কুকুর। ও ডাকলো, "লক্ষ্মী।"

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীর ফ্রক পরা মেয়ে। ওর ওড়িয়া মেশানো বাঙলা কথা থেকে বোঝা গেল, লক্ষ্মী গিয়েছে দোকানে। এখনই এসে চা করবে। ক্ষৌণীশ চায়ের কথাই বলতে গিয়েছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে এলো বাংলোর সামনের দিকে। সিঁড়ির নিচেই রয়েছে ওর গাড়ি। ওকে দেখে, ইঁদারায় জল নিতে আসা বউয়েরা মাথার ঘোমটা বড় করে টেনে দিল। কিন্তু ঘোমটার ফাঁকে ক্ষৌণীশকে দেখতে ছাড়লো না।

ইন্দ্রাণী কোথায় গেল? ক্ষৌণীশ সামনের উঠোনে, ডানদিকের গাছপালার ছায়ায় চোখ তুলে দেখলো। ইন্দ্রাণীকে দেখতে পেলো না। ক্ষৌণীশ জানে, ইন্দ্রাণীর মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে। এবং সেই বেপরোয়া ভাবের মধ্যে

কোনো যুক্তি নেই। ওর চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় অযৌক্তিক দিক হলো, কোনো যুক্তি না মানা। সবচেয়ে বড় জটিল দিক, কারোকেই পুরোপুরি বিশ্বাস না করা। এমন কি, ক্ষৌণীশকেও ও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। নতুন কেউ ওর সঙ্গে মিশলে ভাববে, জগৎ সংসার সম্পর্কে ও উদাসীন। অথচ আদৌ তা না। আসলে ওর চোখে বেশির ভাগ মানুষই স্বার্থপর। নিজের সম্পর্কে ওর কোনো উচ্চ ধারণা নেই। বরং অবচেতনে একটা নিচতার গ্লানিতে ভোগে।

ক্ষৌণীশ বোঝে, ইন্দ্রাণী যে-পরিবারে মানুষ হয়েছে, সেখানে নানান অবিশ্বাস আর অনাচারের ঘটনাই এর জন্য দায়ী। ওর নিচতায় গ্লানির দিকটাই জীবনের সর্বাপেক্ষা করুণ। ক্ষৌণীশকে গভীর করে আঁকড়ে ধরেও, ভালোবাসায় ওর বিশ্বাস নেই। কারণ ও ভালোবাসা কখনও পায়নি। যা ও পায়নি, তা ও অপরকে দেবেই বা কেমন করে। সেখানেও রয়েছে ওর সংশয়। বাইরের লোকের চেয়েও, ও সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে বাড়ির লোকদের। তার মধ্যে ওর বাবা মা প্রধান। হেন কুবাক্য নেই, যা ও ওর বাবা মা'র সম্পর্কে উচ্চারণ না করে।

ক্ষৌণীশ জানে না ওর জীবনে ইন্দ্রাণীর ভূমিকার ভবিষ্যৎ কী। ইন্দ্রাণী ওর দৈহিক আকাঙ্ক্ষার একটি সার্থক রতি প্রতিমা। অতএব ইন্দ্রাণীর প্রতি আকর্ষণও ওর প্রবল। কিন্তু অন্তরে করুণা ছাড়া, শেষ পর্যন্ত আর কী থাকবে?

ক্ষৌণীশ আপাতত এসব চিন্তা ত্যাগ করে, সিঁড়ি দিয়ে নামলো। উদ্দেশ্য ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করা। ঠিক সেই সময়েই দেখলো, বড় খোলা গেট দিয়ে লক্ষ্মী ঢুকছে। তার সঙ্গে ইন্দ্রাণী। ক্ষৌণীশ অবাক হলো না। ইন্দ্রাণীর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। লক্ষ্মীর মেয়ের কথাতেই ওর অনুমান করে নেওয়া উচিত ছিল। ইন্দ্রাণী লক্ষ্মীর সঙ্গেই বাংরিপোষির দোকানপাট দেখতে গিয়েছে। হয়তো এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দ্রাণী লক্ষ্মীকে দিদি বলতে আরম্ভ করেছে।

ক্ষৌণীশ সিঁড়ির নিচে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো। ইন্দ্রাণীকে এখন ডাকা বা ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত হবে না। এখন পর্যন্ত ওর মনের অবস্থা কী, জানা নেই। ও যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের থেকে শান্ত না হবে, ততক্ষণ ওকে না ঘাঁটানোই ভালো। ঘাঁটালে হিতে বিপরীত ব্যাপার হতে পারে। ক্ষৌণীশ জানে, ইঁদারাতলা থেকে জল নিতে আসা বউঝিয়েরা ইন্দ্রাণীকেই এখন বিশেষভাবে দেখছে। মেয়েদের কৌতূহল মেয়েদের নিয়েই বেশি। পুরুষ সম্পর্কে রমণীদের কোনো অকারণ কৌতূহল প্রায় দেখা যায় না। একমাত্র সেই পুরুষ সম্পর্কে মেয়েদের কৌতূহল, যার সম্পর্কে সে দুর্বল। অথবা কোনো কারণে যে পুরুষের ওপর সে বিদ্বিষ্ট। কিংবা যে পুরুষ তার প্রচলিত বিশ্বাসকে অবাক জিজ্ঞাসু করে তোলে।

ক্ষৌণীশ গাড়ির দরজা খুলে, অকারণেই একবার ভিতরের দিকে দেখলো। ও অলক্ষে চোখ রাখলো ইঁদারাতলার বউদের ওপর। তাদের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যাবে, ইন্দ্রাণী কোন্ দিকে কোথায় যাচ্ছে। ক্ষৌণীশ গাড়ির ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে, রিয়ার ভিউ ফাইন্ডারে পিছন দিকে দেখলো। ইন্দ্রাণীকে দেখা

গেলো না। ইঁদারাতলার বউরা তখন বাংলোর বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির দিকে দেখছিল। ইন্দ্রাণী তা হলে বাংলোর বারান্দায় উঠছে।

ক্ষৌণীশ গাড়ীর ভিতর থেকে মাথা বের করে আনলো। দেখলো ভুল অনুমান করেনি। ইন্দ্রাণী বারান্দার ওপর দিয়ে এক প্রান্তে এগিয়ে চলেছে। নিশ্চয়ই ঘরে যাচ্ছে। ইঁদারাতলার বউরা ইন্দ্রাণী আর ক্ষৌণীশ, দুজনকেই দেখছে। গলার স্বর নামিয়ে নিজেদের সঙ্গে কথা বলছে। ক্ষৌণীশ জানে এই বউয়ের দল চলে গেলেও, এখন আরও বউ-মেয়েরা আসবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আশেপাশের গৃহস্থ বউ-ঝিয়েরা জল নিতে আসে। এখন জল তোলা কলসী ভরা শেষ। কলসীকাঁখে তারা চলেছে, ইঁদারার ওপারে গাছগাছালির মাঝখান দিয়ে একটি পায়ে চলা পথে। ওদিকে তারের বেড়ার এক জায়গা দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কলসী কাঁখে যেতে পারে না। কলসী রেখে নিচু হয়ে বেড়ার ওপারে যায়। তারপরে কলসী তুলে নেয়। ওরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণী আর ক্ষৌণীশকে কথা না বলতে দেখে অবাক হয়েছে। আর সেটাই সম্ভবত এখন ওদের আলোচ্য বিষয়।

ক্ষৌণীশ হাত তুলে ঘড়ি দেখলো। মেঘলা কেটে রোদ উঠেছে। ও বারান্দায় উঠে ঘরে গেলো। দেখলো, ইন্দ্রাণী একটা খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছে। দৃষ্টি কড়িকাঠের ওপরে। ক্ষৌণীশ খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ইন্দ্রাণী মুখ ফেরালো না। ক্ষৌণীশ হাসলো। "ছোট্ট মেয়েটির রাগ কমেছে?"

"না।" ইন্দ্রাণী জবাব দিয়ে পাশ ফিরলো।

ক্ষৌণীশের মুখ উজ্জ্বল হলো। খাটের গায়ে হাঁটু ঠেকিয়ে দাঁড়ালো। উঁকি দেবার ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণীর মুখ দেখবার চেষ্টা করলো। "কখন কমবে বলে মনে হয়?"

"আমার রাগে ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জির কী যায় আসে?" ইন্দ্রাণী পাশ ফেরা অবস্থায় আর একটু সরে গেলো, "যাকে নিয়ে তার সবসময়েই দুর্নাম আর ইজ্জতের ভয়। তাকে নিয়ে কোথাও না বেরোনোই উচিত।"

ক্ষৌণীশ খাটের এক পাশে বসলো। ওর কোমর ঠেকলো ইন্দ্রাণীর গায়ে। ইন্দ্রাণী আর সরলো না। ক্ষৌণীশ ঠোঁট টিপে হাসলো, "খুশি মিত্তির মেয়েটি এতো জেনেও, এরকম আশ্চর্য ভুল করে কেমন করে, বুঝতে পারি নে। আমার যদি কোনো কারণে উদ্বেগ হয়, সেটা আমি বলবো না? আর বললেই তার অপব্যাখা হবে?"

"আমি কারোর কথার অপব্যাখ্যা করিনে।" ইন্দ্রাণী মুখ ফেরালো না। কিন্তু ওর গলা কি ভিজে উঠেছে? অথবা চোখ? তবু তার গলা শোনা গেলো, "আমি যদি ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জির স্ত্রী হতাম, আর তার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ কোনো কারণে মারা পড়তাম, তা হলে কি তিনি ভয় পেতেন। আসলে ইন্দ্রাণী মিত্তির হলো তার রক্ষিতা।"

ক্ষৌণীশ এবার হাত বাড়িয়ে একটানে ইন্দ্রাণীকে ফিরিয়ে নিলো নিজের

কোলের ওপর। "ফের বাজে কথা? তোমাকে কতদিন বলেছি, এ ধরনের বাজে কথা কোনো দিন বলবে না? কী করে তোমার মাথায় এসব চিন্তা আসে। তুমি কি আমাকে চেনো না?"

ইন্দ্রাণীর দুই চোখ জলে ভাসছে। বোঝা গেলো, ওর গলার স্বরের কান্না থম্‌কে আছে। ক্ষৌণীশ ঝটিতি নিচু হয়ে ওর ঠোঁট ছোঁয়ালো, ইন্দ্রাণীর ভেজা চোখে। জিভে লাগলো নোনা স্বাদ। সেই সময়েই সামনের জানালা দিয়ে লক্ষ্মীকে আসতে দেখা গেলো। তার হাতে চায়ের ট্রে। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, "খুশি, লক্ষ্মী চা নিয়ে আসছে প্লিজ।"

ইন্দ্রাণী আবার পাশ ফিরলো। আঁচল টেনে নিয়ে চোখে চাপলো। ক্ষৌণীশ জানে, ইন্দ্রাণীর চোখ খুব সহজেই ভাসে। ওইটি ওর সন্ধির লক্ষণ। লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে রাখলো। টি-পট, চিনি দুধের পাত্র ছাড়া, দুই জোড়া কাপ ডিস রয়েছে। নিজে থেকেই বললো, "চা বোধহয় ভালো হবে না। জানেন তো, এখানে ভাল দোকান নাই।"

"ওহ্, আমারই খেয়াল ছিল না।" ক্ষৌণীশ আফসোস করে বলল, "আমি তো কলকাতা থেকে চা নিয়ে এসেছি। জঙ্গলে যাবো সেইজন্যে। যশিপুরে ভালো চা পাওয়া যায় না। বিষরীতেও না। সেই চা-ই তোমাকে বের করে দিতে পারতাম।"

লক্ষ্মী একবার পাশ ফিরে শোয়া ইন্দ্রাণীর দিকে দেখলো। বলল, "কলকাতার চা জঙ্গলে গিয়েই বের করবেন। এখন এই চা দিয়ে চালিয়ে নেন।"

"ঠিক আছে।" ক্ষৌণীশ হাসলো, "আমার তো সব রকমই চলে।"

লক্ষ্মী বেরিয়ে যাবার আগে জিজ্ঞেস করলো, "রাত্রে কী খাবেন? মাছ তো মিলবে না। পাঁটা যদি খেতে চান, একবার দেখতে পারি।"

"পাঁঠার মাংসের দরকার কী?" ক্ষৌণীশ জানে, লক্ষ্মীর পাঁটা, মানে পাঁঠা। বললো, "এ বেলা তোমার জন্যে কে পাঁঠা কাটবে! তার চেয়ে মুরগীই করো। তার সঙ্গে গোটা দুয়েক ডিম থাকলে ভালো হয়। রুটি আর ভাত দুই-ই করো। আর যা তোমার ইচ্ছে।"

লক্ষ্মী আর একবার পাশ ফিরে শোয়া ইন্দ্রাণীকে দেখলো: "বউদি কিছু বলছেন না তো?"

"উনি যা বলেছেন, তা হলেই হবে।" ইন্দ্রাণীর প্রায় পরিষ্কার স্বর শোনা গেল।

লক্ষ্মী তার পান খাওয়া ঠোঁট টিপে হেসে ঘরের বাইরে চলে গেলো।

ক্ষৌণীশ নিজেই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। কলকাতা থেকে নিয়ে আসা চায়ের কথা মনে পড়েনি বলে একটু আফসোস হলো। টি পটের ঢাকনা খুলে দেখলো। ধোঁয়া উঠলো পটের ভিতর থেকে। ধোঁয়া নিঃশ্বাস নিয়ে গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করলো। আর সেই মুহূর্তেই ওর হাত থেকে, টি-পটের ঢাকনাটা চলে গেল অন্য হাতে। টের পায়নি।

ইন্দ্রাণী পিছনে এসে কখন দাঁড়িয়েছে, ভেজা চোখ মোছা। কপালে আর গালে এসে পড়েছে চুলের গোছা। বাঁ কনুই দিয়ে, ক্ষৌণীশকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ না ফিরিয়েই বলল, "ওসব মুরোদ আমার অনেক দেখা আছে।"

ক্ষৌণীশের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। গানের সুর করে ছড়া কাটলো, "ছেঁড়া দুটো কান, তার মুরোদ বড় মান।"

ইন্দ্রাণী মুখ না ফিরিয়েই, চা তৈরিতে মনোযোগ দিল। কিন্তু তখন ওর মুখে হাসি ফুটেছে। ক্ষৌণীশের জন্য চা তৈরি করে, টেবিলের পাশে কাপ ডিশ রেখে বলল, "চা ঠান্ডা হলে আমি জানিনে।"

" না জানলেই হলো?" ক্ষৌণীশ কপট গাম্ভীর্যে ঝেঁজে বলল, "চা ঠান্ডা হলে, আর একজনকে মেরে ঠান্ডা করে দেবো। তারপর একেবারে নিকেশ করে, পুলিশের হাতে ধরা পড়বো। তার আগে কেবল একটি কথা, চা খেয়েই বেরোতে হবে।"

ইন্দ্রাণীর পক্ষে এবার আর মুখ না ফিরিয়ে উপায় ছিল না। ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায়?"

"বিষয়ী?"

"সেটা আবার কোথায়?"

ক্ষৌণীশ টেবিলের সামনে এগিয়ে এসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। "পাহাড় ডিঙিয়ে এক সমতলের হাটে।"

"এখন আবার আমাকে জামা কাপড় বদলাতে হবে?"

"কোনো দরকার নেই। আমি তো লুঙ্গি আর এই জামা পরেই যাবো। আপনার তো দেখছি, স্নানের পর গায়ে ছিল ম্যাকসি। শাড়ি জামা কখন অঙ্গে উঠেছে, জানি নে। ঐ শাড়ি জামা-ই যথেষ্ট।" বলেই এক লহমায় ইন্দ্রাণীর গালে গাল ঘষে দিয়ে সরে গেলো।

ইন্দ্রাণী ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললো, "অসভ্য!"

"একশো ভাগ।" ক্ষৌণীশ চায়ের কাপে চুমুক দিল। "আর সেটা তোমার মুখে শুনলে, আমার আরো অসভ্য হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।" ও কাপ ডিশ হাতে ইন্দ্রাণীর দিকে দু'পা এগোলো।

ইন্দ্রাণী খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, "দরজা খোলা আছে। বাড়াবাড়ি করো না।"

"দরজা খোলা থাকলেও এখন কেউ এদিকে আসবে না।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর দিকে আর না এগিয়ে বললো, "তবে আমার অভিধানে, কোনো কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি বলে কোনো শব্দ নেই।"

ইন্দ্রাণী কাপ তুলে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারলো না। ওর চোখে দ্যুতি। হেসে উঠলো, "তা কি আর জানিনে? বাড়াবাড়ি করাটাই যার স্বভাব তার অভিধানে ঐ শব্দটা থাকবে কেমন করে।"

"আর ইন্দ্রাণী মিত্তির তো বাড়াবাড়ির কিছুই জানে না।" ক্ষৌণীশ ঠোঁট

টিপে হাসি চাপলো, "এমনকি যথা সময়ে রিঅ্যাক্ট পর্যন্ত করে না।"

ইন্দ্রাণী আবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। ওর মুখ হয়ে উঠলো আরক্ত। চায়ের কাপ রেখে, ক্ষৌণীশের কাছে প্রায় ছিটকে গিয়ে, পিঠে গুপ্ গুপ্ মারলো কিল, "অসভ্য! যা মুখে আসছে তাই বলছো? নির্লজ্জ..."

"আরে, কাপ থেকে চা চলকে পড়ে যাবে।" ক্ষৌণীশ হাতের কাপ সামলাতে ব্যস্ত হলো। ওর মুখে হাসির ছটা। সত্যি চা চলকে পড়ে যাচ্ছিল কাপ থেকে।

ইন্দ্রাণীর লজ্জারক্ত মুখেও প্রচ্ছন্ন খুশির হাসি, "পড়ুক। তুমি চুপ করবে কি না বলো।"

"চুপ।" ক্ষৌণীশ কাপ সুদ্ধ হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলো। "এখন থেকে আমি একদম বোবা। কেবল আমাকে যেন কেউ অসভ্য না বলে। বললেই আমার অসভ্যতা বেড়ে যায়। যদিও সেটা মোটেই অসভ্যতা না। মানুষের পবিত্র প্রবৃত্তিজাত ইয়ে, মানে..."

ইন্দ্রাণী আবার চায়ের টেবিলের কাছে ফিরে গিয়েছে। বলল, "ইয়ে টিয়ে কিচ্ছু নয়। স্রেফ অসভ্যতা। অসভ্যতা অসভ্যতা অসভ্যতা।" ও চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল।

"ঠিক আছে।" ক্ষৌণীশ চায়ের কাপে চুমুক দিল, "আমিও যথাসময়ে প্রমাণ করে দেবো, অসভ্যতা বলে কিছুই নেই। তুমি যাকে অসভ্যতা বলছো, সেটা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত! এমন একটা সময়ে প্রমাণ করবো, যখন .."

ইন্দ্রাণী চায়ের কাপ নামিয়ে আরক্ত মুখে হেসে বললো, "উহ্! বাইরে এলেই তুমি যে কী হয়ে ওঠো। তোমাকে নিয়ে আমি আর পারিনে। দোহাই তোমাকে কোনো সময়েই কিছু প্রমাণ করতে হবে না। আমিই তোমার কাছে হার মানছি।"

"ওটাকে হার মানা বলে নাকি?" ক্ষৌণীশের চোখে কৌতুকের ছটা, "আমি তো জানি .."

ইন্দ্রাণী আবার ছিটকে এলো ক্ষৌণীশের কাছে। ওর দুই ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিল, "'আর একটি কথা বললে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো।"

"ক্ষৌণীশ, বেততামিজ! খামোশ।" ইন্দ্রাণীর হাত চেপে দেওয়া মুখ থেকে, ক্ষৌণীশের কথাগুলো উচ্চারিত হলো গোঙানির মতো।

ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হেসে উঠলো। ক্ষৌণীশের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে গেলো। কাপ তুলে চুমুক দিয়ে বলল, "বিষয়ী না কোথায় যাবে বললে? দেরী হয়ে যাবে না?"

"কিছু মাত্র না।" ক্ষৌণীশ শূন্য চায়ের কাপ টেবিলে রেখে দিল। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল। সিগারেট ধরিয়ে, তুলে নিল চাবির গোছা। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল,

"তুমি এসো। আমি লক্ষ্মীকে বলছি, আমরা বেরোবো। ও যেন ঘরে তালা লাগিয়ে পাহারা রাখে।"

ইন্দ্রাণী ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘাড় ঝাঁকালো, "চলো যাচ্ছি।"

ক্ষৌণীশ বাইরে বেরিয়ে, লম্বা বারান্দার এক দিকের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেলো। লক্ষ্মীর ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকলো, "লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো, "কিছু চাইছেন?"

"না। আমরা একটু বেরোচ্ছি। তুমি ঘরের দিকে নজর রেখো।"

লক্ষ্মী হেসে বললো, "নজর আমার ঠিক থাকবে।"

ক্ষৌণীশ ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে, ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলো। ব্যাক করে, নিম গাছটাকে পাক দিয়ে, গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলো আবার সিঁড়ির কাছে। গাড়ির মুখ এখন গেটের দিকে।

লক্ষ্মী এগিয়ে এলো লম্বা বারান্দার এক পাশ থেকে।

ইন্দ্রাণী নেমে এসে দাঁড়ালো গাড়ির বাঁ দিকে। ক্ষৌণীশ তখনও গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করেনি। বাঁদিকে ঝুঁকে দরজা খুলে দিল। ইন্দ্রাণী ঢুকে বসে দরজা বন্ধ করলো।

ক্ষৌণীশ গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়েও থমকে গেল। হতবাক চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালো। ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের দিকে তাকালো না। মুখে ওর টেপা হাসি। ঠোঁটে চোখে কোনো প্রসাধনই নেই। গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছে, "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না। বেলা হলো মরি লাজে..."

"ঐ জিনিস তা হলে সঙ্গে করে এনেছিলে?" ক্ষৌণীশের অবাক দৃষ্টি ইন্দ্রাণীর চুলের মাঝখানের সিঁথিতে।

ইন্দ্রাণী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "তা এনেছি। বলিনি ইচ্ছে করেই। কখন কী দরকার পড়ে, কিছু বলা যায়?"

"তা এখন হঠাৎ দরকার পড়লো কেন?"

"দরকারের চেয়ে বড় কথা, ইচ্ছে করলো। খারাপ দেখাচ্ছে?"

"অসাধারণ লাগছে খুশি। নিজেকে আমার সত্যি নতুন বিবাহিত মনে হচ্ছে।"

"তোমার ব্যবহার নতুন বরের চেয়েও নতুন।" কথাটা বলতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর মুখে আবার রক্তের ছটা লেগে গেলো। "গাড়ি চালাও। বসে রইলে কেন?"

ক্ষৌণীশ তখনও অবাক মুগ্ধ চোখে ইন্দ্রাণীর লাল টকটকে সিঁথির দিকে তাকিয়েছিল। ইতিপূর্বে ইন্দ্রাণী কপালে সিঁদুরের টিপ পরেছে। সিঁথিতে কোনো দিন সিঁদুর দেয়নি। সামান্য একটি সিঁদুরের রেখা অনেক দেখা মুখ

আর চেহারাকেও কতোখানি বদলে দিতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ক্ষৌণীশ গাড়ি স্টার্ট করলো। কিন্তু ওর অবাক মুগ্ধ চোখে আস্তে আস্তে ছায়া নেমে এলো। অমলের মুখ মনে পড়ছে।

"কি ভাবছো বলো তো?" ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো।

গাড়ি তখন বাংলোর ডানদিকে ঘুরে সমতল দিয়ে এগোচ্ছে। দুপাশে সবুজ শস্যের মাঠ। ক্ষৌণীশ হেসে মিথ্যা কথা বললো, "তোমার সিঁথির ঐ সিঁদুরকে কি স্থায়ী করা যায় না?"

"বলা উচিত ছিল অক্ষয় করে রাখা যায় কি না।" ইন্দ্রানী হেসে বললো, "সিঁথের সিঁদুর না দিয়েও কি কিছু আটকে রয়েছে?"

ক্ষৌণীশের ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট কাঁপছে। ও আস্তে মাথা নাড়লো, "আমি সেই ভেবে কিছু বলিনি। হয় তো আমার মধ্যে হিন্দু কুসংস্কার কিছু রয়েছে। তোমার এই দশা আমার কাছে অনেক সুন্দর। মনে হয়, তুমি সত্যি আমার।"

"তাই বুঝি?" ইন্দ্রানী ঘাড় কাত করে ক্ষৌণীশের দিকে তাকালো, "আমি তাহলে কার? সিঁথেয় সিঁদুর পরিনি বলে কি এই দুবছরের মধ্যে তুমি আমাকে তোমার নিজের বলে ভাবতে পারোনি?"

ক্ষৌণীশ গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। মুখ থেকে সিগারেট খুলে ফেলে দিল বাইরে। সামনে পাহাড়ী ঘাট রোডের চড়াই শুরু হয়েছে। বলল, "কথাটা তুমি বুঝতে পারোনি। নিশ্চয়ই তোমাকে আমার করে পেয়েছি। তোমাকে ছাড়া আমি আমার জীবনকে ভাবতে পারি নে। কিন্তু সিঁথের সিঁদুরের মর্যাদাই আলাদা। সবদিক থেকেই যেন একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।"

"তা হলে সেটা তোমার হিন্দু কুসংস্কারই বলতে হবে।" ইন্দ্রাণী হাসলো, "সিঁথের সিঁদুর দিয়ে তোমার আমার সম্পর্ক বিচার হবে না। আমি তা হলে তোমার কী দেখে, আমার স্বামী বলে ভাবতে শিখেছি? তোমাকে তো কোনো ফোঁটা কাটতে হয়নি। কোনো চিহ্নও ধারণ করতে হয়নি। তোমার ভালোবাসাই তোমাকে আমার স্বামী করেছে। বাইরের জগতের কাছে আমি কোনো চিহ্ন বজায় রেখে বোঝাতে চাইনে, ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি আমার কে? তার সঙ্গে মিশেই বুঝিয়ে দেবো, সে আমার কী, আর কে।"

ক্ষৌণীশ গাড়ির গতি আরও কমিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং থেকে বাঁহাত তুলে ইন্দ্রাণীর দিকে বাড়িয়ে দিল। ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের সেই হাতটি দুহাতে ধরে মুখ নিচু করে ঠোঁট ছোঁয়ালো। ক্ষৌণীশ বাঁ হাত ইন্দ্রাণীর মাথায় ছুঁইয়ে আবার স্টিয়ারিং ধরলো।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ গো, আমরা পাহাড়ের ওপর উঠছি, না?"

"হ্যাঁ।" ক্ষৌণীশ মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেও, আবার অমলের মুখ ওর মনে পড়লো। বললো, "এই পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা যাবো সমতলের বিষয়ীতে।"

ক্ষৌণীশ গাড়ির গতি আগের চেয়ে কিছুটা বাড়ালো। ইন্দ্রাণী অনুমান করলো, পাহাড়ী রাস্তা বলেই ক্ষৌণীশ মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। আসলে ইন্দ্রাণীর "হ্যাঁগো" সম্বোধনে, অমলের মুখই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এমন না, ইন্দ্রাণী এই প্রথম ওকে এরকম সম্বোধন করলো। অনেক-দিন ধরেই করছে। এবং করলেই চকিতে অমলের কথা মনে পড়ে যায়। অমলের মতো, ইন্দ্রাণীও ক্ষৌণীশকে নাম ধরে ডাকে না। বাইরের লোকের কাছে মিঃ চ্যাটার্জি বলে। অথবা মিঃ আর্কিটেকট্। অমল, শুনছো, ও গো, হ্যাঁ গো ছাড়া কিছুই বলতে পারে না। অন্য লোকের কাছে, 'ও' অথবা 'তিনি' বলে। ইন্দ্রাণীর এই উচ্চারণে, বা ওর সিঁথের সিঁদুর দেখে, ও একদিকে যেমন খুশি, তেমনি অমলের কথা মনে পড়ার ভিতর দিয়েই প্রমাণ হয় ওর ভিতরে একটা অপরাধবোধকে কিছুতেই একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি।

ক্ষৌণীশের এই অপরাধবোধের মধ্যে কতোটা হিন্দু ভাবনার দ্বারা আক্রান্ত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হিন্দু ভাবনায় পাপবোধ আছে। পাপ করলে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুক্ত হওয়া যায়, হিন্দুর পাপ চিন্তার কনসেপট্ এই রকম। কিন্তু হিন্দুর মধ্যেই আছে ভোগ মোক্ষের বিশ্বাস। ভোগের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ। অবিশ্যি ভোগ মোক্ষের ধারণা সাধারণ হিন্দু মানুষের জন্য না। হিন্দু এবং বিভিন্ন সহজিয়াপন্থী সাধকদের সাধন মার্গের পথ হলো ভোগ মোক্ষ। ক্ষৌণীশ সাধক না। অতএব, ভোগ মোক্ষের ভাবনা ওর মনে ঠাঁই পেতে পারে না। একজন সংবেদনশীল ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ ও অন্যায় বোধ যেরকম কাজ করে, ওর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। এই অপরাধবোধের দ্বারাই সেটা প্রমাণিত ক্ষৌণীশ নিজেও তা জানে না। সেটা আছে ওর অবচেতনে। যা হয়তো ও নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস করতে পারবে না। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে যে একটা বিরাট অন্তঃসারশূন্যতা রয়েছে দেহভোগ ও আসক্তির নিবিড়তায়, সেটা অজানা রয়ে গিয়েছে।

ক্ষৌণীশ পাহাড়ী পথের বাঁয়ে বেঁকে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালো। পাঞ্জাবির পকেটেই ছিল কিছু খুচরো টাকা। তার থেকে একটি দু টাকার নোট ভাঁজ করে, ডান দিকে ছুঁড়ে দিল। সেখানে বৃহৎ এক গাছের নিচে, ছোট একটি ঝোপড়ির মধ্যে রয়েছেন সিঁদুর মাখা হনুমানজীর মূর্তি। মূর্তিটি মৃন্ময়! একটি পাথরও আছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর বাঁধানো পট।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "এখানে কি আছে?"

"খুশি, কী যে অছে, তা বলতে পারবো না।" ক্ষৌণীশ নিজেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো এবং হেসে বলল, "হনুমানজীর মূর্তি আছে। একজন বা দুজন পুরোহিত পুজারিও আছে। যারা এ পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায়, তা সে ট্রাক লরি বাস প্রাইভেট যাই হোক, সবাই এই দেবতার থানে কিছু দেয়। এরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এ দেবতা প্রসন্ন থাকলে, গাড়ির অ্যাকসিডেন্টই হবে না। আমি যতোবার এ পথ দিয়ে গিয়েছি, তখন আমিও

আর সকলের মতোই কিছু দক্ষিণা দিই।"

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বলল, "তাহলে আমি একবার দর্শন আর প্রণাম করবো।"

"সাবধানে রাস্তা ক্রস করো।" ক্ষৌণীশ সাবধান করে বলল, "হঠাৎ ঘাড়ের ওপর যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। অবিশ্যি এখানে সব গাড়িই স্পিড কমিয়ে দেয়।"

ইন্দ্রাণী গাড়ি থেকে নেমে, দেবস্থানে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে, মাথা ঠেকালো ভূমিতে। উঠে যখন দাঁড়ালো, তখন পূজারি পুরোহিত ওর সামনে। হাতে তার একটি গোলা সিঁদুরের পাত্র। সে তার সিঁদুর লাগানো হাতের অনামিকা তুলে বললো, "ঠার যাইয়ে মাতাজী। দেওতা কি সিঁদুর লিজীয়ে।" সে ইন্দ্রাণীর কপালে একটি টিপ পরিয়ে দিল, "ভগবান আপকো আয়ুস্মতী বানাওয়েঙ্গে।"

ইন্দ্রাণীর চোখেমুখে ভক্তি ফুটে উঠলো। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। ফিরে তাকালো ক্ষৌণীশের দিকে। চোখে ওর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ক্ষৌণীশ দেখলো, ইন্দ্রাণীকে সত্যিই নববিবাহিতা কনে বউয়ের মতো দেখাচ্ছে। মাথায় কেবল ঘোমটা নেই। ওর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখেই, ক্ষৌণীশ ব্যাপারটা বুঝে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আরও দুটি টাকা বাড়িয়ে ধরলো। ইন্দ্রাণী সেই টাকা নিয়ে পূজারির হাতে দিল। পূজারি আবার ওকে আশীর্বাদ করলো। ও ফিরে এসে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করলো। ক্ষৌণীশ গাড়ি স্টার্ট করলো। ওর মুখে কৌতুকের হাসি। ইন্দ্রাণী ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "হাসছো কেন?"

"একটা খুব মজার কথা মনে পড়ে গেল।" ক্ষৌণীশ হাসতে হাসতেই বললো, "তুমি আমাদের ফার্মের চিফ অ্যাকাউন্টটেন্ট মিঃ মুখার্জিকে চেনো তো?"

ইন্দ্রাণী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, "চিনি বই কি। ভদ্রলোককে চোখেও দেখেছি।"

"এবার তাহলে মিঃ মুখার্জির চেহারাটা মনে করো।"

"যেমন লম্বা তেমনি মোটা।"

"আর ভাবো, ভদ্রলোকের কী বিশাল পশ্চাদ্দেশ!" ক্ষৌণীশ বলল, "আমি তো আমার অফিসের স্টাফদের নিয়ে দুবার সিমলিপাল বেড়াতে এসেছি। তুমি জানো। মিঃ মুখার্জিও একবার এসেছিলেন। সেবার আমাদের সঙ্গে তিনটি গাড়ি ছিল। আমরা ঐ দেবতার থান থেকে একটু দূরে গাড়ি তিনটি পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে পার্ক করেছিলাম। সবাই প্রায় তোমার মতোই হাঁটু গেড়ে বসে দেবতাকে প্রণাম করেছিল। মিঃ মুখার্জিও করেছিলেন, তবে একটু বেশি সময় নিয়ে। রাস্তা এমন আটকে গেছলো, দুদিক থেকে আসা, সব লরি ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেতে গেলে, মিঃ মুখার্জির পশ্চাদ্দেশে আটকে যাবার ভয়।"

ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হেসে উঠে, ক্ষৌণীশের উরুর ওপর কয়েকটা কিল বসিয়ে দিল। "তুমি মিথ্যে কথা বলছো।"

"বিশ্বাস করো খুশি আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে।" ক্ষৌণীশের সারা মুখে হাসির ছটা, "প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পরেও মিঃ মুখার্জি ওঠেননি। আর সবাই তাঁর ভক্তি দেখে, কিছুই বলতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত আমাকেই মুখ খুলতে হয়েছিল। খুব গলা নামিয়েই বলেছিলুম, মিঃ মুখার্জি, আপনি না উঠলে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না। শুনেই, মিঃ মুখার্জি উঠে বলেছিলেন, সরি। আসলে কি মনে হলো জানেন। ও দেবতা ভারি জাগ্রত। সেইজন্যেই একটু ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলুম।"

ইন্দ্রাণী আবার খিলখিল শব্দে হেসে উঠলো। তারপরেই হাসি থামিয়ে ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তার মানে, আমিও কি মিঃ মুখার্জির মতো গাড়ির রাস্তা বন্ধ করেছিলাম?"

"মোটেই না।" ক্ষৌণীশ হেসে বলল, "তোমার চেহারা আর মিঃ মুখার্জির চেহারা! কী যে বলো তুমি। তবে সত্যি কথাই বলছি, তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে দেখেই মিঃ মুখার্জির ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।"

ইন্দ্রাণী আবার ক্ষৌণীশকে মারবার জন্য হাত তুললো। কিন্তু গাড়ির দু'পাশে তখন লোকজনের ভিড়। ইন্দ্রাণীকে বাধ্য হয়েই হাত নামিয়ে নিতে হল। ক্ষৌণীশ গাড়ি রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে বলল, "এ জায়গার নাম হচ্ছে বিষয়ী। একটু নামবে নাকি?"

"নেমে?"

"অনেক দোকানপাট আছে। যদি কিছু কেনাকাটা করতে চাও।"

"নেমে জায়গাটা দেখতে পারি। এখানে আবার কী কেনাকাটা করবো?"

"তা হলে তা-ই চলো।" ক্ষৌণীশ গাড়ির চাবি হাতে নিল। দুজনেই গাড়ি থেকে নামল। জায়গাটার চেহারা অনেকটা গঞ্জের মতো। এবং বস্তুতপক্ষে তাই। গরু মহিষের গাড়ি, সাইকেল রিকশা আর বাসও যাতায়াত করছে। নানারকমের দোকানপাট ছাড়াও এক দিকে খালি চালাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, ওখানে হাট বসে। ক্ষৌণীশ সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ঘুরে যাওয়া চওড়া রাস্তা দেখিয়ে বলল, "এ রাস্তা গেছে যশিপুরের দিকে। আমরা কাল সকালে এই পথেই যাবো।"

"হ্যাঁ গো, ওখানে হাঁড়ি নিয়ে বসে মেয়েরা কী বিক্রি করছে? ইন্দ্রাণী রাস্তার অন্য দিক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ক্ষৌণীশ দেখে হেসে বললো, "ওরা একরকম পানীয় বিক্রি করছে। খাবে নাকি?"

"পানীয়? কী পানীয়?"

"ডিয়েং।"

"ডিয়েং? সেটা আবার কী?"

"হাঁড়িয়াও বলে। তবে খাঁটি বাঙলায় হলো পচুই।"

"মানে সেই ভাত পচিয়ে..." কথাটা শেষ না করেই, ইন্দ্রাণী নাক কুঁচকে আঁচল মুখে চাপলো, "তুমি নিশ্চয়ই খেয়েছো?"

ক্ষৌণীশ বললো, "না বললে নির্জলা মিথ্যে বলা হয়। আমি আদিবাসীদের ঘরে বসেই হাঁড়িয়া খেয়েছি। বেশ বড় কাঁসার জাম বাটিতে করে খেয়েছি। গন্ধটা মোটেই সুবিধের নয়। স্বাদও টক মতো। ওকে একবার গিলে ফেলতে পারলে, সাহেবি ভাষায় 'রাইস বীয়র' বেশ ভালোই জমে। তবে তার সঙ্গে মুখরোচক তেলেভাজা থাকলে ভালো। পানীয়টিতে ফুড ভ্যালুও অনেকখানি।"

"মাথায় থাকুক আমার ফুড ভ্যালু।" ইন্দ্রাণী নাক কুঁচকে বলল, "ভাত পচে গেলে আমি তার গন্ধ শুঁকতে পারিনে। তার ওপরে আবার পচুই! তুমি যেন একটা আলাদা কী নাম বললে?"

"ডিয়েং। ওটা হল মুন্ডারি শব্দ।"

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীকে আশেপাশের লোকজন কৌতূহলিত হয়ে দেখছিল। ক্ষৌণীশ বললো, "লুঙ্গি পরে বাইরে এসে লজ্জা করছে। চলো ফিরি। আমাদের যা কেনাকাটা করা বাকি আছে, তা যশিপুরে গিয়েই করে নেবো।"

দুজনেই গাড়ির কাছে ফিরে চললো।

পরের দিন স্নান আর প্রাতঃরাশ শেষ করে ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণী সকাল প্রায় পৌনে নটায় যশিপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।



ক্ষৌণীশ নিজে থেকেই, ইন্দ্রাণীর বিষয় কোনো দিন অমলকে বলেনি। কিন্তু ক্ষৌণীশ বুঝতে পারছিল, বাঘ যেমন করে তার শিকারকে চক্কর দেয়, আর ক্রমাগত অদৃশ্য থেকে কাছে এগিয়ে আসতে থাকে, সেই ভাবেই ও অমলের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছিল। অথচ অমল কোনোদিনই নিজে থেকে কারোর কাছে কিছু জানতে চায়নি। ক্ষৌণীশের মনে বরং একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল অমল চারদিক থেকে ওর আর ইন্দ্রাণীর সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে। ক্ষৌণীশের সে চিন্তাও এসেছিল, ওর ভিতরের অপরাধ বোধ থেকে। এক বছরের মধ্যেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে দাঁড়িয়েছিল অমলকে কেউ যেচে কোনো খবর না দিলেও তা একজন অতি সাধারণ স্ত্রীর পক্ষেও অনুমান করা অসম্ভব ছিল না।

ক্ষৌণীশ লক্ষ্য করেছিল, অমলের মুখে কেবল ছায়া ঘনিয়ে আসেনি।

অমলের চোখের কোলে গভীর পরিখার দাগ পড়েছিল। মনে হতো ওর মুখে যেন কেউ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। যে-কেউ দেখলে চমকে উঠে ওকে জিজ্ঞেস করতো। ও কোনো গুরুতর অসুখে ভুগছে কি না। অসুখটা গুরুতরই ছিল। তবে সেটা মানসিক। এবং তা অমলের দেহকেও আক্রমণ করছিল ধীরে ধীরে।

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীতে যতই মেতে থাকুক, ও নিতান্ত বুদ্ধিহীন ছিল না। ওর সঙ্গে অমলের একটা দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। দেহ সেখানে অনুপস্থিত থাকতো না। প্রায় নিয়মিত একটা যোগাযোগ ওদের ছিল। অমল যতো দিন অন্ধকারে ছিল, ততদিন ও স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপরে ও আস্তে আস্তে ক্ষৌণীশের শয্যার অংশ থেকে কবে সরে দাঁড়িয়েছিল, স্বামী তা খেয়াল করেনি। যবে থেকে মমতা রায়চৌধুরী অমলের কানে কথাটা তুলেছিলেন, তখন থেকেই ওর সমস্ত অনুমান আর অনুভূতিগ্রাহ্য সংশয় দূর হয়েছিল। তবু ও কোনো কথাই ক্ষৌণীশকে জিজ্ঞেস করেনি। ও প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করতো ক্ষৌণীশ ক্রমাগত ওর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। ওর চোখের কোলে যখন কালি পড়ছিল, ক্ষৌণীশকে তখন দেখাতো অনেক বেশি উজ্জ্বল। অথচ বাড়িতে ওর কথা কমে গিয়েছিল। সংসারে থাকতে গেলে যে কিছু কথা থাকতে পারে, ক্ষৌণীশের তা মনে থাকতো না। যে ছেলেমেয়েদের ওপর ওর গভীর আকর্ষণ, তাদের সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেওয়া কমে গিয়েছিল। ছুটির দিনগুলোয় পর্যন্ত ক্ষৌণীশ কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে বেরিয়ে যেতো।

ক্ষৌণীশ বম্বের নাম করে ব্যাঙালোরে গিয়েছিল। ওর মতো বুদ্ধিমান মানুষ এ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল সুরেন্দ্র পাটিল কোনো কারণে কলকাতায় টেলিফোন করলেই সমস্ত ব্যাপারটির গোপনীয়তায় নানা সন্দেহ আর জিজ্ঞাসা দেখা দেবে। এবং ঘটেওছিল সেই রকমই। ও বলতে পরেনি, আসলে ও ব্যাঙালোরেও যায়নি। ইন্দ্রাণীকে নিয়ে গোয়ার নির্জন সমুদ্র সৈকতের এক পান্থশালায় দিন যাপন করছিল। ভেবেছিল, গোয়া থেকে বম্বে ফিরে যাবে। কেবল ভাবেনি, বম্বের অফিসে বাস্তবিকই ওর ডাক পড়তে পারে। তিন রাত্রি পরে যখনই কথাটা মনে হয়েছিল, তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রাণীকে নিয়ে প্লেনে বম্বে ফিরে এসেছিল। সাধারণত বম্বেতে ওর অফিস সংলগ্ন ছোট একটি বাসযোগ্য ফ্ল্যাট ছিল। ও বম্বের কোনো কাজে গেলে সেখানেই থাকতো। সুরেন্দ্র পাটিল থাকতো তার পরিবারের সঙ্গে মালাডে। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে নিয়ে হোটেলে উঠেছিল। অফিসে গিয়েছিল আর গিয়েই শুনেছিল, একটা বড় কাজ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। কাজটা যেমন লাভজনক, তেমনি জরুরিও ছিল। সুরেন্দ্র সেই কারণেই কলকাতায় টেলিফোন করেছিল। নিয়মও ছিল সেইরকম। কোনো জরুরি প্রয়োজন পড়লেই ওকে কলকাতায় টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হবে। ব্যাপার বুঝে ক্ষৌণীশ আগেই এস, টি,

ডি, তে কলকাতা টেলিফোন করে ওর ব্যাঙালোরে যাবার কথা জানিয়েছিল।

ক্ষৌণীশ অনুমান করতে পারেনি, ও কেবল অমলের প্রাণে আঘাত করেনি। ওর বিশ্বস্ত সুরেন্দ্র আর ব্যাঙালোরের বীরভদ্রকেও সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। কলকাতার অফিসের সবাই সব খবরই জানতো। মমতার পরোপকারের দৌরাত্ম্যে অমলেরও কিছু অজানা ছিল না। অমল সেই প্রথম ক্ষৌণীশকে বলেছিল, "বম্বে যেতে গিয়ে ব্যাঙালোরেই যদি যেতে হয়েছিল, সে-কথাটা তো তুমি তোমার বম্বে আর কলকাতার অফিসকে জানিয়ে দিতে পারতে। জানাও নি কেন?"

"সব সময় সব কিছু আমার মনে থাকে না।" ক্ষৌণীশ কিছুটা নির্বিকার অথচ যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, "একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছিলুম বম্বে। এমন সময় খবর আসে ব্যাঙালোর যেতে হবে। তাই ব্যাঙালোর গেছলুম। দেরি হলেও সে-কথা তো বম্বে থেকে জানিয়েছি।"

ক্ষৌণীশের মিথ্যা কথায় অমল অবাক হয়েছিল। অথচ অবাক হবার আর কিছু ছিল না। ক্ষৌণীশ তখন নিজেকেই হারিয়ে বসেছিল। অমলের দ্রুত পরিবর্তন তখন থেকেই দেখা গিয়েছিল। ক্ষৌণীশকে সুপ্রিয় বলেছিলেন, "তোমার কি ধারণা, তোমার আর ইন্দ্রানীর বিষয় অমল কিছুই জানে না?"

"আমি অন্তত সেরকম প্রমাণ কিছু পাইনি।" ক্ষৌণীশ জবাব দিয়েছিল।

সুপ্রিয় হেসেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা কিছুই বলেননি। কেবল আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, "ক্ষৌণীশ, আমার মনে হয়, তুমি ভুল করছো। আমি আমার দুর্বলতার কথা জানি। আর তুমিই আমাকে এক সময়ে সাবধান করেছিলে। আমি আর সেপথে যাইনি। তোমার বউদির পক্ষে কোনোকালেই আমার সেই ব্যভিচারের কথা জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তুমি যেভাবে মিশছো, অমল তার কিছুই জানবে না, এরকম ধারণা করার যুক্তি কী হয়।"

"যুক্তি হলো এই, আমি অমলকে চিনি।"

সুপ্রিয় ভ্রুকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার সেই চেনাটা কী রকম, জানতে পারি?"

"অমল চেপে রাখতে পারতো না। আমার কাছে বলে ফেলতো। অথবা কথা বললে কেঁদে ফেলতো।"

সুপ্রিয় বিমর্ষ হেসে বলেছিলেন, "তোমার মতো পুরুষ এরকম ভুল করবে, আমি ভাবতে পারি নে। আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয় বলেই বলছি, তুমি যখন বম্বের পরিবর্তে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে গোয়া গেছলে, সে সময়েই ইন্দ্রাণীও যে ছুটি নিয়েছিল, অমলের কানে সে-কথা বোধহয় কেউ তুলেছে।"

"অমল তো ইন্দ্রাণীর অস্তিত্বের কথাই জানে না।" ক্ষৌণীশের তখনও ছিল মূঢ় আত্মবিশ্বাস। "কে ইন্দ্রাণী, আর সে তার অফিস থেকে ছুটি নিলেও

আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে, অমল তা জানবে কেমন করে?"

সুপ্রিয় হেসে বলেছিলেন, "তোমার কি ধারণা, কলকাতার কেউ ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জির মতো মানুষের কোনো খবর রাখে না?"

"আপনি তো জানেন সুপ্রিয়দা, আমি ইন্দ্রাণীকে নিয়ে প্রথম দিকে যাও বা দু চার বার এ ক্লাবে ও ক্লাবে গেছি, একসময় তাও বন্ধ করে দিয়েছি।" ক্ষৌণীশ ওর যুক্তি দেখিয়েছিল। "আমি খুশিকে নিয়ে হোটেলের ঘরে যাই। তাতে অবিশ্যি আমার খরচ অনেক বেড়েছে। ক্লাবের ঘরে গিয়ে থাকলে অনেক কম খরচ পড়তো।"

সুপ্রিয় চৌধুরি ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, "কলকাতার হোটেল সম্পর্কে তোমার এ ধারণা কেন হলো, সেখানে গেলে তোমার হদিস কেউ করতে পারবে না? তা ছাড়া মিত্তির পরিবার হচ্ছে রাবণের বংশ। এদের লোক কোথায় যায় আর যায় না, কেউ বলতে পারে না। আর মিত্তিরদের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক আর শরিকি ঝগড়া বিবাদ। প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক পরিবারের কেচ্ছা গেয়ে বেড়ায়। সেদিক দিয়েও তোমার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর মেলা-মেশার খবর অমলের কানে যেতে পারে। তুমি অমলকে যতোটা চেনো বলে দাবি করছো, হয় তো ততটা নাও জানতে পারো।"

"সত্যি করে বলুন তো সুপ্রিয়দা, আপনি এতো কথা বলছেন কেন?" ক্ষৌণীশের মনে শেষ পর্যন্ত খটকা লেগেছিল। "আপনি কি সেরকম কিছু শুনেছেন?"

সুপ্রিয় তাঁর স্ত্রী মমতাকে বাঁচিয়ে ক্ষৌণীশকে বলেছিলেন, "শুনেছি বলেই বলছি। ইন্দ্রাণীর এক আত্মীয় আমাকে টেলিফোন করে বলেছে, ক্ষৌণীশ চ্যাটার্জি নামে এক বড়লোকের সঙ্গে ইন্দ্রাণী মেলামেশা করছে। আমি যদি এর কোনো বিহিত না করি, তাহলে সে অমল চ্যাটার্জিকে টেলিফোন করে সব জানিয়ে দেবে। লোকটি আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখায়নি। সে আমাকে পরে জানিয়েছে, অমলকে সে টেলিফোন করে সবই জানিয়েছে।"

"অমল কি তা বিশ্বাস করেছে?"

সুপ্রিয় বলেছিলেন, "তা বলতে পারিনে, তবে অমল ইন্দ্রাণীর সেই আত্মীয়কে বলেছে, আমাকে এসব কথা কেন বলছেন? আপনি কে? সত্যি বলছেন কি মিথ্যা বলছেন, তাই বা আমি বিশ্বাস করবো কেন? জবাবে লোকটি তোমার গোয়া যাবার সময় ইন্দ্রানীর ছুটি নেবার কথা বলেছে। অমল অবিশ্যি লোকটিকে পরিষ্কার বলেছে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে। আমার স্বামী কী করছেন না করছেন, কোনো অপরিচিত লোকের কাছ থেকে তা আমি জানতে চাইনে। তারপরে লোকটি ক্রমাগতই অমলকে তোমার আর ইন্দ্রাণীর খবর দিয়ে যাচ্ছে। শুধু অমলকেই নয়, তোমার বউদির কানেও কথাটা উঠেছে। মমতা কোন্‌দিন অমলকে সব বলে দেবে জানিনে।"

"বউদিকে কি খুশির মা বাবা কিছু বলেছেন?" ক্ষৌণীশের অসাড়

অনুভূতি যেন জেগে উঠেছিল।

সুপ্রিয় গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, "মমতা আমাকে বলেছে, খুশির মা নাকি জানে, তাদের মেয়ে একজনের সঙ্গে প্রেম করছে। তোমার বউদি বোকা নন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি, এরকম ঘটনা আমার কিছু জানা নেই। তবে তোমার বোধহয় সাবধান হবার সময় হয়েছে। তুমি অমল সম্পর্কে যতোটা নিশ্চিন্ত আছো ততোটা নিশ্চিন্ত থাকা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।"

ক্ষৌণীশ কি বাস্তবিকই অমলের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল? অমলের পরিবর্তন কি ওর চোখে পড়েনি? আসলে, ওর অবচেতনের কূপমণ্ডূকটা মাথা তুলে দেখতে ভুলে গিয়েছিল। সেজন্যই, মনের মধ্যে একটা পাপবোধ থাকলেও, অবাধ ভোগের মধ্যে ও ডুবেছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা হয়, অনিবার্যভাবেই তা ঘটেছিল। অমলের একটা সহ্যের সীমা ছিল। ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড-টাকেই যে কেবল মুচড়ে নিংড়ে নিচ্ছিল, তা না। নারীত্বের অবমাননা ওর সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। ও ওর জীবনে যা করেনি, ছেলেমেয়েদের গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির অবকাশে তাই করেছিল। রূপ আর রেশমিকে নিয়ে, ক্ষৌণীশকে কিছুই না জানিয়ে ও গোপালপুরের সমুদ্রের ধারে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। ক্ষৌণীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "অমল তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছো? আমাকে তো একবারও বলোনি?"

"তোমার কি তা শোনবার সময় আছে?" অমল ওর শীর্ণ মুখে করুণ হেসেছিল। "মনও কি আছে?"

ক্ষৌণীশের ভিতরটা যেন অলক্ষ্যে জমে ওঠা মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝলকে চমকে উঠেছিল, "এ কথা বলার মানে কী? তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে সামারের ছুটিতে বাইরে যাচ্ছো, সে-কথা আমার শোনার সময় বা মন থাকবে না কেন?"

"তোমার এই কেন'র জবাব তো আমার জানার কথা নয়।" অমল যতটা সম্ভব নিরীহ আর শান্তভাবে বলেছিল, "আমি রূপ রেশমিকে নিয়ে গোপাল-পুর-অন্-সীতে যাচ্ছি। আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। গোপালপুরে হোটেল বুক করাও হয়েছে। গোছগাছ করতে দেখে তোমার হঠাৎ কিছু মনে হয়েছে বলেই খোঁজ করছো। ভালো। আমরা আগামীকাল মাদ্রাজ মেলে যাচ্ছি।"

ক্ষৌণীশ যে-সমাজ ও শ্রেণীর মানুষ মুহূর্তেই ওর সেই চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। "কিন্তু অমল, আমি তো এটা মেনে নিতে পারিনে। আমার স্ত্রী বাইরে বেড়াতে যাবে, সে খবর আমি জানবো না, তা কেমন করে হয়?"

"সামাজিক বা আইনত যখন তোমার সঙ্গে আমার এখনো বিচ্ছেদ হয়নি, তখন নিশ্চয়ই আমি তোমার স্ত্রী রয়ে গেছি।" অমল প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে নির্বিকার রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর করুণ হাসিটা ছিল কান্নার

অধিক মর্মান্তিক, "কিন্তু ক্ষৌণীশবাবু, আমার কথা যতোই নাটকীয় শোনাক, বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে আর আমার স্বামী বলে ভাবিনে। বিশ্বাসও করিনে। বিচ্ছেদ আমাদের হয়ে গেছে। এখন আমি কি করবো, কোথায় যাবো না যাবো, সে-সবই আমার নিজের ব্যাপার।"

ক্ষৌণীশ রীতিমতো ঝেঁজে উঠে বলেছিল, "তা যদি মেনেও নিই, তাহলেও রূপ রেশমি তো আমারই ছেলেমেয়ে। ওদের নিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারো না।"

"যদি না যেতে দাও নিয়ে যাবো না।" অমল শুকনো চোখে, অকম্পিত স্বরে বলেছিল, "কারণ তা নিয়ে এখন তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া বিবাদ করতে চাইনে। উপযুক্ত জায়গা থেকে যদি নির্দেশ পাওয়া যায়, তখন ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব কার কতোখানি থাকবে তা স্থির হবে।"

ক্ষৌণীশের জীবনে ঐরকম ঘটনা ছিল একেবারে নতুন। অমল অত্যন্ত শান্তভাবে যে-সব কথা বলেছিল, সে-সব ওর পক্ষে অতি মর্মান্তিক। ভেবে পায়নি, অমল এতো শক্তি কোথায় পেয়েছিল। অবিশ্যি সে প্রশ্ন ওর মনেও আসেনি। ও জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি ডিভোর্স চাইতে কোর্টে যাবে?"

"তুমি যদি কোর্টে পা বাড়াতে না চাও, আমিও যেতে চাইনে।" অমল যেন ক্রমাগত ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। "আইনত ডিভোর্স কোর্টে না গিয়েও আমাদের ল-ইয়াররা করতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে বিবাদ না করলে, অন্যের কিছুই করার নেই।"

ক্ষৌণীশের মনে হয়েছিল ওর বিবাহিতা স্ত্রী একটি অচেনা মহিলা, যার প্রকৃত পরিচয় ওর অজ্ঞাত! ওর ভিতরটা যতো ফুঁসছিল, ততোই একটা অসহায়তা বোধে যেন জমে পাথর হয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "জানতে পারি, এসব সিদ্ধান্ত তুমি কবে নিয়েছো?"

"সে-হিসেবটা তোমারই জানা থাকা উচিত ছিল। অমল বিমর্ষ হেসে বলেছিল, "তবু যখন জানতে চাইছো, বলতে পারি, যখন থেকে তুমি আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করেছিলে।"

ক্ষৌণীশ অতঃপর এই সমাজের পুরুষ অনিবার্যভাবে তার আক্রমণের অস্ত্র যেমন উদ্যত করে, তাই করেছিল, "তোমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব কে নিচ্ছে জানতে পারি?"

"কেউ যদি নেয়ও তার কথা তোমাকে বলতে যাবো কেন?" শান্ত অমলের হাসি যেন উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। "তবে আপাতত এ সংসারে আমার প্রাপ্য অধিকারেই আমি বাঁচবো। তার জন্য যদি আমাকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়, হবো।"

ক্ষৌণীশ অমলের শান্ত দৃঢ় কথাগুলো দাঁড়িয়ে শুনতে পারছিল না। বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়ে বলেছিল, "তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো, রূপ রেশমি তোমার সঙ্গে যাবে না।"

"কিন্তু আমি মায়ের সঙ্গেই যাবো।"

রূপ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

হতবাক ক্ষৌণীশ ওর তের বছরের ছেলের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। বিশ্বাস করতে পারছিল না, ছেলে রূপ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়েছিল রূপ ওর অচেনা। রূপ কবে মাথায় এতখানি বড় হয়ে উঠেছিল ওর চোখে পড়েনি। তেরো বছরের কিশোরকে যেন একটি মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের মতো দেখাচ্ছিল। যদি ভালো করে দেখতো, তবে বুঝতে পারতো, ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল ক্ষৌণীশ চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর প্রতিবিম্ব। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, শক্ত অথচ কোমল মুখ তাকিয়েছিল অন্যদিকে। ক্ষৌণীশ তৎক্ষণাৎ কোনো কথা বলতে পারেনি। অথচ একটা পরাজয়ের আগুনে ওর ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই দগ্ধ হবার মধ্যেই প্রাণের ভিতরে অন্যত্র একটা হাহাকারও ধ্বনিত হয়েছিল। ও চাপা গর্জনের স্বরে বলেছিল, "তুমি কোথায় কার সঙ্গে যাবে, সেটা আমিই ঠিক করবো।" এই কথা বলে ও আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায়নি। বেরিয়ে গিয়েছিল।

ক্ষৌণীশ জানতো না, ওর ঐভাবে বেরিয়ে যাওয়ায় অমল উদ্বিগ্ন হয়েছিল। রূপকে বলেছিল, "আমার সঙ্গে তোর বাবার কথার মাঝখানে এসে কথা বলার অনুমতি তোকে কে দিয়েছে।"

"আমি বাবার কথা শুনে চুপ করে থাকতে পারিনি।" রূপ মায়ের মুখের দিকে তাকাতে না পেরে মাথা নত করেছিল।

অমল দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলেছিল, "রূপ, আর কোনোদিন তুমি আমাদের কথা আড়াল থেকে শুনবে না। কোনো কথা তো বলবেই না। আমি তো তোমাদের এরকম আসকারা কখনো দিইনি। এ সাহস তুই পেলি কোথা থেকে? খুব অন্যায় করেছিস। আর যেন এরকম না হয়।"

অমল যে রূপের মনের অবস্থা বুঝতে পারেনি, তা না। কিন্তু রূপের ঐ আত্মপ্রকাশ একটা অশুভেরই সূচনা। রূপ চলে যাবার আগে বলেছিল, "আচ্ছা।"

ক্ষৌণীশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে উঠেছিল। ড্রাইভারকে কোনো গন্তব্যই বলেনি। অতএব ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে সোজা অফিসেই গিয়েছিল। ক্ষৌণীশ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সহসা স্থির করে উঠতে পারছিল না, ভিতরে ঢুকবে কিনা। কিছু স্থির করতে না পেরে ও অফিসেই ঢুকেছিল। চলে গিয়েছিল সোজা নিজের ঘরে। অনীশ ঢুকেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ক্ষৌণীশ ঝেঁজে উঠেছিল, "কী চাই? ঢুকতে না ঢুকতেই তোদের কাজের তাড়া পড়ে যায়?"

অনীশ অবাক হয়েছিল। ছোটকাকার ঐ রকম মেজাজ ও দেখেনি। অবশ্যি ইদানীং ছোটকাকার মেজাজ প্রায়দিনই বিশেষ ভালো থাকতো না।

অনীশ বলেছিল, "একটা সুখবর ছিল, সেটাই দিতে এসেছিলুম।"

"তার জন্যে যদি কিছু করার থাকে, তোরা করতে পারিসনে?" ক্ষৌণীশ তেমনি ঝেঁজেই বলেছিল, "সবই কি আমাকে করতে হবে। আমি মরে গেলে কি এই ফার্ম বন্ধ হয়ে যাবে?"

অনীশ ছোটকাকার মানসিক অবস্থা বুঝে শান্তভাবে জবাব দিয়েছিল, "একটা বড় কাজের প্রস্তাব এসেছে। তোমার অ্যাকসেপটেন্স বা সই ছাড়া, আমরা কিছুই করতে পারিনে। তাই তোমাকে বলতে এসেছিলুম। ঠিক আছে। তোমার যখন মন মেজাজ ভালো নেই, ছোট কাকি অ্যাকসেপটেন্সে সই দিলেই কাজটা আমরা নিতে পারি।"

"হ্যাঁ, আমাকে সবাই মিলে চিতেয় তুলে, ছোটকাকির কাছেই যা।" ক্ষৌণীশ আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল।

অনীশ বুঝতে পারেনি, সে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে, চলে যাবার উদ্যোগ করেছিল। ক্ষৌণীশ তার মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "সুখবর যখন বলছিস, তা হলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা যায়। আর সবাইয়ের কী মত?"

"তোমার অ্যাসিস্টেন্টরা সকলেই অফারটা পেয়ে খুশি।"

"তা হলে নিয়ে আয় অফার পেপার। আমি সই করে দিচ্ছি।" কথাটা বলে ও অনীশের সঙ্গেই নিজের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়েছিল। বসেছিল অনীশের টেবিলে। ওকে ঘিরে উঠে এসেছিল আরও কয়েকজন। অনীশ অফার-পেপার তুলে দিয়েছিল তার হাতে। যদিও ও ওর স্বাভাবিক হাসি মুখে অমায়িক আর অনায়াস হতে পারছিল না। পেপার পড়ে, সকলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "অফারটা তো ভালোই মনে হচ্ছে। ফিফটিন্থ ফ্লোর মাল্টিস্টোরিড বিরাট ব্যাপার। এটা হচ্ছে প্রাইমারি অফার। আমার সময় হবে না। তোমরা গিয়ে জায়গাটা দেখে নাও। জমির দলিলটা দেখবে ভালো করে। পুকুর বুজিয়ে ছোট্ট জমি কি না, পুরনো বাড়িটা কতো কালের, সব তদন্ত করে দেখে নিও। যে-পার্টি অফার দিচ্ছে, এটা মোটামুটি সেমি গভর্নমেন্ট। সব বিষয়েই খুঁটিয়ে বুঝে নিও।" ও সই করে দিয়েই, অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। গিয়েছিল সোজা প্রাচী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সুপ্রিয় রায়চৌধুরির কাছে। ব্যক্ত করেছিল সমস্ত ঘটনা।

"ক্ষৌণীশ, আমার পরামর্শ যদি চাও, কালমাত্র বিলম্ব না করে তুমি অমলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা কর।" সুপ্রিয় বলেছিলেন, "অমল সেই জাতীয় মেয়ে না, যারা কথায় কথায় ঝেঁজে রেগে কেঁদে ভাসায়। তাদের সহজে ম্যানেজ করা যায়। আমার চেয়ে তুমি কিছু কম বোঝ না। অমল যখন এসব কথা একবার মুখ ফুটে বলতে পেরেছে, তখন বুঝতে হবে, ও সিদ্ধান্ত নিয়েই বলেছে। আর তুমি যদি অমলকে ডিভোর্স দিতে চাও, ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করতে চাও, কিছু বলার নেই।"

"সুপ্রিয়দা, ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই নেই।"

"ইন্দ্রাণীর থাকতে পারে।"

"আমাদের সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। আমরা একত্রে বাস করতে পারি।"

"লিভিং টুগেদার কথাটা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর মেয়ের পাঁজরায় শেষ পর্যন্ত সেই শক্তি থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ কিছু দিনের মধ্যেই তার মনে হবে, একটি পুরুষ লিভিং টুগেদারের সুযোগ নিয়ে তাকে কেবল ভোগ করছে। কোনো দায়দায়িত্বই সে বহন করে না। তার সন্তানের দাবিও ভবিষ্যতে উঠতে পারো। তবে আমার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর সঙ্গেও তোমার একবার কথা বলা উচিত।"

"তাহলে আমাকে খুশির ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

"ক্ষৌণীশ, তুমি ভালোই জানো, তোমার আর ইন্দ্রাণীর মেলামেশার ব্যাপার আর চেনাশোনা মহলে, কারোর কোথাও অজানা নেই। এই স্টোর্সের সবাই সব জানে। তুমি আমার কাছে আসো বলে ইন্দ্রাণীকে কেউ কোনোরকম ঠেস্ দিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, এই স্টোর্সের সবাই ওকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। কারণ তাদের সিমপ্যাথি অমলের ওপর। ইন্দ্রাণী যদি এখনো তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যায়, কেউ অবাক হবে না।"

"সুপ্রিয়দা, তা আমি চাইনে। আমি বাইরে গিয়ে ওকে টেলিফোনে ডেকে নেবো।"

"তোমার অভিরুচি। তবে অমলের সঙ্গে যা করতে চাও, তাড়াতাড়ি কর। বেশি সময় নেবার চেষ্টা করো না।"

ক্ষৌণীশ স্টোর্স থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী হোটেলে গিয়ে ইন্দ্রাণীকে টেলিফোনে ডেকেছিল। ইন্দ্রাণী এসেছিল। দুজনে হোটেলের ঘরে নিভৃতে বসে বিষয়টি আলোচনা করেছিল। ক্ষৌণীশ সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছিল। এমন কি সুপ্রিয়র পরামর্শের কথাও ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে কয়েক মিনিট ভেবে বলেছিল, "মেসোমশাই (সুপ্রিয়) যা বলেছেন, তোমার তাই করা উচিত। তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। উপায় থাকলে, নির্লজ্জের মতো তোমার স্ত্রীকে নিজের মুখে কথাটা কবুল করতাম। তাতে হয়তো হিতে বিপরীত হবে। কিন্তু তোমার সংসার ভাঙুক, তা আমি কখনো চাই নে। তোমার স্ত্রীকে মনে মনে ঈর্ষা করি সত্যি, কিন্তু নিজেকে দিয়ে বুঝি, তাঁর কতোখানি কোথায় লাগছে। তাঁকে আমি চোখে দেখেছি। কোনোদিন কথা বলিনি। আমার চেয়ে তুমি তাঁকে ভালো জানো। কীভাবে তুমি তাঁকে সব কথা বলবে, তুমিই ভালো বুঝবে। আমি তো বলতে পারিনে। তবে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একটা বোঝাপড়ায় আসতেই হবে। তার জন্য যদি " ইন্দ্রাণীর গলার স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়েছিল। চোখে জল টলটলিয়ে উঠেছিল।

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর অনুচ্চারিত কথা বুঝতে পেরেছিল। অমলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে গিয়ে যদি ওদের দুজনের বিচ্ছেদও হয়ে যায়, তাও ইন্দ্রাণী মেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটাও ইন্দ্রাণীর জীবনে মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কারণ হতো। আসলে ওর নিজের মধ্যে ইন্দ্রাণীর জন্য গভীর দুর্বলতা ছিল।

ক্ষৌণীশ সেই রাত্রেই অমলের সঙ্গে কথা বলেছিল। অমলকে ও সানুনয় প্রার্থনায় কথা শোনাতে রাজি করিয়েছিল। ও একটি কথাও অমলের কাছে গোপন করেনি। ও ওর সমস্ত দুর্বলতার কথা বলেছিল। ওর অপরাধবোধের কথাও অপ্রকাশিত থাকেনি। অমল কেঁদেছিল। ক্ষৌণীশকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল, "ইন্দ্রাণীকে ছাড়া তোমার বাঁচা সম্ভব নয়, বুঝেছি। সে তোমাকে কতোটা ভালবাসে আমি জানিনে। ও যেন তোমার কোনো ক্ষতি না করে। আমি সহ্য করে নেবো। তবে একটি কথা বলি, আমার দুটি সন্তান আছে। আমি তোমার পথের বাধা হতে চাইনে। কিন্তু তুমি কারোর জীবনের ক্ষতি করো না।"

"কিন্তু অমল, সবচেয়ে বড় ক্ষতি তো আমি তোমারই করেছি।"

"করেছো। কিন্তু আমি জানি, আমাকে তুমি কোনোকালেই ভালবাসোনি। না, এ বিষয়ে আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করো না। ভাল না বাসলেও তোমার জীবনে আমার একটা স্থান আছে। আমাকে হয়তো সবাই সেকেলে মূর্খ স্ত্রী ভাববে। ভাবুক। তুমি যদি ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সুখী হও, আপত্তি করবো না। আমার একটি অনুরোধ, রূপ-রেশমির কাছ থেকে দূরে চলে যেও না। বলে রাখি, আমি এমন কোনো কাজ করবো না, যাতে তোমার অসম্মান হয়, অথবা তুমি অশান্তিতে থাকো। কিন্তু আমাকে আমার মতো থাকতে দিও। তোমার স্ত্রী হয়েই আমি থাকবো। আমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে না। আরো কথা হলো এই, ইন্দ্রাণীকে তুমি ডিচ্ করো না। জানিনে, ইন্দ্রাণী এ সংসারকে কী চোখে দ্যাখে। ও যে মেয়ে, এ কথাটা যদি ভোলে, তার ফল হবে মারাত্মক!"

ক্ষৌণীশ টের পায়নি, ওর দীর্ঘকালের জীবনে সংসারের কী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। ইন্দ্রাণীর দেহভোগের আকাঙ্ক্ষা ওকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, অমলের কথাও, তা উপলব্ধি করতে পারেনি। ও যে ইন্দ্রাণীকে ভালবাসে না, সেটা একেবারে অজানা ছিল না। কুর্গের কন্যা মনোরমার স্মৃতি ও কবেই ভুলেছিল, কোনো হিসাব রাখেনি। কলকাতার পরিচিত সমাজের যেটা প্রত্যাশিত ছিল, তা ঘটেনি। অমল বিদ্রোহ করে কোন দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে তাদের হতাশ করেছিল। ক্ষৌণীশ নিজেকে কিছুটা আড়াল করে, ওর পুরনো জীবনের পুনরাবৃত্তি করে চলেছিল।



ক্ষৌণীশ যখন যশিপুর বাংলোর বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করালো. বেলা তখন একটা। গাড়ির হর্ন শুনে, খাকি হাফ-শার্ট হাফ-প্যান্ট পরা এক-জন এগিয়ে এসে গেট খুলে দিল। লোকটি ক্ষৌণীশকে দেখে হেসে কপালে হাত ঠেকালো। ক্ষৌণীশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, "ভালো আছো?"

"আইজ্ঞা।"

ইন্দ্রাণীও দরজা খুলে নামলো। লোকটি বাংলোর বসবার ঘরের দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকতে গিয়েই দেখলো, একটি ভল্লুক একটু দূরে বসে আছে। ইন্দ্রাণী ভয় পেয়ে ক্ষৌণীশের হাত চেপে ধরে আঁতকে উঠে বললো, "ভল্লুক!"

"হ্যাঁ ভল্লুক, কিন্তু পোষা।" ক্ষৌণীশ হাসলো. "ওকে নিয়ে তোমার কোনো ভাবনা নেই। তোমার কপাল মন্দ, যশিপুরের আসল চার্ম আর নেই।"

ইন্দ্রাণী বললো. "জানি। খৈরি মারা গেছে।"

"এই বাংলোর ঘরে বাইরে সবখানে সে ঘুরে বেড়াতো। ভয়ও করতো। অথচ তার সামনে থেকে সরতে ইচ্ছে করতো না। তোমাকে আগেই বলেছি, খৈরি যে বছর যেদিন মারা গেল. আমি সদলবলে সেদিন জঙ্গলের মধ্যে বড়াইপানি বাংলোতে আড্ডা দিচ্ছিলুম। এখান থেকে জঙ্গলে যাবার আগের দিন রাত্রেই খৈরির শরীর খারাপ, মেজাজও মন্দ হয়ে উঠেছিল। ওকে কেজ করা হয়েছিল। আমরা রাত্রে ছিলুম ক্রোকোডাইল প্রজেক্টের বাংলোতে। চারদিন পরে বড়াইপানির বাংলোয় টেলিফোনে খবর এসেছিল বেলা সাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ, খৈরি সেদিনই ভোরে মারা গেছে। সেবারে জঙ্গলে বেড়ানোর আনন্দ খৈরির মৃত্যুতেই শেষ হয়ে গেছলো। কারোর মন ভাল ছিল না।"

বাংলোর যিনি তত্ত্বাবধায়ক অফিসার, তিনি এসেছিলেন। ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীকে ঘরে বসতে বলেছিলেন। আগের যিনি অফিসার. সরোজরাজ চৌধুরি তিনিও গত হয়েছিলেন। বনবিভাগের নতুন অফিসার ক্ষৌণীশের কথা শুনে ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, "কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি, জঙ্গলে এখন কোনো কাজ পর্যন্ত হয় না। এই সিজেনে জঙ্গলে কেউ ঢোকেও না। বৃষ্টি বাদল হলে, মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

"মুশকিল আর কী!" ক্ষৌণীশ হেসে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে-ছিল, "বৃষ্টি হলে বাংলোর ঘর থেকে বেরোবো না।"

অফিসার তবু বলেছিলেন, "বৃষ্টি হলে জঙ্গল নরক হয়ে ওঠে। আমাদেরও

অবিশ্যি এ সময়ে জঙ্গলে যাবার অনুমতি দেবার নির্দেশ নেই। তবে আপনারা যদি যেতে চান, আমি পারমিশন দিতে পারি।"

"তাই দিন।" ক্ষৌণীশ নিরুদ্বেগ প্রসন্ন স্বরে অনুরোধ করেছিল, "বুঝতেই পারছেন, এতো দূর গাড়ি চালিয়ে এসেছি। আমি সিমলিপাল জঙ্গল দেখলেও ইনি (ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে) কোনো দিন দেখেননি।

অফিসার অনুমতিপত্র সই করে দিয়েছিলেন, "বৃষ্টি না হলে হয়তো ভালোই ঘুরে আসবেন। এখন আপনাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। কাল সকালেই যাবেন তো?"

"হ্যাঁ।"

অফিসার বলেছিলেন, "তা হলে এখানেই আজকের রাতটা একটা ঘরে থাকুন। বড় দল থাকলে ক্রোকোডাইল প্রোজেক্টের বাংলোতে যেতে হতো।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" ক্ষৌণীশ কৃতজ্ঞ হেসেছিল।

ইন্দ্রাণীও খুশি হয়েছিল। দেওয়ালের ওপর তারের জাল দিয়ে জড়ানো মস্ত বড় একটা অজগরকে দেখে ও ভেবেছিল, প্রাণীটি মৃত। উঠে গিয়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা মাত্রই চামড়া কেঁপে উঠেছিল, আর হাউইয়ের মতো তীব্র শব্দে ফোঁস করে উঠেছিল। ইন্দ্রাণী এক লাফে সরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে বলেছিল, "এটা জ্যান্ত?"

"হ্যাঁ। একটা নয় খুশি, দুটো জ্যান্ত পাইথন দু দেয়ালে রয়েছে।" ক্ষৌণীশ হেসে বললো, "এতো বড় পাইথন দেখাবার জন্যই এভাবে রাখা হয়েছে।"

অফিসার হেসে বললেন, "আপনাদের ভাগ্যে থাকলে জঙ্গলে এখন পাইথনের দেখা পেতে পারেন।"

"ও রে বাবা!" ইন্দ্রাণীর দু চোখে আতঙ্ক ফুটেছিল, "আমি জঙ্গলের মধ্যে কোনো সাপখোপ জন্তুজানোয়ার দেখতে চাইনে।"

ক্ষৌণীশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অফিসারও হেসেছিলেন। অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "চৌকিদার আপনাদের দরজা খুলে দেবে। এখানেই যদি লাঞ্চ করেন, ওকে বললে রেঁধে দেবে। তবে খেতে দেরি হয়ে যাবে।"

"তা যাক।" ক্ষৌণীশ বললো, "ওতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আমরাও একটু চান টান করবো।"

অফিসার বেরিয়ে গেলেন। চৌকিদার এলো। ক্ষৌণীশ তার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললো, "তুমি যা রাঁধবে তাই খাবো। আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দাও। আমি গাড়ির পেছন দিক খুলে দিচ্ছি। মালপত্র নামিয়ে দিও।"

চৌকিদারের হাতে চাবির গোছা ছিল। অফিসঘর থেকে বাঁ দিকে গিয়ে, একটি বন্ধ ঘরের দরজায় ঝোলানো তালা খুলে দিয়েছিল। ভল্লুকটা তখন আর সেখানে ছিল না। জানালা দুটো খুলে দেবার পর দেখা গেল, ঘরটি

বেশ বড়। দুটি সিঙ্গল খাটে বিছানা পাতা। ড্রেসিং টেবিল, সংলগ্ন বাথরুম। দুটি সোফা, একটি টেবিল ঘিরে দুটো চেয়ার। ইন্দ্রাণী বললো, "অজগরটার গায়ে হাত দিয়ে আমার গাটা এখন কেমন শিরশির করছে।"

"কিন্তু মানুষের পক্ষে অজগর কোনো ভয়ের কিছু নয়।" ক্ষৌণীশ ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, "অজগর মানুষ খেয়েছে, এমন কথা প্রায় শোনাই যায় না। অজগর ফণা তুলতে পারে না। ছোবল মারতেও পারে না। তাছাড়া তাদের বিষ নেই। তবে শিকারী সাপ। অনেক সময় ছোটখাটো হরিণও গিলে ফেলে।" ও হাতে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"শোনো।" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো, "সেই ভল্লুকটা তো ছাড়া আছে। যদি ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।"

ক্ষৌণীশ হেসে বলল, "খৈরির মতো ভল্লুকটাও ছোট্ট থেকে এখানে বড় হয়েছে। ও ছাড়াই থাকে, কারোকে কামড়ায় না।"

"না বাপু, আমার সাহস হয় না।" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। "খৈরি থাকলেই কি আমি এখানে খোলা ঘরে একলা থাকতাম নাকি? কখ্খনো না।"

ক্ষৌণীশ গাড়ির বুটের চাবি খুলে দিয়ে বললো, "তা হলে তুমি জঙ্গলে বেড়াবে কেমন করে? বাঘ-ভাল্লুক অজগর তোমার সামনে না পড়তে পারে। সিমলিপালের জঙ্গলে বুনো হাতির সামনে পড়তে পারো।"

"রক্ষে কর।" ইন্দ্রাণী যেন কণ্টকিত হয়ে বললো, "বুনো হাতির সামনে আমি পড়তে চাইনে। নিরাপদ দূরত্ব থেকে যদি দেখতে পাই, ভালো। নইলে দেখতে চাইনে।"

ক্ষৌণীশ ফোমের ব্যাগটা নিজের হাতে নিল। চৌকিদার নিল অন্যান্য মাল। ক্ষৌণীশ বুট নামিয়ে দিয়ে ঘরে এলো। বললো, "তুমি তা হলে কেবল হরিণ, আর খরগোস দেখতে চাও?"

"তাতেই যথেষ্ট।" ইন্দ্রাণী ওর হাতের ব্যাগসহ একটা সোফায় বসলো, "বুনো হরিণ-খরগোস দেখাটা কম কিছু নয়। আরও যেন কী বলেছিলে? বুনো মোরগ। বুনো মোরগ ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেক রকম পাখি আছে। আমি সে সবই দেখতে চাই। হিংস্র আর বড় জানোয়ার দেখতে চাইনে।"

ক্ষৌণীশ একটা সিগারেট ধরালো, "খুশি, হরিণ দেখার মধ্যেও বিপদ আছে। হরিণের বা ষাঁড়ের সামনে পড়লে সে তোমাকে মস্ত শিং নেড়ে গুঁতোতে আসবে। শুনেছি হরিণের ষাঁড়ের গুঁতোয় মানুষ মরেও যায়।"

"তাহলে আমি হরিণও দেখতে চাইনে।" ইন্দ্রাণী সোফা ছেড়ে উঠে খাটে গিয়ে এলিয়ে পড়লো।

"দেখ আমাকে বেশি ভয় দেখিও না। তা হলে আমি জঙ্গলে যাবোই না।" ক্ষৌণীশ হেসে উঠে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো। চৌকিদার জলের জাগ আর

গেলাস নিয়ে ঢুকলো। টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর পাশে এসে বসলো, "আজ অনেক কাজ আছে। প্রথমেই যেতে হবে জিপ-এর খোঁজে। জঙ্গলে জিপ ছাড়া চলাফেরা করা যাবে না। কী কী নিয়ে যাবো, তার একটা লিস্ট করে ফেলতে হবে। তোমাকে নিয়ে একবার ক্রোকোডাইল প্রোজেক্টেও যেতে হবে।"

"তা তো যেতে হবে। ক্রোকোডাইল প্রোজেক্টে কুমিরগুলোকে কি ছেড়ে রাখা হয়?" ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো।

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর ভীত জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "কুমিরকে তো আর বেঁধে রাখা যায় না। তারা জলেও থাকে, আবার ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়। শিকার করে। তবে ভয় নেই। যে সব ছোট ছোট জলাশয়ে কুমিরগুলো থাকে, সেগুলো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কুমির আর যাই করুক টিকটিকির মতো, দেয়ালে বেয়ে উঠতে পারে না।"

"যাই বলো, ওসব অজগর কুমিরের নাম শুনলেই যেন গায়ের মধ্যে কেমন করে।" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের একটা হাত ধরে উঠে বসলো। "তুমি যে ভালো মানুষের মতো বসে রইলে? বোতোল টোতল খুলবে না?"

ক্ষৌণীশ ঘাড় নাড়লো, "আজ আর দিনের বেলা কিছু নেবো না। লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কেনাকাটা করতে হবে। যা নেবার রাত্রে একটু নেবো। আজ রাত্রে কিছুই বেশি নয়। সবই কম কম।" ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ইন্দ্রাণী ভ্রূকুটি-সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তার মানে?"

"মানে আবার কী?" ক্ষৌণীশের চোখে কৌতুকের ছটা, "আজ কিছুই বেশি নয়। সবই কম কম। যেমন গতকাল রাত্রে তুমি জেদ ধরলে হুইস্কি খাবে। জিন ফেলে রেখে এমন হুইস্কি খেলে, খাবার পর্যন্ত ভালো করে খেতে পারলে না। বালিশ আর আমাকে সিঁদুর মাখামাখি হতে হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী হাত তুলে, ক্ষৌণীশের পিঠে একটি কিল দিল, "অসভ্য!"

"বলেছি অসভ্য বললেই আমার আরো বেশি অসভ্য হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর দিকে ঝুঁকে পড়লো।

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ খাট থেকে উঠে, সরে গেল। ক্ষৌণীশের এখন ঠিক সেরকম মেজাজ নেই। ও বললো, "ঠিক আছে খুশি। তুমি একটু কাগজ কলম নিয়ে বোসো। কী কী কিনতে হবে, আর কতোটা, তার লিস্ট তৈরি হয়ে যাক।"

"তা লিখতে রাজি আছি।" ইন্দ্রাণী ওর ব্যাগ থেকে বের করলো কলম আর একটা ছোট নোটবুক, "বলো, চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল, ঘি, গরম-মশলা, গুঁড়ো হলুদ, আদা; কাঁচালঙ্কা, এমনি আরো সব মশলা..." বলতে বলতে যেন হাঁফিয়ে উঠলো।

ক্ষৌণীশ হাসলো, "থামলে কেন? আলু, বেগুন, আরো কিছু সবজি, মুরগি, ডিম, পাঁউরুটি..."

ইন্দ্রাণী লিখতে আরম্ভ করে দিল। ক্ষৌণীশ ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সকালবেলাই দাড়ি কামানো আর এক প্রস্থ স্নান হয়ে গিয়েছে। আর একবার স্নান করতে হবে। চৌকিদারের রান্না হয়ে গেলে, খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। আগে যাবে কুমির প্রকল্প। তারপরেই জিপ-এর ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ভালো কনডিশনের জিপ চাই। ড্রাইভারও চাই। জঙ্গলের মধ্যে সব সময়েই ড্রাইভারকে নিয়ে বেরোবার দরকার হবে না। ক্ষৌণীশ নিজেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে বেরোবে। ও বললো, "খুশি আমি বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছি। জামাটামা চেঞ্জ করার দরকার নেই। খেয়েই একটু পরে বেরিয়ে পড়বো। তুমি মোটামুটি একটা লিস্ট কর। তারপরে আমি সব দেখে নেবো।" ও বাথরুমে ঢুকে গেল।

কোমরের থেকে একটু উঁচু পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী কুমির দেখছিল। ক্ষৌণীশ তখন প্রোজেক্টের বাঙালি ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলছিল। জীবন্ত কুমির দেখে ইন্দ্রাণীর নাকের পাশে কুঁচকে উঠছিল। কী বিশ্রী প্রাণী! জলের ওপরে বালির বুকে সে নিশ্চল পোড়া কাঠের মতো। চার পায়ে চলতে দেখলে আরও যেন বীভৎস লাগে। আর যখন জলের মধ্যে পড়ে ডুবে যায়, মনে হয়, হঠাৎ পায়ের কাছে কোথাও ভেসে উঠবে।

ক্রোকোডাইল প্রোজেক্ট থেকে বেরিয়ে ওরা গেল যশিপুর শহরের দিকে। বিষয়ীর চেয়ে কিছু বড় শহর। দোকানপাট লোকজনও-বেশি। ক্ষৌণীশ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালো। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "নামবে?"

"হ্যাঁ। আগে জিপটা এ্যারেঞ্জ করে ফেলি।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাবো?"

"কেন নয়? এসো।"

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে, ক্ষৌণীশ এগিয়ে গেল একটা মোটর পার্টসের দোকানের কাছে। দোকানের সাইনবোর্ডে 'আহমেদ ব্রাদার্স' লেখা ছিল। সামনে যে-লোকটি চেয়ারে বসেছিল, ক্ষৌণীশকে দেখেই সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো একবার ইন্দ্রাণীর দিকে। লোকটি হাসলেও একটু যেন অবাক হয়েছে। হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলো, "এ সময়ে যশিপুরে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।" ক্ষৌণীশ বললো, "আমার একটা ভালো জিপ্ চাই। কাল ভোরেই জঙ্গলে যাবো।"

লোকটির ভুরু কুঁচকে উঠলো, "জঙ্গলে যাবেন? এই বরষার সময়? পারমিশন পেয়েছেন?"

"পেয়েছি।" ক্ষৌণীশ হেসে বললো, "পারমিশন না পেলে আপনার কাছে আসবো কেন? তবে এবার সঙ্গে কোনো দল নেই। আমরা দুজনেই শুধু যাবো।"

লোকটি একটু ইতস্তত করে হেসে বললো, "কিন্তু সাহেব, এ সময়ে তো কেউ জঙ্গলে যায় না। বৃষ্টি হলে ফেঁসে যাবেন।"

"ফেঁসে আর কী যাবো?" ক্ষৌণীশ হাসলো, "বৃষ্টি হলে বাংলোয় বসে থাকবো।"

লোকটি তবু বললো, "বেশি বৃষ্টি হলে রাস্তায় গাড়ি চালানো যাবে না।"

"আপনি আমাকে একটা ফোর হুইলার জিপ দেবেন।"

"ফোর হুইলার একটাই আছে সাহেব।" লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "কিন্তু সেটা তো ভাড়া নিয়ে চলে গেছে।"

"তা হলে একটা ভালো দেখে টু হুইলারই দেবেন।"

"চলুন তা হলে আপনাকে গাড়িটা দেখিয়ে দিই।" লোকটি বললো, "সেলিমকে তো আপনি চেনেন।" ও যাবে আপনার সঙ্গে।"

"ভালোই হবে। আসুন, আপনি আমার গাড়িতে উঠে বসুন। আপনার গ্যারেজে যাবো তো?"

"জী সাহেব।"

ক্ষৌণীশ লোকটিকে নিয়ে ভিতরের একটি রাস্তায় গেল। একটি মোটর মেরামতির কারখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেলিমকে সেখানেই পাওয়া গেল। সব শুনে সেও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এ সময়ে জঙ্গলে যাবেন?"

"হ্যাঁ সেলিম। পারমিশন পেয়ে গেছি।" ক্ষৌণীশ বললো, "যে কোনো বাংলোতেই গিয়ে আমরা থাকতে পারি। সেরকমই পারমিশন পেয়েছি।"

সেলিম বললো, "এখন তো সব বাংলোর পারমিশনই পাবেন। এ সময়ে কেউ জঙ্গলে যায় না। পাহাড়ি জঙ্গলের রাস্তা। এখন কোনো গাড়ি ঢোকে না।"

"আমরা ঢুকবো।" ক্ষৌণীশ বললো, "তুমি যাবে তো?"

"তা তো জরুর যাবো।" কথাটা বললেও, তার মুখে যেন একটা অস্বস্তির ছায়া দেখা গেল। সে এক দিকে গিয়ে একটা টিনের বড় আগল খুললো। ভিতর থেকে বের করে আনলো একটা জিপ। ডিজেল এঞ্জিনের জিপ। তেমন পুরনোও নয়।

ক্ষৌণীশ জিপ দেখে খুশি হলো, "ঠিক আছে। খুশি, কেমন দেখছো?"

"আমি তো ওসব খুব বুঝি!" ইন্দ্রাণী হাসলো, "চোখে দেখছি ভালো। বাকিটা বুঝবে তুমি।"

ক্ষৌণীশ পকেট থেকে টাকা বের করে আগের লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল।

"ডিজেল মোবিল যা যা লাগবে সব তুলে নিতে হবে। যদি কোন গোলমাল থাকে, আজই সারিয়ে ফেলতে হবে। আমরা কাল সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়বো। প্রথমেই চলে যাবো জোরান্ডায়। জোরান্ডায় গিয়ে দু' দিন থাকবো। কাল দুপুরে সেখানে গিয়েই খাবো। এখান থেকে টেলিফোনে আগে জানিয়ে রাখা হবে।"

"জঙ্গলের বাংলোর টেলিফোন কি এখন চালু আছে?" সেলিম সন্দেহ

প্রকাশ করলো!

ক্ষৌণীশ বললো, "না থাকলেই বা ক্ষতি কী! চৌকিদারের তো এখন ছুটি নেই। তাকে পেলেই কাজ হবে।"

সেলিম আর কিছু বললো না। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে নিয়ে চললো দুজনের দশ দিনের মতো খাবার কিনতে।

রাত্রিটা কাটলো যশিপুরের বাংলোয়। ভল্লুকটাকে নিয়ে ইন্দ্রাণীর ভয় ছিল। রাত্রে শোবার আগে ও ভালো করে দরজা দেখে নিয়েছিল। বন্ধ করেছিল নিজের হাতে।

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণী প্রস্তুত ছিল। সেলিমও জীপ নিয়ে এলো সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে। দুদিন আগে বেরোবার সময় কলকাতার মতোই ছিল আবহাওয়া। মেঘলা আকাশ, উতলা বাতাস। তবে জংগল পাহাড়ি অঞ্চলে বলেই হয় তো একটু জলো আর ভেজা লাগছে। কলকাতা থেকে বেরোবার পর, রোদ কমই দেখা গিয়েছে। বহরাগোড়া থেক বাংরিপোসির পথে একবার বৃষ্টিও হয়েছিল। তারপর রোদ উঠতেও দেখা গিয়েছিল।

কলকাতার গাড়ি রইলো যশিপুরের বাংলোয়। খাবার দাবার সহ যাবতীয় মালপত্র তোলা হলো জিপ-এর পিছনে। তিন জনেই বসলো সামনে। সেলিম জিপ ছোটালো প্রথমে বিষয়ীর দিকে। প্রায় পাঁচ মাইলের পর জিপ ডান দিকে মোড় নিয়ে জঙ্গলের পথে পড়লো। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে আকাশ মেঘলা। বাতাসও সামান্য আছে। দক্ষিণ পশ্চিমের পথ ছেড়ে জিপ চলেছে পশ্চিমে।

ইন্দ্রাণী গুনগুন করছে। ও আজ জিন্স-এর উপরে টপ চাপিয়েছে। সামনের থেকে চুল টেনে, ঘাড়ের কাছে রবার আটকে দিয়েছে। কিন্তু সামনের চুল এমন ভাবে কাটা কপালের ও গালের ওপর চুলের অনবরত ঝাপটা লাগছে। বসেছে মাঝখানে। সেলিমের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে, ক্ষৌণীশের দিকে ঝুঁকে, শরীরের ভার রেখেছে। ক্ষৌণীশও বেশ খোশ মেজাজে আছে। জঙ্গল ঘেরা উপত্যকা আর গ্রাম পেরিয়ে চলেছে। ধূমপানে ওর তেমন টান নেই। বাঁ দিকে কোমরের কাছে চেপে রাখা আছে ভোদকার বোতল। মাঝে মাঝে ওর ভুরু কুঁচকে উঠছিল। রাস্তার অবস্থা বিশেষ ভালো না। বৃষ্টির জল জমে আছে কোথাও কোথাও। খানা খন্দও কম নেই। জিপ্ চলেছে নাচতে নাচতে। অবিশ্যি এই লালমাটি কাঁকরের বন্ধুর রাস্তায় গাড়ি কোনো সময়েই একটু দুলুনি ছাড়া চলে না। তবে এখন বৃষ্টিতে রাস্তার অনেক জায়গা ধসে পড়েছে। খানা খন্দ সৃষ্টি হয়েছে। গাড়ি নাচতে নাচতে যেমন চলেছে, তেমনি গতিও মোটেই বাড়ানো যাচ্ছে না।

ইন্দ্রাণীর কাছে এ পথের যাত্রা নতুন। অতএব, ও ধরেই নিয়েছে, এ পথে গাড়ি এভাবেই চলে। ক্ষৌণীশের মনেও কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কাঁকর পাথর পেটানো, বলতে গেলে একরকম কাঁচা রাস্তাই বলা যায়। বর্ষায় রাস্তা

একটু খারাপ হতেই পারে। তবে ও ঠিক করেই রেখেছিল, বাঁ দিকে চাহালার বাংলো রেখে জিপ যখন উত্তর পশ্চিমে, নাওনার দিকে উঠবে, তার আগে ও ভোদকার বোতলে চুমুক দেবে না। রাস্তা ওর ভালোই চেনা আছে। তবে গ্রামগুলোর বাইরে দিয়ে রাস্তা গেলেও, আদিবাসী মেয়েপুরুষদের চোখে পড়ে। পথের আশেপাশে তাদের গৃহপালিত গরু মহিষ বাঁধা থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এবার তাদের চোখে পড়ছে খুব কম। গরু বা মোষের গাড়ি একটা চোখে পড়ে নি। ক্ষৌণীশ জিজ্ঞেস করলো, "সেলিম, গাঁয়ের লোকজন দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"বর্ষার সময় গাছ কাটার কাজ একদম বন্ধ থাকে।" সেলিম বললো, "নিচু আর সমান জমি যেখানে আছে, আর মাটি ভালো বানানো যায়, সেখানে চাষ আবাদ চলে। আর নতুন শাল সেগুনের চারা এখন কোথাও কোথাও পোতা হয়। বর্ষায় জঙ্গলে বিশেষ কাজ হয় না।"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের কাজের লোক পাওয়া যাবে তো?"

"তা ত জরুর পাবেন।" সেলিম হেসে বললো, "বাংলোর চৌকিদার বাংলো ছেড়ে কোথায় যাবে? তবে বর্ষার সময়ের কথা বলা যায় না। চৌকিদাররা যে-সব মাটির ঘরে থাকে, বর্ষায় তা প্রায়ই ভেঙে যায়। আর হাতি বহুত হুজ্জোত করে।"

"আঁ! ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো।

ক্ষৌণীশ হাসলো, "সেলিম মেমসাহেবকে আর ভয় দেখিও না। সেরকম বর্ষা হলে আলাদা কথা। সে তো কলকাতার মতো শহরেও কতো পুরনো বাড়ি ধসে পড়ে। শহর বন্যায় ভেসে যায়। আর এই জঙ্গল পাহাড়ে সেরকম বৃষ্টি হলে একটু তো অসুবিধে হতেই পারে। তাবে বড়াইপানির বাংলোর চৌকিদার আমাকে বলেছিল, বর্ষার সময় বউ বাচ্চা নিয়ে থাকতে সে ভরসা পায় না। তাদের গ্রামে রেখে আসে সকলের সঙ্গে থাকবার জন্য। সে নিজে বাংলোর কাঠের ঘরের দোতলায় থাকে। বেশি বৃষ্টি হলে হাতিরা জড়ো হয়। তবে কোনো ক্ষতি করে না। আমরাও তো থাকবো সেরকম কাঠের বাংলোর দোতলার ঘরে। জানালা খুলে দেখবো বুনো হাতির পাল। জীবন সার্থক হয়ে যাবে!"

"ও গো, দোহাই তোমার!" ইন্দ্রাণী সেলিমের সামনেই বাঁ হাত দিয়ে ক্ষৌণীশের গলা জড়িয়ে ধরলো, "আমি ওভাবে হাতির পাল দেখে জীবন সার্থক করতে চাই নে।"

ক্ষৌণীশ হেসে ইন্দ্রাণীর জিন্‌স পরা উরুতের ওপর হাত রেখে বললো, "শোনো খুশি, জঙ্গলের জানোয়াররা মানুষকে সব সময় এড়িয়ে চলে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তারা অকারণ তোমাকে দেখা দিতে আসবে না। আর তুমি থাকবে নিরাপদে। তোমাকে কোনো জানোয়ার স্পর্শ করতে পারবে না।"

"আমি তোমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকবো।" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের শরীরের ওপর নিজের সব ভার চাপিয়ে দিল। "তারপরে মরলেই বা আর কী।"

ক্ষৌণীশ হাসলো। ও দেখলো, জিপ দাঁড়ালো এক 'নাকা'-র কাছে। নাকা হলো জঙ্গলে ঢোকবার গেট। প্রত্যেক 'নাকা'তেই জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিপত্র দেখাতে হয়। বন্ধ 'নাকা' খুলে না দিলে, জঙ্গলের ভিতরে ঢোকা যায় না। যশিপুর থেকে জঙ্গলে ঢোকবার সময়েই প্রথম 'নাকা' পড়েছিল। 'নাকা'র একটা ছোট অফিসও থাকে। অনুমতিপত্রে কী ধরনের গাড়ি যাচ্ছে, তারও বিবরণ লেখা থাকে। বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকবার অনুমতি কারোকেই দেওয়া হয় না। কোনো 'নাকা'-তেই গাড়ি সার্চ করা হয় না। কেবল একবার নিয়ম মাফিক জিজ্ঞেস করে, বন্দুক আছে কি না।

ক্ষৌণীশ 'নাকা' দেখেই চিনতে পারলো, ওরা এসে পড়েছে চাহালায়। 'নাকা'র গার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ক্ষৌণীশ কাগজ দেখালো। গার্ড কাগজ দেখে ফেরত দিয়ে, মুখ তুলে একবার জিপ-এর পিছন দিকে দেখলো। হিন্দিতে হেসে বললো, "এখন তো টুরিস্টদের জঙ্গলে ঢোকার পারমিশন দেওয়া হয় না। চাহালার বাংলোতে যাচ্ছেন?"

"না।" ক্ষৌণীশ হাতের ঘড়ি দেখে বললো, "আমরা এখন সোজা যাবো জোরাণ্ডায়। রাস্তা ঠিক আছে তো?"

'নাকা' গার্ড বললো, "এ সময়ে রাস্তা ঠিক থাকে না। আরও তিন সপ্তাহ পরে রাস্তা সারানোর কাজ শুরু হবে। অক্টোবর মাসে বৃষ্টি থেমে গেলে ট্রাক লরি ঢুকবে। জোরাণ্ডার রাস্তা বৃষ্টিতে কিছু তো ভেঙে চুরে গেছেই। এখন আর বৃষ্টি না হলে, ভালো ভাবেই পৌঁছে যাবেন।" সে নাকার গেটের তালা খুলে, বৃহৎ শাল কাঠের গেট খুলে দিল।

সেলিম এঞ্জিন স্টার্ট করে জিপ চালালো। জিপ চললো উত্তর দিকে। রাস্তা ক্রমে ওপরে উঠছে। জিপ-এর গতি কমে আসছে। ক্ষৌণীশ ভোদকার বোতলের মুখ খুলে, খানিকটা গলায় ঢাললো। বোতল যথাস্থানে রেখে, সিগারেট ধরালো। গাড়ির গতি কমে যাওয়ায়, ওর মনে অস্বস্তি দেখা দিল। চড়াইয়ের রাস্তা একটু ভেজা আছে। তবে চাকা মাটি কামড়েই চলছে। দু পাশের গভীর জঙ্গলে মেঘের ঘন ছায়া। বাতাস ক্রমে কমে আসছে। একটু গুমোটের লক্ষণ রয়েছে। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশে খাদ। ক্ষৌণীশের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, একটি গাড়িও ওর এখন পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। ট্রাক, লরি, জিপ, কিছুই না। চাহালা পর্যন্ত তো সাধারণ প্রাইভেট গাড়ি অনায়াসে চলে আসে। কিন্তু একটিরও দেখা পাওয়া যায় নি। আদিবাসী দু একজন ছাড়া চোখে পড়ে নি।

জিপ যখন জোরাণ্ডার বাংলোর পরিখার সামনে এসে দাঁড়ালো, বেলা তখন দেড়টা। পরিখার ওপরে শাল কাঠের সেতু তুলে রাখা হয়েছে। হর্নের শব্দ পেয়ে খাকি হাফ প্যাণ্ট পরা খালি গায়ে একটি লোক বেরিয়ে এলো। চোখে তার অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সে পরিখার সামনে এগিয়ে এলো। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলে, "বাংলোয় গাড়ি ঢুকবে কেমন করে?"

"শাল কাঠের ব্রিজটা এখুনি নামিয়ে দেবে।" ক্ষৌণীশ বললো, "আমি এর আগে এই ব্রিজ তুলে রাখা দেখি নি। বাংলোটা পরিখা দিয়ে ঘেরা।"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"যাতে হাতি বাংলোর চত্বরে ঢুকতে না পারে। ব্রিজটাও বোধহয় সেজন্যই তুলে রেখেছে। পাতা থাকলে তার ওপর দিয়ে হাতি ঢুকতে পারে।" ক্ষৌণীশ বললো। এবং মুখ নাড়িয়ে হাফ প্যান্ট পরা খালি গা লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে, ওড়িয়া ভাষা মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমাকে চিনতে পারছো না।"

"পারছি বাবু।" লোকটি ওড়িয়া ভাষাতেই হেসে জবাব দিল, "আপনি যে এ সময়ে আসবেন বুঝতে পারি নি।" সে দড়ি দিয়ে টেনে তোলা শাল কাঠের সাঁকো নামাতে ব্যস্ত হলো।

সেলিম বললো, "চৌকিদার একলা সাঁকোটা নামাতে পারবে কি?"

চৌকিদারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, বড় একটা শাল গাছের গোড়ায় বাঁধা দড়ি খুলে, সাঁকো ধীরে নামাতে পারলো না। জোরে আওয়াজ করে পড়লো। চৌকিদারের পক্ষে এতো ভারি সাঁকোর ভার বহন করে আস্তে নামাবার উপায় ছিল না। সেলিম তৎক্ষণাৎ নিজের আসন থেকে নেমে গেল। সাঁকোর সামনে গিয়ে ভালো করে দেখলো। পা বাড়িয়ে উঠলো সাঁকোর ওপর। দেখে ফিরে এসে বললো, "গাড়ি চালিয়ে নেওয়া যাবে। একটা দুটো শাল সরে গেলে, চাকা ঢুকে যাবার ভয় ছিল। একলা কোনো মানুষের পক্ষে শাল কাঠের সাঁকো তোলা আর নামানো সম্ভব নয়।" সে জিপ স্টার্ট করে খুব আস্তে আস্তে চালালো।

জিপ সাঁকোর ওপর টালমাটাল অবস্থায় নানারকম শব্দ তুলে পরিখা পার হলো। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "সাঁকোটা এখুনি আবার তুলে দেওয়া হবে তো?"

"জরুর।" সেলিম বললো, "চৌকিদারের সঙ্গে আমি হাত লাগাবো। তা নইলে হাতি ঢুকে আসতে পারে।"

ইন্দ্রাণী উৎকণ্ঠিত চোখে ক্ষৌণীশের দিকে তাকালো। ক্ষৌণীশ হেসে বললো, "তাই বলে কি এখুনি হাতি ঢুকবে নাকি? সবই ধীরে সুস্থে হবে।"

সেলিম গাড়ি চালিয়ে নিয়ে একেবারে বাংলোর বারান্দার কাছে দাঁড় করালো। এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে গেল। চৌকিদার তার অপেক্ষাতেই সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষৌণীশ নামলো। তার পিছনে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর মুখ ভার। বললো, "আমার মোটেই ভালো লাগছে না। বেড়াতে এসে যদি সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।"

"কোনো ভয় নেই খুশি।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর কোমর জড়িয়ে ধরে বাংলোর বারান্দায় উঠলো, "বর্ষার সময়ে আমি কোন দিন আসিনি। এ সময়ে সাঁকোটা যে তোলা থাকে, জানতুম না। সাঁকো তুলে নিলেই আর কোনো ভয় নেই।"

সাঁকো তুলে দিয়ে চৌকিদার আর সেলিম ফিরে এলো। বারান্দায় চেয়ার পাতাই ছিল। চৌকিদার এসে ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণীকে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। ক্ষৌণীশ তার কুশল জিজ্ঞেস করে বললো, "আমি তোমাকে চাল ডাল সব বের ক'রে দিচ্ছি। তুমি রান্না চাপিয়ে দাও। মুরগি আছে বারোটা। সবগুলোকে বের করে পায়ে দড়ি বেঁধে ছেড়ে দাও। এবেলা একটা মুরগি রাঁধো। রাত্রে আলু দিয়ে ডিমের ডালনা করবে।"

"তুমি যে এতো ভালো ওড়িয়া ভাষা বলতে পারো আগে তো শুনি নি?" ইন্দ্রাণী চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে জিজ্ঞেস করলো।

ক্ষৌণীশ ভোদকার বোতল খুলে চুমুক দিল। বোতলের মুখ বন্ধ করে, দেওয়াল ঘেঁষে রেখে, বারান্দার নিচে নেমে গেল, "দরকার হয় নি, বলি নি। তাই শুনতে পাও নি। এখন শুনতে পাবে। যেমন ধরো, ছোটনাগপুরের জঙ্গলের আদিবাসীরা মোটামুটি হিন্দি বলতে পারে। তুমিও তাদের সঙ্গে হিন্দি চালিয়ে যেতে পারো। আর উড়িষ্যার এই জঙ্গলে, আদিবাসীরা সবাই মোটামুটি ওড়িয়া ভাষা বোঝে, বলতেও পারে। কিন্তু হিন্দি প্রায় অচল।"

"তুমি লোকটি বেশ কিছু চালু আছো।" ইন্দ্রাণী হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে এলো, "কিন্তু তা বলে চাল ডাল তোমাকে মেপে দিতে হবে না। ওটার ভার আমাকেই দাও।"

ইন্দ্রাণীর মুখে সামান্য ক্ষণের জন্য যে ছায়া নেমে এসেছিল এখন তা কেটে গিয়েছে। জিপের পিছনে গিয়ে পা-দানিতে পা রেখে ভিতরে ঢুকলো। আবার হেসে বললো, "তুমি তো মোট দুজনের খাবার কিনতে গেছলে। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, "সেলিম কোথায় খাবে, তখন তুমি জিভ কেটে একেবারে মা কালী। তারপরে তোমার মনে পড়ে গেল, কেবল সেলিম নয়, চৌকিদারের খাবারও কিনতে হবে। যাও, তোমার চৌকিদারকে বাসনপত্র দিয়ে পাঠাও। আর সেলিম এসে মুরগিগুলোকে জিপ-এর বাইরে নিয়ে যাক।"

ক্ষৌণীশ মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো। খোলা আকাশ উতল বাতাস। সামনে সব দিকেই পাহাড় ঘেরা। কেবল একটা দিকে পাহাড়ী ঢালু নেমে গিয়েছে অনেক নিচে এক জলাশয়ের কাছে! বাঁ দিকের পাহাড় থেকে নেমেছে একটা ঝর্না। জঙ্গল পাহাড়ের দৃশ্য দেখার জন্যই বাঁধানো চাল ঢাকা চত্বর তৈরী হয়েছে। বাংলোর অবস্থান একটি পাহাড়ের ধারে সমতল উপত্যকা। ক্ষৌণীশকে নিষ্কৃতি দিয়ে ইন্দ্রাণী চৌকিদারকে সব যুগিয়ে দিয়েছে।

বাংলোর মস্ত চত্বরের এক জায়গায়, পাহাড়ের ধার ঘেঁষে একটি বাঁধানো গোল মেঝের ওপর রয়েছে টিনের চাল। জঙ্গল পাহাড়ের দৃশ্য দেখার জন্যই বাঁধানো চাল পাকা চত্বর তৈরী হয়েছে। সেখানে বসে দূরের নিচে, জলাশয়ের ধারে গভীর জঙ্গল থেকে চোখ ফেরানো যায় না। ক্ষৌণীশ নিশ্চিন্ত হয়ে ভোদকার বোতল নিয়ে সেই চালার নিচে গেল। চিৎকার করে ডাকলো, "খুশি, এখানে এসো।"

ইন্দ্রাণী চৌকিদার আর সেলিমকে সব বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষৌণীশের কাছে এলো। ক্ষৌণীশ তখন ইন্দ্রাণীর কথা ভুলে অনেক নিচের জলাশয়ের বনের দিকে ঝুঁকে তাকালো। ভুল দেখে নি। এক দল হাতি বন থেকে বেরিয়ে জলের কাছে আসছে। সামনের হাতিটির বিশাল দুই দাঁত ওর প্রথম চোখে পড়েছে। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করলো, "কী দেখছো?"

"ঐ, ওদিকে তাকিয়ে দেখ।" ক্ষৌণীশ হাত তুলে দেখালো।

ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত দেখেই প্রায় চিৎকার করে উঠলো, "হাতির পাল!"

"চুপ।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে এক হাত দিয়ে নিজের পাশে টেনে নিচু স্বরে বলল, "ওরা রয়েছে অনেক দূরে। আমাদের কথা শুনতে পাবে না। কিন্তু ওদের কান খুব সজাগ। চীৎকার করলে পাহাড়ে একো করবে। হাতিরা চিৎকার শুনতে পেলে বনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। তুমি তো ভয় পেয়েছিলে। এখন নিরাপদ জায়গা থেকে বুনো হাতির দল দেখ।"

ইন্দ্রাণী খুশিতে বালিকার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, "কী বিরাট দাঁতালো হাতি! দাঁড়াও গুণে দেখি কটা রয়েছে..."

ক্ষৌণীশ ইতিমধ্যেই গুণে ফেলেছিল, পাঁচটি হাতি রয়েছে। ও বললো: "দাঁতালো হাতিটা পুরুষ। বাকি সব মেয়ে।"

"ওদের মধ্যেও পুরুষরাই প্রধান?" ইন্দ্রাণী হেসে জিজ্ঞেস করলো: "আমাদের সমাজ তা হলে পশুদের কাছ থেকেই পুরুষ শাষিত সমাজ গড়তে শিখেছে।"

ক্ষৌণীশ বললো, "বোধহয়। কিংবা বলতে পারো, ওটাই হয় তো প্রকৃতির বিধান।"

ইন্দ্রাণী কোনো জবাব দিল না। হাতির পাল তখন জলে নেমেছে। শুঁড়ে করে জল তুলে এ ওর গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। ও ক্ষৌণীশের গায়ে হেলান দিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বললো, "এমন রেয়ার দৃশ্য জীবনে হয় তো আর কোনো দিন দেখতে পাবো না। তুমি এর আগে এক সঙ্গে এতগুলো বুনো হাতি দেখেছো?"

"এতগুলো তো দূরের কথা। একটা বুনো হাতিও সিমলিপালের জঙ্গলে আগে দেখি নি। এবার তোমার ভাগ্যেই দেখা হল।" ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীকে বুকের আরও নিবিড় সান্নিধ্যে টেনে নিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সময়ে কালো মেঘ যেন বাংলোটাকে গ্রাস করলো। সামনে দূরের কৃষ্ণ নীল পাহাড়ও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লো। তারপরে নামলো বৃষ্টি। দুদিন সেই বৃষ্টি ঝরলো অঝোরে, আর অবিশ্রাম। ঘরের বাইরে পা দেবার উপায় নেই। বাংলো থেকে এক ফার্লং দূরে একটি মাচা ঘর আছে। জঙ্গলে সেই মাচা ঘরে মই বেয়ে উঠতে হয়। সামনে রয়েছে একটা জলাশয়। আর জায়গায় জায়গায় গর্ত করে ছড়ানো আছে নুন। হাতিরা সেই

জলাশয়ে জল আর নুন খেতে আসে। কিন্তু সেখানে যাওয়া দূরের কথা, ঘর থেকেই বেরোনো সম্ভব হলো না।

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণী খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া দুদিন ঘর থেকে বেরোলো না। বাথরুম ছিল শোয়ার ঘরের সংলগ্ন। অরণ্যের এই নিবিড় ঘন বর্ষায় দুজনে জীবনকে ভোগ করলো এক নতুন মত্ততার মধ্যে।

তৃতীয় দিন বৃষ্টি ধরলো। আকাশের মুখ যেমন কালো, ছিল, তেমনিই রইলো। দুপুরের খাওয়ার পাট মিটে যাবার পর ক্ষৌণীশ বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেলিমকে ডেকে বললো, "সেলিম, আমি বড়াইপানি বাংলো যাবো।"

সেলিম তৈরি হলো। কিন্তু মুখে উদ্বেগের ছায়া। ইন্দ্রাণী ওর দুদিনের পরা ম্যাক্সি সুটকেশে ঢুকিয়ে আবার জিন্‌স্‌ পরে নিল। ভোগের একটা ক্লান্তি থাকে। ওর আর ক্ষৌণীশ, দুজনেরই সেই ক্লান্তি ছিল। বড়াইপানির উদ্দেশে বেরোতে গিয়ে প্রথম বাধা পড়লো সাঁকো ভেঙে। জিপ পরিখা পার হতে পারলো না। চৌকিদার আর সেলিম যতো শক্ত করেই ভেজা দড়ি চেপে ধরুক শাল গুড়ির ভারি সাঁকো পিছলে পড়লো। কয়েকটা লম্বাগুড়ি ছিটকে খুলে গেল। সেগুলো মেরামত না করে উপায় ছিল না। আর তা মেরামত করতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তুমুল না হলেও তখন ইলশে গুঁড়ির ছাটের মতো বৃষ্টি শুরু হয়েছে' সেলিম বললো, "গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে, কোনো মতে চাহালা বাংলো পর্যন্ত যেতে পারি। বড়াইপানি কিছুতেই যাওয়া হবে না। আর যদি পথে হাতি পড়ে..."

"আমি যাবো না।" ইন্দ্রাণী বেঁকে বসলো।

ক্ষৌণীশ সেলিমের কথায় বিরক্ত হয়ে বললো, "কেন তুমি মেমসাহেবকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছো? ওসব কথা তুমি আর একবারও বলবে না।"

সেলিমের মুখে কোনো অপরাধের অভিব্যক্তি ছিল না। কারণ সে মিথ্যে আশংকা করে কিছু বলেনি। পথে হাতির দেখা মিলতেই পারে, এবং সেটা খুব স্বাভাবিক। সেলিম ক্ষৌণীশের কাছে ক্ষমা চাইলো না। দুঃখও প্রকাশ করলো না। ইন্দ্রাণী বললো, "কেন এই বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছো? আজ না গিয়ে কাল সকালেই না হয় যাবো।"

"সকাল আর রাত্রিতে কোনো তফাৎ এখানে নেই।" ক্ষৌণীশ বললো, "বৃষ্টি দিনেও হতে পারে, রাত্রেও হতে পারে। কেন তোমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো? আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভয় কী?"

সেলিম জিপ স্টার্ট করলো। জিপ-এর গতি ঘণ্টায় সাত থেকে দশ কিলোমিটারের বেশি তোলা যাচ্ছে না। ক্ষৌণীশ নিজেই বুঝতে পারছে ভেজা রাস্তায় চাকা স্কিড্‌ করতে পারে। পাহাড়ের পথে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। ওরা যখন চাহালায় পৌঁছলো বাংলোয় তখন কেউ ছিল না। ঝিপঝিপ বৃষ্টি পড়ছে। জিপ থেকে নেমে কোথাও দাঁড়াবার জায়গায় ছিল না। ক্ষৌণীশ বললো,

"নাকা সামনেই। আমার মনে হচ্ছে চৌকিদার নাকায় চলে গেছে। একলা থাকার চেয়ে সেটাই ভালো। তোমরা থাকো আমি নাকা থেকে ঘুরে আসছি।"

"আমি যাচ্ছি সার।" সেলিম নিজেই জিপ থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী কথা বলছে না। ক্ষৌণীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, "বর্ষাটাই যা উৎপাত করছে। রাত পোহালেই দেখা যাবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"কেন বাজে কথা বলছো?" ইন্দ্রাণী ঝেঁজে উঠলো, "তুমি একজন আর্কিটেকট এ্যান্ড এঞ্জিনিয়ার বলেই জানি। আবহাওয়াবিদ্ কবে থেকে হলে?"

ক্ষৌণীশ সিগারেটে টান দিল, "আবহাওয়াবিদরাও তো ভুল করে। কাল সকালেও যে বৃষ্টি হবেই এমন ফোরকাস্ট কে করতে পারে?"

"এখন চুপ করে বসে দেখ, তোমার বাংলোর চৌকিদারকে পাওয়া যায় কিনা।" ইন্দ্রাণীর রুষ্ট স্বরে তেমনিই ঝাঁজ। "নইলে তো রাত্রে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে না।"

ক্ষৌণীশকে চুপ করতেই হলো। কারণ এ ব্যাপারে সত্যি ওর কিছু বলবার ছিল না। বাংলোর চৌকিদারকে না পেলে বিড়ম্বনার একশেষ হবে। রাস্তার যা অবস্থা এই রাত্রে বড়াইপানি যাবার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ ওর অনুমানই ঠিক ছিল। চৌকিদারকে নাকাতেই পাওয়া গিয়েছে। সেলিমের সঙ্গে ওকে দেখে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু সেলিম বেচারি ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। চৌকিদার একটা চটের বস্তায় মাথা বাঁচিয়েছে।

রাত্রিটা কাটালো চাহালার বাংলোয়। কোনোরকমে খিচুড়ি আর ডিম দিয়ে খাওয়া সারা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যটা বোধহয় ক্ষৌণীশেরই। তারপরেও দুদিন বৃষ্টি থামলো না। বৃষ্টির প্রাবল্যও বেড়েছিল। ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরোলো না। ক্ষৌণীশের অবস্থাও সেইরকম। যতোবারই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা বলতে গেল, একটা জবাবও পেলো না। ফলে ওর মদ্য আর ধূমপান ছাড়া করার ছিল না কিছুই। ইন্দ্রাণী যদিও বা চৌকিদারের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়েছে সেলিমের সঙ্গে দু চারটি কথা বলেছে, ক্ষৌণীশের সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। ক্ষৌণীশ আদর করে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। ইন্দ্রাণী শত-মুখে চিবিয়ে চিবিয়ে পরিষ্কার বলেছে, "আয়াম নট আ মেটিং বিচ্ ফর আ ডগ ইন দ্য ফরেস্ট।"

দুদিন বৃষ্টির পরে, তৃতীয় দিনের সকালে চাহালার জঙ্গলে সোনার মতো রোদ উঠলো। আকাশ অনেকটাই শরতের মতো। মেঘ ভেসে চলেছে। জমতে পারছে না। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দুপুরের রোদ দেখে মনে হলো, দুদিনের সিক্ততাকে শুকিয়ে খট খট করে তুলছে।

সেলিম বেলা একটার সময় নিজেই প্রস্তাব করলো, "বড়াইপানি চলুন

সাব।"

ইন্দ্রাণীর মুখেও হাসি ফুটেছে। ক্ষৌণীশকে ঘরের মধ্যে একলা পেয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলেছে, "আমি তো তোমার চেয়ে অনেক অবুঝ আর বোকা। তাই না? বয়সটা কোনো ব্যাপারই নয়। যতো ছোটই হই। ক্ষমা চাইছি।" ও মুখ তুলে ধরেছে ক্ষৌণীশের মুখের কাছে।

ক্ষৌণীশের মনে অভিমান ছিল। ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে ইংরেজিতে ঐরকম একটা ইতর কথা শুনে আহত হয়েছিল। ইন্দ্রাণী যে অনায়াসে ঐ রকম কথা ওকে বলতে পারে, ধারণা করতে পারে নি। কিন্তু ইন্দ্রাণী যখন আশা চেয়ে মুখ তুলে ধরলো, ও প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। দু হাত ভরে বুকের নিবিড় সান্নিধ্যে টেনে চুম্বন করলো। সেই অশ্লেষ চুম্বনে ইন্দ্রাণী গভীর-ভাবে সাড়া দিল। দীর্ঘ চুম্বনের পর ক্ষৌণীশ বললো, "খুশি, জঙ্গলের এই বৃষ্টির অভিজ্ঞতা আমার নেই। তোমার রাগ হতে পারে সেটা অস্বীকার করতে পারি নে। কিন্তু আমি যে অসহায়।"

"এই নিয়ে আর কোনো কথা নয়।" ইন্দ্রাণী হাত তুলে ক্ষৌণীশের ঠোঁটে চাপা দিয়ে বললো, "বিশ্বাস কর, কথাটা বলে ইস্তক মনে শান্তি ছিল না। চলো দুপুরের খাবার নিয়ে আমরা বড়াইপানি চলে যাই।"

দুপুরের খাবার পরেই ওরা বড়াইপানির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। সিমলিপালের বনে বনে রৌদ্র মেঘের খেলা। রাস্তা শুকিয়ে উঠছে। কিন্তু জিপ এর গতি বাড়াবার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। বিকেল চারটের আগেই ওরা বড়াইপানি বাংলোয় পৌঁছে গেল। চৌকিদারকেও পাওয়া গেল। ক্ষৌণীশকে দেখেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। কুশল বিনিময়ের পরেই দোতলা কাঠের বাংলোর দরজা খোলা হয়ে গেল। জিপ থেকে মালপত্র নামানো হল। ইন্দ্রাণী বড়াইপানির সুন্দর ঝর্ণা দেখে মুগ্ধ। বাংলোর দোতলার বারান্দায় টেবিলের সমনে চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে ও ছেলে-মানুষের মতো কথায় হাসিতে ছল্ ছল্ করে উঠলো। গান করলো। কবিতা আবৃত্তি করলো। আর ক্ষৌণীশকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করলো না।

দুদিন বড়াইপানিতে থেকে তৃতীয় দিন সকালে ক্ষৌণীশ সেলিমকে বললো, "জেনাবিল চলো। একরাত্রি থেকে, পরশু আমরা যশিপুর ফিরে যাবো। আর তো মাত্র দুদিনের খাবার আমাদের আছে।"

সেলিম প্রাণ খুলে হেসে ক্ষৌণীশের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলো না। আকাশে মেঘ ভেসে চলেছে। রৌদ্রঝলক দিচ্ছে থেকে থেকেই। বাতাসও আছে। রাস্তাঘাট শুকিয়ে যাচ্ছে। খানাখন্দ শুকোতে এখনও দেরি হবে। কিন্তু আবার—যদি বৃষ্টি নামে, জেনাবিলে আটকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ক্ষৌণীশ সেলিমকে বলেই বেরোবার জন্য তৈরি হলো। ইন্দ্রাণী গুন গুন করে গান করছে। প্রাতঃরাশ সেরেই বেলা সাড়ে নটায় জিপ রওনা হলো। আবার উৎরাই

যাত্রা। নাওয়ানা হয়ে জেনাবিলের দূরত্ব কম ছিল না। দুপুরে খাবার সময়ে পেঁছনো প্রায় অসম্ভব ছিল। ক্ষৌণীশ দেখলো আবহাওয়া ভালো হলেও রাস্তার অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয়। বৃষ্টি ভেজা রাস্তা শুকোতে আরম্ভ করেছে। তবু চড়াই ওঠবার সময়, উৎরাইয়ে নামার সময় গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে।

ক্ষৌণীশ ভাবলো তা হোক। জিপ চললেই হলো। আবহাওয়া যদি এরকম থাকে, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধুধুরো চম্পার বাংলো পেরিয়ে যাবার পরেই হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। কালো মেঘ জমে উঠলো পাহাড়ের জঙ্গলের মাথায়। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হলো। ইন্দ্রাণী বললো, "আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ। আবার বৃষ্টি নামলো। জেনাবিল এখান থেকে কতো দূর ?"

"বেশি দূরে নয়।" ক্ষৌণীশ ঘড়ি দেখে বলল, "এভাবে চললে বেলা আড়াইটে নাগাদ পেঁছে যাবো।"

রাস্তা আবার ভিজে উঠতেই সেলিমকে সাবধান হতে হলো। গাড়ির গতি অনেক কমে এলো। ক্ষৌণীশ জানতো, তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওরা জেনাবিল পেঁছালো আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে। বাংলোয় চৌকিদার ছিল। সে ক্ষৌণীশকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করে বাংলোর দরজা খুলে দিল। প্রত্যেক বাংলোর মতো জেনাবিলের বাংলোও পাহাড়ের ওপর। কিন্তু জঙ্গল গভীর। পরিখার সাঁকো পাতাই ছিল। এই বাংলোর চৌকিদারের মতে হাতি সাঁকোতে পা দিতে ভয় পায়। হাতি তার শরীরের ওজন সম্পর্কে খুবই সজাগ প্রাণী। বাংলোর সাঁকোকে তারা ফাঁদ বলে মনে করে। অথচ জোরাণ্ডার চৌকিদার ভয়ে সাঁকো তুলে রেখেছিল।

জেনাবিলের বাংলো বড়াইপানির মতোই কাঠের দোতলায়। নিচে ফাঁকা গাড়ি রাখার জায়গা। হাতি এলেও এসব বাংলোর মানুষ নিরাপদ থাকে। জেনাবিলে পেঁছোবার আগেই টিপ টিপ বৃষ্টির ধারা পড়তে আরম্ভ করেছিল। বাংলো পেঁছে বৃষ্টি নামলো ঝর ঝর ধারায়। বাংলো আর তার আশপাশ ঘেরা জঙ্গলকে যেন মেঘ বৃষ্টি গ্রাস করে ফেললো।

ইন্দ্রাণীর মুখেও নেমে এসেছে গাঢ় মেঘ। ওর সমস্ত আনন্দ এখন চূড়ান্ত বিমর্ষতায় ডুবে গিয়েছে। আর যুক্তিহীন একটা রাগ আর বিরক্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, ক্ষৌণীশকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির দুর্যোগের জন্য ক্ষৌণীশই ওর কাছে দায়ী। আসলে ওর প্রত্যাশিত অরণ্য ভ্রমণ ও ভোগ প্রথম থেকেই বাধা পেয়েছে। তার জন্য ওর মনের ভিতরটা মাঝে মাঝেই গুমরে উঠেছে। আবার বৃষ্টির বিরামে রৌদ্র দেখেই প্রাণ খুশিতে নেচে উঠেছে। আর ও এমনভাবেই ক্ষৌণীশের প্রতি নির্ভরশীল বাইরে বেরিয়ে যে কোন দুরবস্থার জন্যই ক্ষৌণীশকে দায়ী করা ছাড়া ও আর কিছুই ভাবতে পারে না। জোরাণ্ডায় বৃষ্টির দু রাত ও একটা নতুন সুখের মত্ততায় আচ্ছন্ন ছিল। তারপর থেকে

আকাশের মুখ কালো হয়ে উঠলেই একটা বিমর্ষতা ওকে গ্রাস করছে। জঙ্গলের এই বৃষ্টিতে কেমন একটা ভয় পেতেও শুরু করেছে। ও বাংলোয় নেমে সোজা দোতলায় গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে খাটের বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ক্ষৌণীশ সবই দেখলো। কিন্তু ওর করার কিছুই ছিল না। ও নতুন করে এই দুর্যোগকে ডেকে আনেনি। হয় তো বড়াইপানি থেকে যশিপুরের দিকে নেমে গেলেই সবরকমের সংকট কেটে যেতো। কিন্তু যদি বৃষ্টি না নামতো তাহলে? ইন্দ্রাণী জেনাবিলে না আসার দুঃখ ভুলতে পারতো না। আর তার জন্য দায়ী করতো ক্ষৌণীশকেই। এখন আর কোনো উপায় নেই। তবু খুব কম গতিতে এলেও নিরাপদেই জেনাবিল বাংলোতে পৌঁছানো গিয়েছে। সেলিমের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে আর জেনাবিল আসার ঝুঁকি নিতে চায়নি। বড়াইপানিতে ক্ষৌণীশ যখন জেনাবিলে আসার কথা ঘোষণা করেছিল সেলিমের মুখে তখনই ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। ক্ষৌণীশ সেলিমের মুখের ছায়াকে তেমন আমল দেয়নি। ও আশা করেছিল, বৃষ্টি তার শেষ মারের ইতি করেছে। কিন্তু বেচারি ক্ষৌণীশ! প্রকৃতির মতিগতি গতিবিধির কথা ও ভাবেনি। সেলিম আর চৌকিদারের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে বাংলোর ওপরে উঠে গেল। ইন্দ্রাণী যে ঘরের খাটে শুয়েছিল আগে সে ঘরেই গেল। খাটের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, "খুশি, শরীর খারাপ লাগছে?"

"ন্যাকামি করো না।" ইন্দ্রাণী ঝটিতি অন্য পাশে ফিরলো, "কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এই জেনাবিল মড়ার বিলে আসার? এই বৃষ্টি যদি আজ রাত্রের মধ্যে না ধরে তা হলে কী হবে?"

ক্ষৌণীশের মুখও শক্ত হলো। এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই ও হেসে বললো, "খুশি এই হঠাৎ আবার বৃষ্টির কোনো আগাম খবর আমার জানা ছিল না। থাকলে বড়াইপানি থেকেই যশিপুরে চলে যেতুম। আবহাওয়া ভালো দেখেই ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে জেনাবিলটা দেখিয়ে নিয়ে যাই..."

"কেন সেই ইচ্ছে তোমার হলো সেটাই আমি জানতে চাই।" ইন্দ্রাণী ফুঁসে উঠলো, "তুমি এ জঙ্গলে নতুন আসো নি। আর তুমি কচি খোকাও নও। এ ওয়েদারকে যে বিশ্বাস করা যায় না, তা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।"

ক্ষৌণীশ শান্ত কোমল স্বরে বললো, "খুশি, তোমার এখন মেজাজ খারাপ মুখে যা আসছে তাই বলছো। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো বর্ষাকালে আমি কখনো সিমলিপালের জঙ্গলে আসি নি।"

"তবে এবারই বা আসতে গেলে কেন?" ইন্দ্রাণী সাপের ফণা তোলার মতো উঠে বসে বললো। ওর মাথার চুল অবিন্যস্ত। কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। "তোমাকে সবাই এসময়ে জঙ্গলে ঢুকতে বারণ করেছিল। যশিপুরের অফিসার সেলিমের বাবা কেউই চায়নি এসময়ে জঙ্গলে আমরা আসি। তবু তুমি কেন এসেছিলে?"

ক্ষৌণীশ হাসলো, "তখন আমি এ দুর্যোগের কথা ভাবি নি। খুশি,

এটাও তো একটা অভিজ্ঞতা। মনে রাখার মতো। তা ছাড়া, আমরা এমনকি বিপদের মধ্যে আছি? ভয় পাবারও কিছু নেই। হয়তো দেখবে আজ রাত্রেই বৃষ্টি থেমে গেছে। কাল সকালে ঝকঝকে রোদ উঠেছে।"

"ওসব তোমার মতো আকাশকুসুম কল্পনা করা আমার স্বভাবে নেই।" ইন্দ্রাণী শক্ত মুখে ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে ঝেঁজে বললো, "আমি পোড়-খাওয়া মেয়ে। রোমাণ্টিসিজমের ধার আমি ধারিনে।" বলেই ও আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

ক্ষৌণীশের মুখে বিমর্ষ হাসি। ইন্দ্রাণী ওকে বলছে আকাশ কুসুম কল্পনার কথা। ও পোড় খাওয়া মেয়ে। ক্ষৌণীশ কি সুখশয্যার বিলাসে মানুষ হয়েছে? কিন্তু ও জানে, এখন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তর্ক করা আর তারের খাঁচায় বন্দী একটা গোখরোর পাশে দাঁড়িয়ে নড়াচড়া করাও এক কথা। ও আর একটা শোবার ঘরে গেল। ফোমের ব্যগ খুলে বের করলো হুইস্কির বোতল। ভোদকা আর জিন শেষ। দিনের বেলা হুইস্কি খেতে ইচ্ছা করে না। আপাতত কোনো উপায় নেই। ঘরে তখনও জলের জাগ গেলাস দেওয়া হয়নি. ও হুইস্কির বোতল নিয়ে নিচে নেমে গেল।

জেনাবিলে আসার পর প্রকৃতি যেন এক নির্মম খেলায় মেতে উঠলো। তিন দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে সির্মালিপাল জঙ্গল এক ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। ক্ষৌণীশ যে জঙ্গলকে দেখে বারবার মুগ্ধ হয়েছে, সেই জঙ্গল যেন এবার একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য ওর মুখোমুখি হলো।

চৌকিদারের কাছ থেকে প্রথম খবর এলো. একটি বিশাল অজগর বাংলোর বাইরে আড়ালে অর্জুনের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টিতে তাকে আগুন নিয়ে তাড়া করার উপায় নেই। চৌকিদার তার গরু বাছুরের জন্য চিন্তিত। একটি বল্লম তার সম্বল। সেটা দিয়ে সে অজগরটাকে অনেকবার আঘাত করা সত্ত্বেও তাকে তাড়ানো যাচ্ছে না। তবে অজগর পালাবারই চেষ্টা করবে। অন্যথায় চৌকিদার বাধ্য হয়ে বেআইনিভাবে অজগরটিতে হত্যা করবে। তার চেয়ে খারাপ খবর, জেনাবিল বাংলোর চারপাশে জড়ো হয়েছে বড় একপাল হাতি। অবিশ্যি বাংলোয় ঢোকবার কোনো উদ্যোগ তারা করছে না।

তৃতীয় দুঃসংবাদ খাদ্যের অপ্রতুলতা। সবই প্রায় নিঃশেষ। শেষ পাঁউরুটিটি পচে গিয়েছে। তৃতীয় দিন রাত্রে চাল ডাল সংযোগে কোনো ক্রমে বিস্বাদ খিচুড়ি হয়েছে। চতুর্থ দিন সকালে প্রাতঃরাশের কিছুই ছিল না। কিন্তু একটি সুলক্ষণ দেখা গেল। বৃষ্টি কমে এসেছে। বিরামহীন ঝরলেও সে রকম অঝোর ধারা নেই।

ক্ষৌণীশ বাংলোর দোতলা থেকে নিচে নেমে এলো। গতকাল রাত্রে ইন্দ্রাণী ওর সমস্ত রাগ ভুলে ক্ষৌণীশের বুকের ওপর পড়ে কেঁদেছে। যেন ক্ষৌণীশ ওকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে এসেছে। আতঙ্কে ভয়ে ও অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে। অবিশ্যি দুশ্চিন্তার কারণ অনেক ছিল। তার মধ্যে একটা

বড় কারণ খাদ্য শেষ। বারোদিন অতিক্রান্ত। বস্তুতপক্ষে হিসাব ছিল বড়-জোর আটদিন জঙ্গলের মধ্যে থাকা হবে। দুদিন বাড়িয়ে ধরে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ক্ষৌণীশ চৌকিদারকে ডেকে জানতে চাইলো, সে অন্তত একবেলার মতো চাল ডালের ব্যবস্থা করতে পারবে কিনা। চৌকিদার জানালো তার ঘরে কিছু চাল আর সামান্য ডাল আছে। সাহেবদের খাবার জন্য সে তা দিতে পারে। সাহেবরা যদি আর একদিন থাকে, তা হলে চৌকিদারকে কাছেপিঠে গ্রামে খাদ্যের সন্ধানে যেতে হবে। তবে মনে রাখতেই হবে, এই বর্ষার সময়ে গ্রামের আদিবাসীদের ঘরে ঘরেও খাদ্যের অকুলান, সমস্যা প্রচণ্ড। এই নিদারুণ দুঃসংবাদের মধ্যে সে আরও দুটি সুখবর দিল। হাতির পাল চলে গিয়েছে। অজগরটিও অদৃশ্য হয়েছে। সে যে বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে নেই সে বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছে।

ক্ষৌণীশ সেলিমের সঙ্গে কথা বললো। "বৃষ্টি তো কমে আসছে। কোনোরকমে দুপুরে একটু খাবার মুখে দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে আমাদের জিপ বের করা দরকার। এবার আমাদের নামতে হবে গুরগুরিয়া দিয়ে। জেনাবিল থেকে যশিপুরের সেটাই হবে শর্টকাট রাস্তা।"

"সাহেব আপনি ঠিকই বলেছেন।" সেলিমের চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া। "যে পথেই যাব, চড়াই উৎরাই বহুত আছে। রাস্তা ভেজা। জলও জমেছে অনেক জায়গায়। টু হুইলার বিগড়ে বসলে, মুশকিলে পড়তে হবে।"

ক্ষৌণীশ সেলিমের কথা মেনে নিয়েও বললো, "তবু আমাদের বেরোতেই হবে। ঈশ্বর আর আল্লার নাম নিয়ে। এভাবে এখানে আর থাকা যায় না। তবে জিপ এর স্টিয়ারিং ধরবো আমি। আমিই চালাবো।"

"আপনার যা মর্জি।"

বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে চৌকিদারের দেওয়া চাল ডালের ঘ্যাঁট কোনোরকমে উদরস্থ করে জিপ ছাড়লো। ক্ষৌণীশ ড্রাইভ করছে। পাশে ইন্দ্রাণী। ওর চোখের কোল বসে গিয়েছে। মুখ শীর্ণ দেখাচ্ছে। উদ্বেগ বিরক্তি বিমর্ষতা সমস্ত কিছু ওর মুখে চেপে আছে। ক্ষৌণীশ গাড়ি চালাতে চালাতে বুঝতে পারছে জিপ-এর চাকা কাঁকর আর জল মাটি কাদায় ঘুরে যাচ্ছে। পাঁকের ওপর চড়াই বা উৎরাইয়ে ব্রেক প্রায় কোনো কাজই করছে না। যে কোন অল্প উঁচু চড়াইয়ের উঠতে গিয়ে টু হুইলার জিপ-এর আহত কান্নার কঁকানি বেজে উঠছে। কমে আসা বৃষ্টিব থামবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তা জিপের ভিতরেও ভিজিয়ে দিচ্ছে।

ক্ষৌণীশের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হলো গুরগুরিয়া বাংলো পেঁৗছবার আগেই। একটা চড়াই কোনোরকমে উঠে উৎরাইয়ে নামতে গিয়ে ঘট ঘট শব্দে জিপ থেমে গেল। আর কাত হয়ে পড়লো একদিকে। সেলিম পিছন থেকে চিৎকার করে উঠলো, "সাহেব আপনি মেমসাহেবকে নিয়ে জলদি নেমে পড়ুন। জিপ-এর বাঁ

দিকের চাকা রাস্তার বাইরে চলে গেছে। এখুনি নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে।"

ক্ষৌণীশ বাঁ হাতে ইন্দ্রাণীকে টেনে নিয়ে ডান দিকে নেমে পড়লো। আর মুহূর্তেই ওর কেডস পিছলে ইন্দ্রাণীকে নিয়েই খানাখন্দ ভেজা রাস্তায় পড়ে গেল। ইন্দ্রাণী পড়লো ওর সঙ্গে আর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর হাত ছাড়েনি। খানিকটা গড়িয়ে গিয়েই ডানদিকের একটা গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে পা চেপে থামলো। ইন্দ্রাণীকে কাছে টেনে বললো, "শোনো খুশি কেঁদো না। আমি তোমাকে..."

"বটে!" ইন্দ্রাণীর চোখে জল। দৃষ্টি আতঙ্কিত। সেই অবস্থাতেই ক্ষৌণীশের হাত থেকে ছাড়িয়ে তাকে গলার কাছে সজোরে একটা থাপ্পড় কষালে এবং পরমুহূর্তেই কেঁদে উঠলো "এটা আমাকে খুন করার কূট পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি যদি টের পেতাম তাহলে কখনোই আসতাম না।"

ক্ষৌণীশের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। ইন্দ্রাণী মৃত্যুভয়ে যতোই দিশেহারা হোক, গায়ে হাত তোলার মতো ধৃষ্টাতা আমার্জনীয়। বিশেষ করে সেলিমের সামনে এই অপমান অসহ্য। ও পেছল কাদায় উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি তোমাকে মাথায় করে আনি নি। আসবার জন্য মাথার দিব্যিও দিইনি। কষ্ট আমাকেও পেতে হচ্ছে। বলে রাখছি, বিহেভ ইয়োরসেলফ—"

"ননসেন্স!" ইন্দ্রাণী বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

ক্ষৌণীশ ঝেঁজে উঠল, "সাট আপ। ফার্দার কোনোরকম অসভ্যতা করলে, পাহাড়ের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।"

"য়ু লোফার। য়ু ডগ!" ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের ট্রাউজার চেপে ধরার চেষ্টা করলো।

ক্ষৌণীশ দ্রুত সরে গেল, আর পা তুলে কেডস দিয়ে ইন্দ্রাণীর মাথায় লাথি মারতে উদ্যাত হলো। সেলিম উদ্যত হয়ে ডেকে উঠলো, "সাব!"

ক্ষৌণীশ পা নামিয়ে নিল। মুহূর্তেই ও নিজেকে সামলে নিল। লজ্জা পেলো, আর সেলিমের কাছে কৃতজ্ঞতাও বোধ করলো। সে বাধা না দিলে হয়তো ও ইন্দ্রাণীকে আঘাত করে বসতো। তা হলে ওর আর অনুশোচনার অন্ত থাকতো না।

ইন্দ্রাণী তখন দু হাতে মুখ ঢেকে প্রায় আর্তস্বরে কাঁদছে।

ক্ষৌণীশ দেখলো, গাছের উপর থেকেই কেবল জোঁক মাথায় গায়ে পড়ছে না। আশপাশের আগাছা আর কাদার ওপর দিয়ে ছিনে জোঁক দুজনকে আক্রমণ করছে। ও লাফিয়ে উঠে ইন্দ্রাণীর হাত টেনে তুলে দাঁড় করালো। "খুশি, চলতে শুরু কর। জোঁক আমাদের গায়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। গাছের ওপর থেকেও পড়ছে।"

ইন্দ্রাণী লাফ দিয়ে পাগলের মতো উৎরাইয়ের পথে পা বাড়ালো।

ক্ষৌণীশের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো আবার কাদায়। ক্ষৌণীশ মাথা আর গলার কাছ থেকে জোঁক টেনে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ইন্দ্রাণীর কাছে এগিয়ে গেল। কোনো কিছু না ভেবে, ইন্দ্রাণীকে টেনে তুলে নিল কাঁধের ওপর। ততক্ষণে ওর চোখে পড়েছে, উৎরাইয়ের নিচে বাঁ দিকে ছোট একটা আদিবাসী গ্রাম। ইন্দ্রাণী পা ছুঁড়ে, হাত দিয়ে ক্ষৌণীশকে যেখানে পারছে সেখানেই আঘাত করছে, "য়ু বিস্ট! কেন তুমি আমাকে এই নরকে নিয়ে এসেছিলে? কেন..."

ক্ষৌণীশ দাঁতে দাঁত চেপে কেবল বললো, "খুশি শান্ত হও। সামনের গ্রামে গিয়ে আমি তোমার কমফোর্টের ব্যবস্থা করবো।"

"রাবিশ! য়ু লায়ার! বাস্টার্ড,..." ওর গলা বন্ধ হয়ে এলো। আর হাত পা এলিয়ে পড়লো। রাগে অবিশ্বাসে ওর যেন হিস্টিরিয়াগ্রস্থ অবস্থা।

ক্ষৌণীশ গ্রামে ঢুকে সামনেই যে-বাড়িটি পেলো, তার উঠোনে ঢুকলো। একটা ঘরের দাওয়ায় ইন্দ্রাণীকে বসিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ দুটি আদিবাসী মেয়ে আর একজন পুরুষ এগিয়ে এলো। এক তরুণী কিছু জিজ্ঞেস করলো। ক্ষৌণীশ ওড়িয়া ভাষায় জবাব দিল। তরুণী দুটি তখনই ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে ওর গা মাথা পা হাত থেকে জোঁক টেনে টেনে বিচ্ছিন্ন করে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। ইন্দ্রাণী তখন কেবল কাঁদছে। ওর চোখ মুখ আতঙ্কে ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। পুরুষটি ক্ষৌণীশকে জোঁকের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। ও নিজেও জোঁক টেনে টেনে ফেললো। বললো, "নুন নিয়ে এসো। নইলে এ জোঁকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।"

দুই তরুণী হেসে উঠলো। একজন ওড়িয়া ভাষায় বললো, "বাবু। আমাদের এ গাঁয়ের কোনো ঘরে এক চিমটি নুন নেই। আমরা নুন ছাড়াই খাচ্ছি।"

অথচ এই মর্মন্তুদ কথাটি বলতে মেয়েটির মুখে কোনো হতাশা বা দুঃখ ফুটলো না। সম্ভবতঃ তাদের জীবনেরই এটা একটা অঙ্গ। পুরুষটি হেসে বললো, "প্রত্যেক বর্ষায় আমাদের এই দুর্গতি। যেটুকু নুন সঞ্চয় করে রাখতে চাই তাও গলে যায়।"

ক্ষৌণীশের মনে হলো, ওর পেটে একটা ব্যথা মুচড়ে উঠছে। মুখ বিস্বাদ। ও জোঁক মুক্ত হয়ে দাওয়ার এক পাশে বসলো। ইন্দ্রাণী তখন দাওয়ায় শুয়ে পড়েছে। ক্ষৌণীশ ওড়িয়া ভাষায় দুরবস্থার বর্ণনা করছে।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ উঠে বসে, চিৎকার করে বললো, "ওদের তুমি কী বোঝাচ্ছো, জানিনে। ভাষা জানলে, আমি বলতাম, তুমি একটা জঘন্য খুনী আর লম্পট ছাড়া কিছু নও। তুমি আমাকে জঙ্গলে নিয়ে এসেছিলে, যেমন খুশি ভোগ করার জন্য..."

"কেন এসব কথা বলছো খুশি।" ক্ষৌণীশের স্বরে প্রতিবাদের সুর,

ওর মুখ আবার শক্ত হয়ে উঠলো। বললো, "আমি আবার বলছি, তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসিনি। তুমিই আসতে চেয়েছিলে, আর ব্যস্তও হয়েছিলে। এখন এসব কথা কেন বলছো। কী করেই বা আমি জানবো, এ সময়ে বর্ষা হবে, জঙ্গলের অবস্থা এরকম হবে?"

ইন্দ্রাণী দাওয়ার ওপর ওর কেড্‌সে লাথি মেরে বললো, "শাট আপ য়ু রাসকেল! আদার ওয়াইজ..."

"বিচ্‌!" ক্ষৌণীশ উঠে দাঁড়ালো। পাছে ভয়ংকর কিছু করে বসে সেই আশংকা করে চলে গেল বাড়ির বাইরে। জোঁকের ভয় থাকা সত্ত্বেও, ওকে জঙ্গলে যেতে হলো প্রাকৃতিক কাজ সারতে। পেটে ব্যথা মুচড়ে উঠছে। সম্ভবতঃ আমাশা হয়েছে।

বিকালের দিকে বৃষ্টি একটু কমে এলো। প্রায় ধরে আসার মতো! সেলিম আগেই এসেছিল। ও বললো, "গাড়ি নিয়ে যশিপুর পৌঁছনো অসম্ভব। জেনাবিল বা গুরগুরিয়া হেঁটে যাওয়াটাও কঠিন ব্যাপার। গেলে অবিশ্যি বিকেলেই বেরিয়ে পড়া উচিত। অন্যথায় রাত্রে হাতির উপদ্রবে, বেরোনো যাবে না।"

একটি মুণ্ডা তরুণী ক্ষৌণীশকে বললো, "আমি তোমাদের, নুন ছাড়া ভাত আর ঝিনুকের মাংস খাওয়াতে পারি।"

মেয়েটির বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিমুখের কথায় ক্ষৌণীশের চোখ টলটলিয়ে উঠলো। ও ওড়িয়া ভাষায় বললো, "তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না। এরা কী করবে, সবই তার ওপর নির্ভর করছে।"

ইন্দ্রাণী সেলিম কেউই আদিবাসীদের আলুনি-ভাত আর ঝিনুকের মাংস খেতে রাজি হলো না। ক্ষৌণীশের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খেতে পারলো না। আদিবাসী মেয়েটি ওকে আড়ালে পেয়ে বললো, "তুমি কেন উপোস করবে? তুমিও কি আমার হাতে খেতে ঘেন্না করছো।"

"তোমাকে যে ঘেন্না করবে, তার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।" ক্ষৌণীশ বললো, "ওরা খাবে না বলেই, আমিও খেতে পারবো না। কখনো সময় পেলে তোমার কাছে খেতে আসবো।"

ইন্দ্রাণীর ক্ষমতা ছিল না, যশিপুরে হেঁটে যাবে। ক্ষৌণীশ আর একবারও ওর দিকে ফিরে তাকায় নি। ইন্দ্রাণীকে মুণ্ডা মেয়েরা নানা ভাবে সেবা করেছে। কোনো গাছের পাতা পাথরে পাথর দিয়ে ছেঁচে তার রস লাগিয়ে দিয়েছে শরীরের নানা জায়গায়। যতো জায়গায় জোঁক আক্রমণ করেছিল। ক্ষৌণীশকেও পুরুষরা সেই পাতা ছেঁচা রস লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে কেবল রক্ত বন্ধ হয় নি। ক্ষতের মুখগুলোর আর বিষাক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। সেলিম নিজেই তার পাতার রস লাগিয়েছে। ক্ষৌণীশ ইন্দ্রাণীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেও লক্ষ্য করেছে মুণ্ডা মেয়েদের সেবা যেন ও দয়া করে গ্রহণ করছে। কারোর সঙ্গে একটা কথাও বলে নি। কৃতজ্ঞতা বোধ বলে কোনো

অনুভূতি ওর নেই। অথচ মুণ্ডা মেয়েরা হাসতে হাসতে ওর সেবা করেছে। আর ও হিস্টিরিয়াগ্রস্থ অসুস্থের মতো বিরক্ত মুখে কেবল হাত পা ছুঁড়েছে।

ক্ষৌণীশের ভিতরে ক্রোধ আর ঘৃণার সঞ্চার হলেও, ইন্দ্রাণীর আচরণে ও অবাক হয় নি। ইন্দ্রাণীর মধ্যে যে মানুষের প্রতি একটা অবিশ্বাস আছে, এটা ও অনেক আগেই জানতো! ওর স্বার্থপরতা যে সীমাহীন, তা যতোই প্রচ্ছন্ন থাকুক, ক্ষৌণীশ তা বুঝতে পারতো। বুঝতে পারতো, ইন্দ্রাণীর কোনো কোনো আচরণে। অবিশ্যি সে সব আচরণ ও ক্ষৌণীশের সঙ্গে কখনও করে নি। অপরের সঙ্গে আচরণেই তা বুঝতে পারতো। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস সন্দেহ আর ঘৃণা যে ওর মনে কতোটা তীব্র, সুধাকরের সঙ্গে বেড়াতে যাবার ঘটনাতেই তা বোঝা গিয়েছিল। ওর প্রাণের শক্তি এতো কম, যে-কারণে ওর মৃত্যুভয় এতো প্রবল। ও টাকা আর ক্ষমতাকে যতোটা ভালবাসে, তার চেয়ে ওর শরীর দেহের মূল্য ওর কাছে অনেক বেশি। কারণ ও জানে, ওর শরীর হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রত্ন, যা দিয়ে ও সব কিছু জয় করার বিশ্বাস পোষণ করে। এ বিশ্বাসটা একটি নারীর তার দেহের প্রতি সহজাত মর্যাদার মানসিকতা না। পুরুষের সঙ্গে নারীর শরীরের তুলনায়, নারীর যা বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠত্ব তা হলো তার সন্তান ধারনের যোগ্যতা। সতীত্ব দিয়ে তার মূল্যায়ন হয় না। তার দেহ যে সন্তান ধারণ করে, জন্ম দেয়, সেইটি তার শ্রেষ্ঠত্ব। সেইজন্যই তার শরীরকে ঘিরে নারীর মন পুরুষের চেয়ে সচেতন হতে বাধ্য। যে শরীর অন্য প্রাণের আধার তাকে রক্ষা করার দায়িত্ববোধই' নারীত্ব।

ক্ষৌণীশ জানে, ইন্দ্রাণীর কাছে ওর শরীরের শ্রেষ্ঠত্ব সেই কারণে না। নারীত্বের সেই বোধ ওর নেই। ওর ধারণায় শরীরকে যত্ন আর রক্ষা করার প্রয়োজন ভোগের জন্য। শরীর হলো ওর কাছে মহার্ঘ ভোগের বস্তু, অতএব এক শ্রেণীর স্বার্থপরতা ওর শরীরকে ঘিরে আছে। সেই [illegible]র ও ক্ষৌণীশকে দান করেছে উভয়ের ভোগের কারণে। সন্তান ধারণের জন্য না। অবিশ্যিই ক্ষৌণীশের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্থের কৌলিন্য ইন্দ্রাণীর কাছে একটা বড় আকর্ষণ। এবং নিশ্চয়ই ক্ষৌণীশের পৌরুষ ও সামর্থ্য।

ক্ষৌণীশ নিজের কাছে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ওর নিবিড় ভালবাসার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, তেমনি ও জানে, ইন্দ্রাণীও ভালোবাসে নি। অথচ উভয়েরই উভয়ের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতা আকাঙ্ক্ষা ও ভোগ। ইন্দ্রাণীর আচরণে, এমন কি কোনো কোনো সময়ে ক্ষৌণীশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশও দেখা গিয়েছে, কিন্তু ওর মনে কোথাও তার মূল শিকড় ছড়াতে পারেনি। ওর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়, ছেলেবেলা থেকেই ওর জীবনটা ঠিক স্বাভাবিক পথে চালিত হয় নি। ওদের সাংসারিক পারিবারিক বিষয়ে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তা অনেকবারই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাড়ির পরিবেশে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা ছিল।

ক্ষৌণীশ নিজেকে সংযত রেখেছিল। জীপ থেকে নেমে, একবারই মাত্র

ও ধৈর্য হারিয়েছিল। তারপরেও ইন্দ্রাণীকে কাঁধে নিয়ে এই আদিবাসীদের গৃহে এসেছে। সহ্য করেছে ওর জঘন্য গালাগাল। এখন ও মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু সে সম্ভাবনা দূর দিগন্তেও কোনো আলোর রেখা নেই। অথচ ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত্রি নেমে আসছে। ইন্দ্রাণী একবারও ওঠে নি। আর মুণ্ডা মেয়েরা ওকে গরম দুধ খাইয়েছে। সেই দুধ খেতে ওর কোনো আপত্তি হয়নি। এবং এমন একটা ভাব করছে যেন দুধ খেয়ে ও মুণ্ডা মেয়েদের উদ্ধার করেছে।

ক্ষৌণীশের খিদে পেয়েছিল। ওকেও ওরা দুধ খেতে দিয়েছিল। অমূল্য সেই দুধও খেতে পারেনি। ওদের পরিবারে শিশু কি দুধ খায়? টাকা দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। দুধের পরিবর্তে, টাকা দিতে গেলে, ওরা নিতো না। বরং অসম্মানিত বোধ করতো। পাহাড় জঙ্গলের মানুষদের সঙ্গে মিশে এই অভিজ্ঞতা ওর হয়েছিল। নুন ছাড়া ভাত আর ঝিনুকের মাংস খেতে ওর কোনো অরুচি ছিল না। ইন্দ্রাণী আর সেলিম খায়নি বলেই ও খেতে পারে নি। সেলিম যে মুণ্ডাদের গৃহের খাদ্য খাবে না, সেটা ও সহজেই অনুমান করেছিল। সেলিম মুণ্ডা গৃহে শুয়োর কেবল চোখেই দেখে নি। সে যশিপুরের বাসিন্দা। আদিবাসী মুণ্ডাদের বরাহ মাংস প্রীতি ওর অজানা নেই। এমন গৃহের অন্ন ওর পক্ষে গ্রহণ অসম্ভব। তাছাড়া সম্ভবতঃ ঝিনুকের মাংসও সেলিমের কাছে নিষিদ্ধ। যেমন জলচর কচ্ছপের মাংস তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। মুণ্ডাদের হাতের অন্ন তার পক্ষে গ্রহণ না করার যুক্তি সেখানেই। ইন্দ্রাণীর আছে ঘৃণা আর অরুচি। অন্য সময় হলেও, ঝিনুকের মাংস ও খেতো না। আর এখন ও বলতে গেলে একটা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছে। ভাত খাবার মতো অবস্থা ওর নেই। এ বিশ্বাস ওর দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, ক্ষৌণীশ ওকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে এসেছে। অবিশ্যি ও খুলে বললেও জানে ক্ষৌণীশ ইচ্ছাকৃত ভাবে ওকে এ অবস্থায় টেনে আনে নি। কিন্তু এই দারুণ দুর্দশার জন্য ও ক্ষৌণীশকে সম্পূর্ণ দায়ী করেছে।

ক্ষৌণীশ দেখলো, গোটা গ্রামের কোনো গৃহেই আলো নেই। কেবল ওরা যে গৃহে আছে, সেখানে একটি মাত্র তেলের প্রদীপ আছে। দাওয়ার ওপরে কাঠের আগুনের আলোয় সবাই চলাফেরা করছে। একটি ঘরে খড় আর তাল-পাতায় বোনা মাদুর দিয়ে বিছানা তৈরী করেছে। ইন্দ্রাণীকে ওরা সেই ঘরে নিয়ে গেল। কোথা থেকে একটা বালিশ সংগ্রহ করেছে, যার কোনো ওয়াড় পরানো ছিল না। আর সেটা সম্ভবতঃ ছিল শক্ত। ইন্দ্রাণী টেনে সরিয়ে দিয়েছে।

বৃষ্টি না এলেও, ভেজা বাতাস ছিল। এক মুণ্ডা পুরুষ ওকে জিজ্ঞেস করলো, ও গরম ডিয়েং খাবে কিনা। অর্থাৎ গরম হাঁড়িয়া। আজ ওদের ভাতের বদলে গরম হাঁড়িয়া আর ঝিনুকের ঝলসানো মাংসই রাত্রের খাদ্য। ক্ষৌণীশ দুধ খায় নি। আমাশার ভয়ে দুধ খাবার সাহস ছিল না। তা ছাড়া পয়সা ওরা নেবে না। কিন্তু গরম হাঁড়িয়ার লোভ ও ছাড়তে পারলো না। ও বললো,

"খাবো।"

পুরুষটি খুশি হলো, মেয়েরা শুনে খুশি হয়ে হাসলো। একটি ঝকঝকে কাঁসার জামবাটি ভরা ঘন উষ্ণ হাঁড়িয়া ওর সামনে এনে রাখল একটি মেয়ে। একটি বাঁশের চোঙের পাত্রে হাঁড়িয়া নিয়ে একজন পুরুষ এসে বসলো ওর পাশে। দরজাটা ভেজানো ছিল। ইন্দ্রাণী দেখতে পাচ্ছিল না। ক্ষৌণীশ জানে, এই হাঁড়িয়ায় ওর নেশা হবে না। হুইস্কি ভোদ্কায় যারা নেশা করে, হাঁড়িয়ায় সেই নেশা হয় না। বেশ খানিকটা খেলে কিছু নেশা হয়। আসলে পেট ভরে যায়। হাঁড়িয়ায় খাদ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। অভাবের সময় এরা ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া করে। নেশা হয়। পেটও ভরে। ভাত না খেলেও ক্ষৌণীশের পেট ভরছে। এক পাত্রের বেশি খাওয়া চলবে না। উচিত হবে না। ওদের কম পড়বে। কিন্তু একপাত্র শেষ হতেই একটি তরুণী বড় একটা হাঁড়ি এনে আবার তার জামবাটি পূর্ণ করে দিল। ও আপত্তি করে বললো, "আর দিচ্ছো কেন? আমার পেট ভরে যাচ্ছে।"

"একটু নেশা করে ঘুমোতে যাও।" তরুণটি হেসে বললো, "ভালো ঘুম হলে সকালে শরীর তাজা লাগবে।"

ক্ষৌণীশ হাসলো। কথাটা মন্দ বলে নি। নেশা করবে ওর ইচ্ছা হচ্ছে। হুইস্কির শেষ তলানি পড়ে আছে পাহাড়ের জঙ্গলে জীপের মধ্যে। ও হেসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "কথাটা ঠিক। কিন্তু এ বস্তুতে পেট ভরে যায়। শরীর ভার লাগে।"

"কয়েক পাত্র খেলে পেট আর কতো ভার হবে?" মেয়েটি পুরুষের দিকে একবার তাকিয়ে হাসলো। "তোমাদের মোটর যদি ঠিক না হয়, তবে তোমার বউকে আবার ঘাড়ে বইতে হবে।"

ক্ষৌণীশের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। বউ! বন্ধু হলেও বোধহয় কোনো মেয়ে পুরুষের সঙ্গে এতো খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। রক্ষিতা সম্পর্কে ওর কোনোও ধারণা নেই। ইন্দ্রাণীকে এখন ওর প্রেমিকা ভাবতেও, মনের ভিতরটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু ও মুণ্ডা তরুণীটির ভুল ভাঙালো না। বউ ভেবে তবু হয়তো ওরা ক্ষৌণীশকে মনে মনে করুণা করবে। বন্ধু বা প্রেমিকা শুনলে হয়তো বিদ্রূপে হেসে মরবে।

তিন পাত্র হাঁড়িয়া খাবার পরে, ক্ষৌণীশ যেন একটু টিপ্সি বোধ করলো। ওদের হাঁড়িয়ায় অনেকটা ভাগ বসিয়েছে। ও জল চেয়ে নিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললো। উপরোধেও আর হাঁড়িয়া খেলো না। ভেজানো দরজা খুলে ও ঘরের ভিতর ঢুকলো। বাইরে ভেজা হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরাম লাগলো। খড়ের ওপর বিছানো তালের মাদুরে পা দিতেই খস্ খস্ শব্দ হলো। দেখলো, এক কোণে ইন্দ্রাণী কাত হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত ওর মুখের ওপর দিয়ে মাথার কাছে এলিয়ে দেওয়া। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ক্ষৌণীশ ঘরের কোণে রাখা প্রদীপের

কাছে গিয়ে ফুঃ দিয়ে নির্ভিয়ে দিল। অকারণ তেল পোড়ার প্রয়োজন নেই। ও তাল পাতার মাদুরের এক প্রান্তে শুয়ে পড়লো।

"তুমি জানো, অচেনা জায়গায় আমি একলা থাকতে পারি নে।" ইন্দ্রাণীর শানুনাসিক ভেজা স্বর শোনা গেল, "তুমি অত দূরে শুলে, আমার ঘুম হবে না।"

ক্ষৌণীশ কোনো কথা বললো না। কারণ বলবার মতো কোনো কথা ওর ছিল না। হাঁড়িয়ার শক্তিকে ও যতোটা হেলা করেছিল, বাস্তবিক তা না। নেশা মোটামুটি মন্দ হয় নি। ও চোখ বুজলো।

"চুপ করে রইলে যে?" ইন্দ্রাণীর স্বর আবার শোনা গেল। মনে হলো ওর স্বর ভেজা। "তুমি আমার কাছে আসবে না?"

ক্ষৌণীশ উচ্চারণ করলো, "না।"

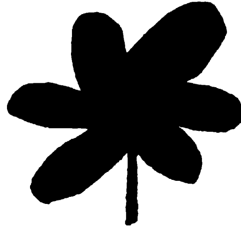
"না বললে হবে কেন? আমার সব দায়িত্ব এখন তোমারই।"

ক্ষৌণীশ জবাব দেবার কোনো দরকার মনে করলো না। কিন্তু একটা আসন্ন অশান্তির আশঙ্কা করলো। হাঁড়িয়ার নেশায় জড়ানো ঘুমটা বোধহয় নষ্ট হবে। ও কেবল বললো, "বেশি জ্বালাতন করলে আমি ঘরের বাইরে চলে যাবো।"

ক্ষৌণীশের কথা শেষ হবার আগেই খড়ের ওপর তাল পাতার মাদুরের ওপর ইন্দ্রাণীর গড়িয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। ও উঠে পড়ার আগেই, ইন্দ্রাণী একেবারে ওর গায়ের ওপর এসে পড়লো। দু হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, "তুমি কি সত্যি আমাকে মারবার জন্য এ জঙ্গলে নিয়ে এসেছো?"

ক্ষৌণীশ দাঁতে দাঁত চেপে শরীর শক্ত করে শুয়ে রইলো। কোনো জবাব দিল না। এই বর্ষার জঙ্গলে, যে-অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা যে রীতিমত বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। বন্য প্রকৃতির এই চরম ভয়ংকরী রূপ প্রত্যাশা করা যায়নি। কিন্তু ইন্দ্রাণীর এই অবিশ্বাস আর মৃত্যুভয়ের জবাব কী আছে? নানা রকম খসখস শব্দ হচ্ছিল। ইন্দ্রাণী কী করছে, ও বুঝতে পারছিল না। পারলো একটু পরে, যখন ইন্দ্রাণীর নগ্ন শরীর ওর বুকের মধ্যে, গুটিশুটি হয়ে ঢুকে পড়লো। আর ওর ট্রাউজারের জিপ-এ ওর হাত পড়লো।

অভাবনীয় ব্যাপার। ইন্দ্রাণী যখন একদিকে অবিশ্বাসে আর মৃত্যুভয়ে কাতর, তখনও কামনায় উদ্বেল। হয়তো ওর অবিশ্বাস আর মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হবার এটাই একমাত্র উপায়। ক্ষৌণীশের নিজের কোনো উদ্যোগ নেই। ও বিনা বাধায় ইন্দ্রাণীর ইচ্ছাকে পূরণ হতে দিল। আশ্চর্য! ক্ষৌণীশের নিজের মনে যতোই ক্ষোভ আর ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও, একান্ত নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলো না। প্রকৃতির এই মোক্ষম শক্তি ওর আয়ত্বে আছে। ক্ষৌণীশের প্রকৃতির বারুদে আগুন জ্বালাবার তুক্ ও জানে।



ক্ষৌণীশ আর সেলিম পরের দিন সকালে জিপ-এর কাছে গিয়ে দেখলো, জিপ ঘিরে হাতির দলের পায়ের ছাপ। কিন্তু তারা জিপটির কোনো ক্ষতি করেনি।

কয়েকজন গ্রামের লোকও ওদের সঙ্গে এসেছিল। ওরা বললো, হাতির দল ভয়ে আর সন্দেহে মোটর গাড়িটাকে ছোঁয় নি। হাতিরা জিপ গাড়ি চেনে। কিন্তু ওরা গাড়িটাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়তো ভেবেছিল, ওদের কোনো ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র করেই, গাড়িটা ওখানে রেখে যাওয়া হয়েছে।

ক্ষৌণীশ গ্রামের লোকের কথা অবিশ্বাস করলো না। কিন্তু ও আর সেলিম অনেক চেষ্টা করেও জিপ নাড়াতে পারলো না। ক্ষৌণীশের সন্দেহ হলো। ও ডিজেলের ট্যাংক খুলে দেখলো, শূন্য! বাড়তি ডিজেলের পাত্রেও আর এক ফোঁটাও ডিজেল ছিল না। ক্ষৌণীশ আর সেলিমের, দুজনের মুখই ওদিকে গেল। আকাশের অবস্থাও ভালো না। তবে বৃষ্টি নেই। ভেজা হাওয়া আছে। ক্ষৌণীশ সেলিমকে বললো, "তুমি যদি জিপ পাহারা দেবার জন্য এখানে থাকতে চাও, থাকো। আমি যশিপুরে হেঁটে যাবো। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে, আবার আমি নিজেই ফিরে আসতে চাই।"

"সাব, এতোটা পথ হেঁটে যেতে পারবেন?" সেলিমের স্বরে উদ্বেগ ও বিস্ময়।

ক্ষৌণীশ বললো, "যেতেই হবে।"

ইন্দ্রাণী যাত্রার মুহূর্তে ঘোষণা করলো, "আমি এই পাহাড়ের জলে কাদায় হাঁটতে পারবো না।"

ক্ষৌণীশের মনে হলো, ওর মাথায় আগুন জ্বলছে, কিন্তু ও একটা কথাও বললো না। জোঁক কাদা পাঁক জঙ্গল সব কিছু আবার ইন্দ্রাণীকে মরণের রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। গত রাত্রের কিছুই ওর আর অবশিষ্ট নেই। সেলিম রয়ে গেল জিপ পাহারা দেবার জন্য। কারণ, জিপ চুরি হয়ে যাওয়াও কিছু অসম্ভব ছিল না। ক্ষৌণীশ যখন আবার ইন্দ্রাণীকে কাঁধে তুলে নিল, তখন গ্রামের সব মেয়েরা আপত্তি করলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, কেন এই স্বামীই তার বউকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে, হাত ধরেই তো নিয়ে যেতে পারে।

ক্ষৌণীশ তাদের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে শুধু বললো, "বোঝা বইতেই

হয়। আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কছে ফিরে আসবো।"

গোটা গ্রামের নরনারী ওদের পিছনে গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত গেল।

ইন্দ্রাণী একটি কথাও বলেনি। ক্ষৌণীশের ঘাড় থেকেও নামেনি। চৌদ্দ কিলোমিটার পথ হেঁটে ওরা যখন যশিপুর পোঁছোলো তখন বিকেল নেমে এসেছে। ইতিমধ্যে পথে আসতে অসহ্য পেটের ব্যথায় ও আমাশায়, ক্ষৌণীশকে তিনবার ইন্দ্রাণীকে ঘাড় থেকে নামাতে হয়েছে। ইতিমধ্যে হাওয়ায় মন উড়িয়ে দিয়ে নীল আকাশের ফাঁকে রোদ দেখা দিয়েছিল।

জঙ্গলের বাইরে যশীপুরের রাস্তায় আসবার আগেই ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশের কাঁধ থেকে নামলো। যশীপুর গ্রাম না, জঙ্গলও না। মফস্বল শহর। সেখানে ক্ষৌণীশের কাঁধে ইন্দ্রাণী একটি কৌতুকের ছবি হয়ে উঠতো। ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষৌণীশ একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে, তাতে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে চাপলো। আকাশে রোদ, বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই।

ক্ষৌণীশ আর ইন্দ্রাণী যখন যশিপুর বাংলোয় পৌঁছলো, দেখা গেল চারটি মোটর বাইক আর পাঁচজন বাঙালী তরুণকে। তারা কলকাতা জামশেদপুর মোটর র‍্যালি সেরে, এদিকে বেড়াতে এসেছিল। তখনই তারা বেরিয়ে পড়ছিল। ইন্দ্রাণী উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, "সুখেন তুই!"

"তুমিই বা এখানে কী করে এলে?" সুখেন নামক তরুণ অবাক হেসে জিজ্ঞাসা করলো।

ইন্দ্রাণী বললো, "সে-জবাব পরে দেবো। তোরা কি এখুনি কলকাতায় যাচ্ছিস?"

"কলকাতায় আজই হয় তো যাওয়া হবে না।" সুখেন বললো, "তবে আমরা আজ রাত্রে বাহারাগোড়ায় হল্ট করলেও কাল ভোরেই কলকাতায় রওনা হবো।"

ইন্দ্রাণী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যাবি?"

"তোমার যদি ইচ্ছে হয়, কেন নিয়ে যবো না?" সুখেন জিজ্ঞাসু চোখে ওর বন্ধুদের দিকে তাকালো।

বন্ধুরা সবাই হাত তুলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্মতি জানালো। ইন্দ্রাণী ক্ষৌণীশকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরেজিতে বললো, "সুখেন, এই লোকটিকে জিজ্ঞেস কর, সে তাদের সঙ্গে যেতে চায় কি না।"

সকলেই কিন্তু ক্ষৌণীশের দিকে তাকালো।

ক্ষৌণীশ এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। হাত জোড় করে হেসে বললো, "আমি যাবো না, আপনারা যান।" ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে বললো, "তোমার স্যুটকেস্ কলকাতায় ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে।"

ইন্দ্রাণী কোনো কথা না বলে, সুখেনদের র‍্যালির দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ক্ষৌণীশের মন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হলো না বরং একটা অপমান ওকে

বিদ্ধ করলো। বাংলোর চৌকিদার এসে ক্ষৌণীশকে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। ক্ষৌণীশ বললো, "ঘরের দরজা খুলে দাও।"

ক্ষৌণীশ চারটি মোটর বাইকের গর্জন শুনলো। সুখেনদের পরিচয় ওর জানা নেই। কিন্তু একটা মুক্তির আনন্দে, ওর দু'চোখ প্লাবিত হয়ে গেল।

ক্ষৌণীশ এক রাত্রি বিশ্রাম করেই অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। আকাশও পরিস্কার। বৃষ্টির সামান্য ছিটে ফোঁটাও নীল আকাশের কোথাও ছিল না। ও প্রথমে গেল সেলিমের বাবার কাছে। সমস্ত ঘটনা বললো। তারপরে ওর আর্জি পেশ করলো, "আমাকে একটা জিপ দিন। আমি নিজে সেলিমকে নিয়ে ফিরতে চাই।"

সেলিমের বাবা ক্ষৌণীশকে আশ্বস্ত করে বললেন. "আমার ফোর-হুইলারটা ফিরে এসেছে। আপনি ওটাই নিয়ে যান।"

ক্ষৌণীশ খুশিতে উল্লসিত হয়ে উঠলো। পেটের ব্যাধি কিছুটা প্রশমিত হলেও ওর গায়ে তখন জ্বরের উত্তাপ। কিন্তু কতো উত্তাপ, তা মাপবার অবকাশ ওর নেই। ও ফোর-হুইলার নিয়ে আগে বাজারে গেল। নুন কিনলো দশ কিলো। চালও কুড়ি কিলো। আর কিছুই নিল না। চাল নুন জিপ-এ চাপিয়ে ও আবার জংগলের পথে ঢুকলো। বেলা দুটোয় পৌঁছলো সেই আদিবাসী গ্রামে। সেলিমও ইতিমধ্যে গ্রামের লোকের সাহায্যে, ঠেলে জিপ গ্রামের মধ্যে এনেছিল। ক্ষৌণীশকে একা দেখে অবাক হলেও, খুশি হলো।

ক্ষৌণীশ চাল আর নুনের ঝোলা নিয়ে. সেই তরুণীর সামনে দাঁড়ালো। বললো. "সমস্ত ঘরে ঘরে যতোটা পারো নুন দাও। আর তুমি ভাত রান্না করে, ঝিনুকের মাংস দিয়ে আমাকে খাওয়াও।"

তরুণীর কাজল কালো চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ. কৌতুকের হাসি ফুটলো। সে যে খুব খুশি হয়েছে. তার হাসির ঝিলিকে তা স্পষ্ট। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বউ কোথায় গেল?"

"বউ"! ক্ষৌণীশ হাসলো। অনায়াসে তরুণীর হাত ধরে নিজের মাথায় রাখলো. "সে চলে গেছে।"

যারা সেই দৃশ্য দেখছিল. কথা শুনছিল, সবাই হেসে উঠলো। একজন পুরুষ বললো, "দিকু পুরুষদের যেমন বোঝা যায় না মেয়েদেরও বোঝা যায় না!"

সমতলবাসী ভদ্রলোকদের পুরুষ নারী সবাই ওদের কাছে দুর্বোধ্য। আদিবাসী তরুণীটি ক্ষৌণীশের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল খোলা উঠোনে, বললো, "বস। ঝিনুক এনে দিচ্ছি। দু'জনে ঝিনুকের খোল ছাড়িয়ে মাংস বের করবো।"

ক্ষৌণীশ শুকনো, আর লেপা মোছা উঠোনে বসে পড়লো। ওকে ঘিরে এলো আরও অন্য নর-নারীরা। কেবল সেলিম একটু দূরে সরে রইলো।

কখন যে গোটা গ্রামের মানুষ নুন নেবার জন্য উঠোন ঘিরে ফেলেছে,

ক্ষৌণীশের খেয়াল ছিল না। সবাই ছিল তারা হাসিখুশি। ক্ষৌণীশকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, “এ দিকুটা অন্যরকম।” তারপরেই মেয়েরা গান ধরলো।

ক্ষৌণীশ হেসে জিজ্ঞাসু চোখে তরুণীর দিকে তাকালো। তরুণী বললো, “ওরা গান গেয়ে বলছে, প্রতি বছর বর্ষায় যেন মারাংবুরু এই মানুষটিকে আমাদের গাঁয়ে নুন দিয়ে পাঠায়। এই মানুষটি আমাদের দুঃখ বোঝে। আমরাও ওকে সুখী দেখতে চাই।”...

ক্ষৌণীশের গায়ে জ্বর। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। গানের কথা শুনে ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। অরণ্য আর মানব প্রকৃতিকে ও নতুন করে দেখছে।

মানুষের জীবন সোজা পথে চলতে চলতে সহসা এমন বাঁক নেয় যা তার জীবনে ঘনিয়ে আনে দুর্যোগের ঘনঘটা। এই গতিবদল বা বাঁকের ওপর তার নিজেরও বুঝি দখল থাকে না। তার চিরপরিচিত স্ত্রী, সন্তান, তার সংসার হঠাৎই যেন তার সব আকাঙ্ক্ষা আর পুরিয়ে উঠতে পারে না। কেন, কী কারণ সে সন্ধানও খুঁজে দেখার মত অবস্থা তার থাকে না। সে ছুটে চলে নিয়তিতাড়িত হয়ে। প্রকৃতির এই বিচিত্র খেয়ালে ঘূর্ণিঝড় নামে এক-এক জনের জীবন ও সংসারে। প্রকৃতি উপন্যাসের নায়কের জীবনেও নেমেছিল এই ঘূর্ণিঝড়। কৌণীশ যখন ইন্দ্রাণীকে নিয়ে ভেসে পড়ল অরণ্যে, প্রকৃতির দিকদিশাহীন আঁধারে, তখন সে সত্যিই নিরুপায়, তার ভাগ্যদেবতা কামের হাতে অসহায়ভাবে সমর্পিত। কৌণীশের কাছে [illegible]
কিন্তু [illegible]
ধরিত্রীর [illegible]
স্নেহশী[illegible]
করে আ[illegible]
দিতে। [illegible] প্রাকৃ[illegible]
ভেসে যাওয়া ব[illegible]
আর ইন্দ্রাণী কতদূর যেতে পারে উদ্দাম গতিতে আর কি ভাবে প্রকৃতি ফিরিয়ে আনে তাদের, সেই অবিশ্বাস্য লোম-হর্ষক কাহিনীই শুনিয়েছেন সমরেশ বসু